

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশিকা—শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী

মুদ্রাকর—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে, বি. এস-সি.
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রাইভেট লিমিটেড
১৮ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় পরমপূজনীয়া গৌরীমাতার অলোকসামান্য জীবনচরিত বৃহত্তর আকারে প্রকাশিত হইল।

ভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ লোকশিক্ষার নিমিত্তই যুগে যুগে জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া পুনরায় তাঁহারা ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন্; থাকিয়া যায়—তাঁহাদের জীবনের সাধনা, বাণী ও আদর্শ। তাঁহাদের পুণ্যচরিত এবং জীবনবার্ত্তা মানুষের পক্ষে প্রণিধান ও অনুশীলনের যোগ্য। ইহাতে সমাজের এবং দেশের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণ সাধিত হয়। জাতির ইতিহাস এবং সাহিত্যও এতদ্দ্বারা পরিপুষ্ট এবং গৌরবান্বিত হইয়া থাকে।

গৌরীমার চিত্ত ছিল আশৈশব ভগবদভিমুখী। ভগবৎপ্রেরিত হইয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এবং সাধনা ও সিদ্ধির অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বিরল।

সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের পরম আদরের কন্যা হইয়াও তিনি যাবতীয় বিষয়ভোগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। মনে তীব্র বৈরাগ্য এবং ব্যাকুলতা লইয়া শাশ্বত সম্পদ—ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র সঙ্কল্প লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বৎসরের পর বৎসর, একাকিনী হিমালয়ের দুর্গম অরণ্যানীতে এবং সমগ্র ভারতের তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। অনন্যচিত্ত এই সাধিকার তপস্যায় এবং প্রেমে ভগবান তাঁহার নিকট ধরা দিলেন।

গৌরীমার আধ্যাত্মিক এবং ব্রতময় জীবনের দীক্ষাগুরু—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার নিকটই গৌরীমা বাল্যকালে দীক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশমত নিজের তপঃসিদ্ধ জীবন মাতৃজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গৌরীমার জীবনের আদর্শ ও সাধনা ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত বলিয়া এই গ্রন্থে ঠাকুরের লীলা-কাহিনীও সংক্ষেপে উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

সমাজের কঠোর কঙ্করাকীর্ণ ঊষর ভূমিতে জগদ্গুরুর আশিসধারা পরিষেচনে যে সেবাবীজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা গৌরীমার ঐকান্তিক সাধনায় ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে। গুরুদেবের উপদিষ্ট এই সেবাব্রতকে তিনি জগদম্বার পূজারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার ন্যায়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের ইতিহাসও উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

ভক্ত ও সাধকের জীবন হইতে অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় ঘটনাবলী সম্পূর্ণ বিযুক্ত করা সম্ভব নহে, বিযুক্ত করিলে তাঁহাদের জীবনেতিহাসের অংশবিশেষের অঙ্গহানি ঘটিবারই সম্ভাবনা। মহাসাধিকা গৌরীমার জীবনেও এইরূপ অনেক ঘটনার প্রকাশ দেখা গিয়াছে। তাহাদের কয়েকটিমাত্র এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল।

গৌরীমার নিজের কথিত ও লিখিত বিবরণ এবং তাঁহার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী, জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সহোদরা বিপিনকালী দেবীর নিকট যে-সকল বিবরণ পাইয়াছি, এই গ্রন্থরচনায় তাহার উপরই নির্ভর করা হইয়াছে। গৌরীমার অন্যান্য নিকট আত্মীয়স্বজন এবং সমসাময়িক ভক্তগণের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ এবং পত্রাদি হইতেও এই বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। গৌরীমার সহিত

সুদীর্ঘকালের সাহচর্য্যহেতু আমাদের ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানও যথেষ্ট রহিয়াছে।

গৌরীমার বয়স সম্বন্ধে অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স অন্যূন পঞ্চাশীতি এবং অনধিক একশত বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী ও সহোদর-সহোদরাগণের বয়স এবং তিনি বাল্যকালে যে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায়—এই ধারণা ভ্রমপূর্ণ। গৌরীমা এবং তাঁহার গর্ভধারিণীর মুখে আমরা ইহাও শুনিয়াছি, মহামান্য ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) কলিকাতায় আগমন করেন, তাহার কিছুদিন পরেই (অর্থাৎ সন ১২৮২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে) আঠার বৎসর বয়সে গৌরীমা গঙ্গাসাগরতীর্থে গমন করেন। তিনি ১২৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন। গৌরীমা অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নিজেকে মাতৃস্থানীয়া ভাবিয়া সকলকে সন্তানবৎ জ্ঞান করিতেন, এবং সকলে তাঁহাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহা হইতেই তাঁহার বয়স সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

গৌরীমার ভক্তসন্তান, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু তাঁহার অকালে পরলোকগত স্নেহাস্পদ পুত্র কল্যাণ-কুমারের স্মরণার্থে এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

প্রচ্ছদপটের চিত্রের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন এবং শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। * * এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি গ্রন্থপ্রকাশে নানাভাবে

সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। * *

যথাসাধ্য যত্নসত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে। আশা করি, পাঠকপাঠিকাগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন।

গৌরীমার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া যদি কাহারও প্রাণে আনন্দ এবং উৎসাহের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমরা সকল চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

শারদীয়া ষষ্ঠী
১লা কার্ত্তিক, ১৩৪৬

বিনীতা
শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

সূচীপত্র



গৌরীমা

অবতরণিকা

শরৎকাল। মহামায়ার বোধনের মঙ্গল শঙ্খ দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে। শারদশ্রী জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে—মানুষের অন্তরে বাহিরে—এক অভিনব সৌন্দর্য্যের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। এমনই এক দিনে দক্ষিণ-কলিকাতায় ভবানীপুরে এক গৃহের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নির্ম্মল গগনতলে কয়েকটি বালকবালিকা খেলা করিতেছিল। বছর-দশেকের একটি বালিকা কাছেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কনকচাঁপার মত তাহার গায়ের রঙ, সুশ্রী গঠন, চক্ষু দুইটি যেন ভাবে বিভোর।

বালিকা হঠাৎ রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখে—একজন পথিক। তাঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, দৃষ্টি উদার। পথিক তাহারই দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন; কাছে আসিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "সবাই খেলছে, আর তুমি যে বড় একলাটি চুপচাপ ব'সে আছ?" উত্তরে বালিকা বলিল, "ওসব খেলা আমার ভাল লাগে না।" বলিতে বলিতে এক অভিনব ভাব তাহার হৃদয়কে অভিভূত করিল। তাহার মনে হইল, এই পথিক যেন কত আপনার,—

কতদিনের, কত জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। সে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। পথিক তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "কৃষ্ণে ভক্তি হউক।"

অল্প দুই-চারিটি কথার পর পথিক আবার পথ চলিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা গেল বালিকা একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, অননুভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশে তাহার চিত্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল।

কয়েকদিন পরের কথা।

দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নিমতে-ঘোলার এক ক্ষেতে কৃষাণেরা চাষ করিতেছিল। বালিকা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কোথায় এক কলাবনে ঠাকুরমশাই আছেন, জান?"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একজন বলিল, "ঐখানে।"

সম্মুখে সামান্য এক কুটীর। বালিকা অতি সন্তর্পণে কুটীরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই পূর্ব্বপরিচিত পথিক। আসনোপরি তিনি উপবিষ্ট, লোচনদ্বয় ধ্যাননিমীলিত, দেহ নিস্পন্দ, মুখমণ্ডল তপ্ততাম্রভাণ্ডের ন্যায় দীপ্ত। সমস্ত ঘরটি যেন সে-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। বালিকা দেখিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। তাঁহাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিয়া সে একপার্শ্বে বসিয়া রহিল।

এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। সাধক ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বালিকা ভূমিনত হইয়া তাঁহার চরণে পুনরায় প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুই এসেছিস্!" আবেগকম্পিত কণ্ঠে বালিকা নিজের মনের ভাব তাঁহার নিকট নিবেদন করিল।

পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে বালিকার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। অল্পবয়স্কা একটি সুন্দরী বালিকাকে এইভাবে পাইয়া তাঁহারা যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে সেই পরিবারের মহিলাদিগের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলে সাধক বালিকাকে দীক্ষাদান করিলেন। গুরুর নির্দ্দেশ-মত নামজপ করিতে করিতে বালিকা ভাববিভোর হইয়া পড়িল। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাহার বদনমণ্ডলে এক অপার্থিব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা।

এদিকে বালিকাকে বহুক্ষণ গৃহে দেখিতে না পাইয়া তাহার আত্মীয়স্বজনের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। প্রতিবেশীদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। শেষে একটা সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বালিকার জ্যেষ্ঠ সহোদর কলাবনে যাইয়া তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। আগ্রহে ও আনন্দে তিনি ভগিনীর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন। সাধক বালিকার সহোদরকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, ও ছেলেমানুষ, ওকে যেন কেউ বকো না। হলদে পাখী ধ'রে রাখা দায়!"

বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া বালিকা একবার সাধকের দিকে, আর একবার সহোদরের দিকে চকিত-দৃষ্টিপাত করিতেছিল। উভয় আকর্ষণের মধ্যবর্ত্তিনী বালিকার জিজ্ঞাসু চিত্ত হয়ত তখন অজ্ঞাতসারে বলিতেছিল,—

"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

সাধক হাসিয়া বলিলেন, "যাও মা এখন। আবার দেখা হবে, —গঙ্গাতীরে।"



বংশ-পরিচয়

গৌরীমার পূর্ব্বাশ্রমের নাম মৃড়ানী, অন্য নাম রুদ্রাণী। আদর করিয়া কেহ কেহ 'মাস্তু' অথবা 'মেজ' বলিয়াও ডাকিতেন। মৃড়ানীর পিতার নাম পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতার নাম গিরিবালা দেবী। পার্ব্বতীচরণ ছিলেন অতিশয় মাতৃভক্ত, তেজস্বী এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। খিদিরপুরে এক সওদাগরী অফিসে তিনি চাকুরী করিতেন। প্রতিদিন পূজার্চ্চনা করিয়া তাহার পর কর্ম্মস্থলে যাইতেন; কপালে চন্দন দেখিয়া অফিসের সাহেব মাঝে মাঝে উপহাস করিতেন। পার্ব্বতীচরণ উত্তর দিতেন, তিনি চাকুরী ছাড়িতে পারেন, ধর্ম্মাচার ছাড়িতে পারেন না।

পার্ব্বতীচরণের নিবাস হাওড়া জিলার অন্তর্গত শিবপুরে। তাঁহার পিতার নাম রামতারণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা রাজলক্ষ্মী। রামতারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন; সদাচারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহার চারি পুত্র এবং এক কন্যা,—পার্ব্বতীচরণ, করালীচরণ, উমাচরণ, তারিণীচরণ এবং ভগবতী দেবী।

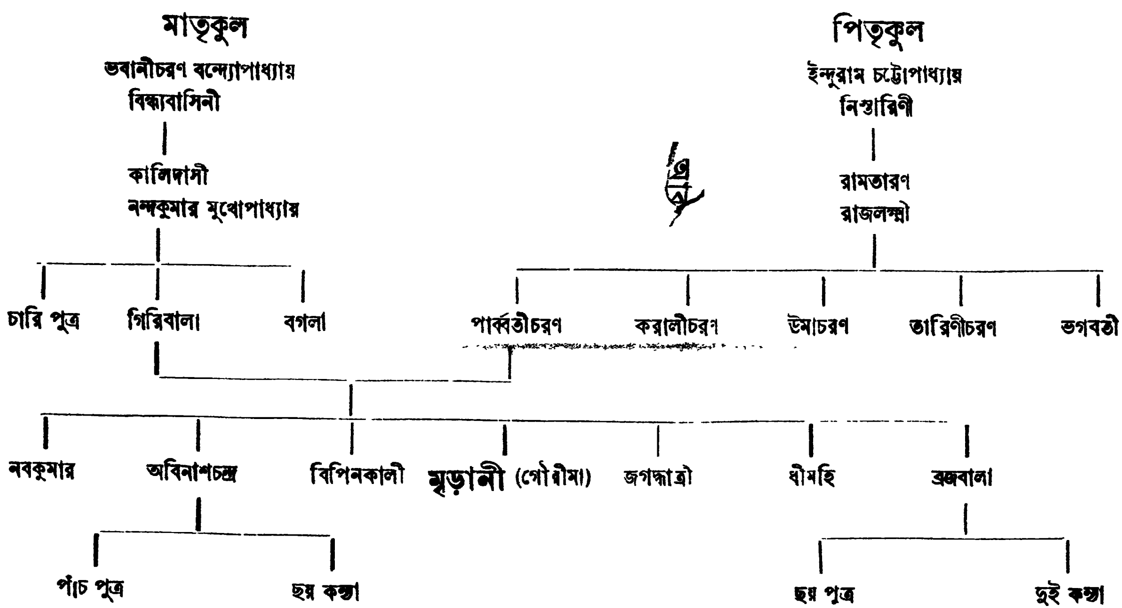
গিরিবালা দেবীর পিতার নাম নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়, নদীয়া জিলার অন্তর্গত রাণাঘাটে তাঁহার নিবাস; মাতার নাম কালিদাসী দেবী। কালিদাসী দেবীর পিতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

মাতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। ভবানীচরণের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। ভবানীপুরে তাঁহাদের প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

ভবানীচরণের কোন পুত্রসন্তান দীর্ঘজীবী না হওয়ায় তিনি একমাত্র কন্যা কালিদাসীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কালিদাসীর স্বামী নন্দকুমার অধিকাংশ সময় ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ীতেই বাস করিতেন। উদারচিত্ত এবং দানশীল বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারের খ্যাতি ছিল। নিকট ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় এবং অনাত্মীয় অনেক পোষ্য তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিত। বাড়ীতে একটি সংস্কৃত টোলও ছিল, অনেক ছাত্র সেই টোলে বিদ্যাভ্যাস করিত। বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারই তাহাদিগের অন্নবস্ত্র যোগাইতেন। কালিদাসী বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী এবং ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি জপ করিতেন। মৃত্যুদিনেও তিনি যথানিয়মে দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। কোন কোন সাধক যেভাবে যোগবলে দেহত্যাগ করেন, তিনি ঠিক সেই ভাবেই—কোনপ্রকার দৈহিক কষ্ট ভোগ না করিয়া প্রশান্তচিত্তে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।

কলিদাসী দেবীর দুই কন্যা,—গিরিবালা এবং বগলা। তাঁহার চারিটি পুত্রসন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বগলার বরাহনগরে বিবাহ হয়, স্বামীর নাম বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বগলার শ্বশুরপরিবার খুব বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহার একটি কন্যাসন্তান হইয়াছিল।

গৌরীমার পূর্ব্বাশ্রমের বংশ-তালিকা



গিরিবালা দেবীর দুই পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। সর্ব্বপ্রথম সন্তান নবকুমারের বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। কন্যাদের নাম—বিপিনকালী, মৃড়ানী, জগদ্ধাত্রী, ধীমহি এবং ব্রজবালা। জগদ্ধাত্রী এবং ধীমহির অকালে মৃত্যু হয়। পানিহাটি-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিপিনকালীর বিবাহ হয়। বিপিনকালী নিঃসন্তান ছিলেন। অবিনাশচন্দ্রের পাঁচ পুত্র এবং ছয় কন্যা। নদীয়া-নিবাসী বিপিন[illegible] মুখোপাধ্যায়ের সহিত ব্রজবালার বিবাহ হয়। ব্রজবালার ছয় পুত্র এবং দুই কন্যা। অবিনাশচন্দ্র এবং ব্রজবালার পুত্রকন্যাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন।



জননী গিরিবালা



জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জননী গিরিবালা

গিরিবালা দেবীর চরিত্র বহুগুণে মণ্ডিত ছিল। তন্মধ্যে একটি বড় গুণ—দীন, দুঃখী, পীড়িত এবং আশ্রিতের সেবা। দীনদুঃখীরা তাঁহাকে তাহাদের পরম শরণ্য বলিয়া মনে করিত, বিপদে পড়িলেই নিঃসঙ্কোচে আসিয়া 'মা-ঠাকরুণের' সাহায্য প্রার্থনা করিত। কাহাকেও চালডাল, কাহাকেও সাগুমিছরি, কাহাকেও টাকাপয়সা, আবার কাহাকেও যথাযোগ্য সুপরামর্শ দিয়া তিনি সাহায্য করিতেন।

বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় গিরিবালার বিশেষ অধিকার ছিল। ইংরাজী এবং পারসীও তিনি কিছু কিছু জানিতেন। তিনি বহু শত সঙ্গীত এবং কতকগুলি স্তব রচনা করিয়াছিলেন; নিজেও সুগায়িকা ছিলেন। তাঁহার রচিত 'নামসার' এবং 'বৈরাগ্য-সঙ্গীতমালা' বহু বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীত, শিব-সঙ্গীত এবং যোগ-সঙ্গীত তৎকালে অনেকে গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত। এই শ্রেণীর লোকের আবেদনে তাঁহার হস্তলিখিত সঙ্গীত-পুস্তকের পাতাগুলি তিনি বিলাইয়া বিলাইয়া প্রায় নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন।

গিরিবালার রচনা যে ভাষা এবং ব্যাকরণের মাপকাঠিতে সর্ব্বত্রই ত্রুটিহীন, এমন নহে, তথাপি প্রাচীন আদর্শের হিন্দু সংসারের একজন গৃহকর্ম্মনিরতা গৃহস্থবধূর লেখনী হইতে এত

রচনা কি করিয়া প্রসূত হইল, ভাবিলে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে। তিনি যে কেবল কবি ছিলেন তাহা নহে, উচ্চ-স্তরের সাধিকাও ছিলেন। মহাকালীর চরণে তাঁহার গভীর ও অবিচল ভক্তি ছিল। জপধ্যানে এবং পূজাপাঠে তিনি যথেষ্ট সময় নিয়োগ করিতেন, গভীর রাত্রিতে সাধনভজন করিতেন। তাঁহার গর্ভধারিণী কালিদাসী দেবী এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অনুকূল ছিলেন।

গিরিবালার রচিত সঙ্গীতের শেষাংশে তৎকালীন কবিদিগের অনুকরণে ভণিতা থাকিত। কিন্তু তাহাতে স্পষ্টভাবে কোথাও তাঁহার নামের উল্লেখ নাই। কোথাও আছে 'কিঙ্করী,' কোথাও আছে 'বালা'। তাঁহার সকল রচনার আলোচনা, এমন-কি উল্লেখ করাও এই গ্রন্থে সম্ভব নহে। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহার রচনার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জগন্মাতার রূপ-বর্ণনায় গিরিবালা লিখিয়াছেন,—

কালী করাল-বদনা মুণ্ডমালা-বিভূষণা,
ভালে অর্দ্ধশশী ষোড়শী লোল-রসনা,
ত্রিনয়না অকলঙ্ক-বিধু-আস্য-হাস্য শ্যামা সুদর্শনা।

* * *

এলায়ে পড়েছে কেশ, ভীমা-বেশ কি সুবেশ,
অঘ-হরা ঘোরা কালী ভীষণভীষণা।
শ্যামারূপ অনুপম, সুধাভরা কালী নাম,
সাধিকার পূর্ণ কাম, সাধকের পূরে কামনা॥

মহাকালীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

একি সর্ব্বনেশে মেয়ে রণমাঝে এল, হায়!
একি যুদ্ধ, রথশুদ্ধ রথী হয় গিলে খায়॥

* * * *

হেরিয়ে হয় আতঙ্ক, নখেতে বিঁধে মাতঙ্গ,
রণমাঝে করে রঙ্গ, করেতে করী দোলায়।
কুন্তল পড়েছে খুলে, নাহি তারা বাঁধে তুলে,
বারেক ভ্রমেতে ভুলে বিশ্রাম নাহিক লয়॥

* * * *

'কিঙ্করী' কহিছে, তারা, জানি তুমি নিরাকারা,
ব্রহ্মময়ি পরাৎপরা, ব্রহ্মজ্ঞান দেহি আমায়॥

তাঁহার রচিত দক্ষিণাকালীর স্তব তাঁহার বাড়ীর বালক-বালিকাগণ প্রতিদিন পাঠ করিত,—

কোথা মা দক্ষিণাকালী কৃতান্তবারিণী,
দক্ষরাজ-সুতা শিবে শিব-সীমন্তিনী।
দুঃখে পড়ে ডাকি দুর্গা রক্ষ মা আমারে,
দে ভবানি ভবে আসা দক্ষিণান্ত করে।
এ ঘোর ভব-কুহকে ঘোরা নাহি যায়,
অঘোর-মোহিনী ঘোরে রেখো না আমায়।

* * * *

যে-ধন পরমধন তার চিন্তা ত্যজে
অনিত্য ঐহিক সুখ-আশে আছি মজে॥

গিরিবালার শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতগুলি অন্যান্য সাধক কবিদিগের সঙ্গীতের মতই ভক্তিগর্ভ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ।

পশুপতি-স্তবে অনুপ্রাসের ঘটা এবং ছন্দের ছটা দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীন কবিদিগের প্রভাব লেখিকার রচনায় অনেকটা সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহার ভাষা আধুনিক বাংলা নহে, উহা কালোচিত সংস্কৃতশব্দ-বহুল বাংলা। এক-একটি শব্দ লইয়া লেখিকা নানাভাবে বিন্যাস করিয়াছেন,—

সহস্র-দলাম্বুজ-বাসকারী।
নমো রুদ্ররূপ গুরো ব্রহ্মচারী॥
নানাবেশধারী নানাচারাচারী।
পরমামৃতরস-প্রদানকারী॥

* * *

বিভু বিশ্ববিনাশক বিশ্বধাতা।
চিদানন্দময় চিদানন্দদাতা॥
মহাহংসরূপ মহাঅংশরূপ।
জয় অশ্মরূপ শিব স্ব-স্বরূপ॥
বেদ-বর্ণময় মহাসিদ্ধ মনু।
মনু-মন্ত্রময় চারু রম্য তনু॥
তনু সুন্দর শঙ্করী-মন্মথ হে।
রূপ-মন্মথ মন্মথ-মন্মথ হে॥

* * *

ভব রক্ষয় মাং শরণাগত হে।
কালমাগতমাগতমাগত হে॥
ভীতা কাতরী 'কিঙ্করী' শঙ্কর হে।
ভয় সংহর সংহর সংহর হে॥

যোগ-সাধনা বিষয়ে তাঁহার অনেকগুলি সঙ্গীত আছে। একটিতে লিখিয়াছেন,—

জাগো কুলকুণ্ডলিনী আধারকমল হতে,
উঠি স্নান কর দুর্গা-ষড়দল-নীরজেতে।
*　　*　　*　　*
চন্দ্র সূর্য্য বৈশ্বানরে আছে যথা আলো করে,
বিহর মা সহস্রারে তারা মরাল-মন্ত্রেতে।
এ ভাব 'বালা'র কবে হবে, ভব-তম দূরে যাবে,
মা তোরে হেরিব সবে, সদা সংবস্তু মাত্রেতে॥

ষট্‌চক্রের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

যদি কৃপা করে তারা, জানবি চক্রভেদ করা।
ছটা পদ্ম বুঝবি হদ্দ, ভেদ করা তার কেমন ধারা॥
বেদবর্ণে চক্রদলে স্বয়ম্ভূ সাঙ্গাত মিলে,
কাকীমুখী রাখে ঢাকি ব্রহ্মদ্বার কাকোদরা॥
ষড়বর্ণে ষড়দলে বিহার করিছ জলে,
ব্রহ্মা সৃষ্টি কচ্ছে কলে, যেমন (ছেলের) পুতুল-খেলা করা॥
*　　*　　*　　*

ওরে ও মন, মনে মনে আগে সাধ শ্যামাধনে।
সে তারার কৃপা বিনে 'বালা' তত্ত্ব-রত্ন-হারা॥

সাধিকা লেখিকার ইহাই মনের গহন তথ্য,—একেবারে সার তত্ত্ব। শ্যামা মাকে ভক্তিভরে হৃদয়-পদ্মাসনে বসাইতে পারিলে তাঁহার কৃপায় সর্ব্বপ্রকার সাধনায় নিজের ঘরের কোণে বসিয়া সহস্র সাংসারিক ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। এই সাধনার জন্য কোনপ্রকার বাহিরের অনুষ্ঠানের বা সমারোহের প্রয়োজন নাই। এই কথাই শব-সাধনার অভিনব ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি বিবৃত করিয়াছেন,—

শ্মশান-শব-চিতা-মুণ্ড সাধনে কিবা প্রয়োজন।
কালী কালী কব, আনন্দে বেড়াব,
কালী-প্রেমে রব হয়ে মগন॥
অণিমা লঘিমা অষ্ট সিদ্ধি তার,
সাধনে নাহিক প্রয়োজন আর।
যে ধরে হৃদয়ে চরণ তোমার, করতলে তার এ তিন ভুবন॥
শ্মশান-সিদ্ধ অর্থ আসন-সিদ্ধ হয়,
শব-সিদ্ধ অর্থ দেহাটলে রয়।
চিতা-সিদ্ধ অর্থ চিত্তস্থিরতায়,
মুণ্ড-সিদ্ধ মস্তক ও-পদে অর্পণ॥
দূরে নিক্ষেপিয়া আত্ম-অভিমান, জীবত্বে হইয়া শবেরি সমান।
সতর্কে সে পদে সঁপি 'বালা' প্রাণ,
নামামৃত পান করে অনুক্ষণ॥

বস্তুতঃ, সকল কর্ম্মের মধ্যে দেবতার নামগান ও দেবভাবে দেহমনকে ভাবিত করাই প্রকৃত সাধকের চরম লক্ষ্য। গিরিবালাও সেই কামনাই করিয়াছেন,—

আমার দেহ-যন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে ওরে প্রাণ,
অবিশ্রাম কর কালীর গুণগান।
বাজায়ে দেহ-সেতারা, কর গান ব'লে তারা,
ভাব সদা ভব-দারা, যদি ভবে চাহ ত্রাণ ॥
* * *
তারকব্রহ্ম নামেতে দাও মূর্চ্ছনা,
অটল ভাবেতে কর অটল ঠাটের বাজনা,
বাজালে এ ভব-জ্বালা রবে না।
দাও মৃড়ানী নামে মীড়, করি' মনপ্রাণ স্থির,
শ্যামা-নাম-সুরে বেঁধে রাখ কান ॥
তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্রময়ী মা আমার,
স্বতন্ত্র তারার তন্ত্র বুঝে উঠে সাধ্য কার,
ত্রিতন্ত্রে বাজিছে যন্ত্র অনিবার ॥

দেবতার পূজা সার্থক করিবার জন্য বাহ্য উপকরণ এবং জাঁকজমকের প্রয়োজন নাই, সুপথে পরিচালনা দ্বারা হৃদয়বৃত্তি-নিচয়কে ভগবদভিমুখী করিয়া তোলাই প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান। তাহাতেই দেবতার প্রীতি, আন্তরিকতাশূন্য অনুষ্ঠানমাত্রে নহে। ইহাই বুঝাইবার জন্য গিরিবালা লিখিয়াছেন,—

আনন্দের মালঞ্চে চল যাই মালিনী হয়ে,
লহ রে নিবৃত্তি-সাজি করেতে করিয়ে।

বিষয়সম্পত্তি থাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ঝঞ্ঝাট আসিয়া উপস্থিত হয়। কালিদাসী এবং তৎপরে গিরিবালা স্ত্রীলোক হইয়া প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন, দূরসম্পর্কীয় কোন কোন আত্মীয়পরিজনের ইহা মনঃপূত হয় নাই। ইঁহাদিগকে বঞ্চিত এবং অপদস্থ করিবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। গিরিবালার সন্তানগণের প্রাণনাশের চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। সম্পত্তির জন্য বহু বৎসর ধরিয়া উভয়পক্ষে মামলামকদ্দমা চলিয়াছিল। এই বিষয়ে কনিষ্ঠা সহোদরা বগলার স্বামী গিরিবালাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

পার্ব্বতীচরণ ছিলেন শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি পত্নীকে বুঝাইতেন, "এত ঝঞ্ঝাটে কি দরকার? আমাদের ত কিছুর অভাব নেই। এসব আপদ ছেড়ে চল, কাশী গিয়ে বাকি ক'টা দিন শান্তিতে কাটাই।" তেজস্বিনী গিরিবালা সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিতেন, "অন্যায় অত্যাচার আমি নীরবে সইব কেন? মা অসুরনাশিনী আমার সহায়। আমার অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না, দেখে নিও।"

অহল্যাবাঈ-এর মত তিনি বিরোধীদিগের সকল অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, এবং তাহাতে জয়লাভও করিয়াছেন। বিষয়সম্পত্তির পরিচালনা ব্যাপারে গিরিবালা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে। যাঁহারা তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া জানিতেন, তাঁহারা সকলেই

একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ ছিল কোমলতা এবং সরলতায় পরিপূর্ণ। অন্যায়, অবিচার ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি রুদ্রাণীরূপ ধারণ করিলেও তাঁহাকে নিতান্ত লজ্জাশীলা এবং নিরীহ প্রকৃতির কুলবধূ বলিয়াই সকলে জানিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক রূপ ছিল অন্নপূর্ণার রূপ,—কমলার রূপ।

তাঁহার প্রথম সন্তান নবকুমার শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করেন। একমাত্র পুত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারীর অকালমৃত্যুতে পরিবারের সকলে মর্ম্মাহত হইলেন। গিরিবালাও ব্যথিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পুত্রশোকে নিতান্ত মুহ্যমান না হইয়া তিনি দেবতার পূজাধ্যানে অধিকতর আত্মনিয়োগ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই দিব্যানন্দের অনুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। আনন্দের আতিশয্য পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় অধিকাংশ সময় তিনি পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চলে মুখ আবৃত রাখিতেন। প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার মনের অবস্থা যে তখন অস্বাভাবিক, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিতেন। অস্বাভাবিক, কিন্তু তাহা আনন্দে না শোকে, সে কথা ধরা পড়ে নাই। তিনি শোকে অভিভূত হইয়াছেন মনে করিয়া কেহ কেহ সহানুভূতি জানাইয়া বলিতেন,—আহা গো, মেয়েটি পুত্রশোকে পাগল হ'য়ে গেল। তা বাছা, হবারই ত কথা,—প্রথম ছেলে। আবার কেহ সান্ত্বনা দিতেন, ওর কি ছেলে হবার বয়স পেরিয়ে গেছে? এইভাবে আত্মীয়প্রতিবেশীরা যাহার

যেমন ইচ্ছা অভিমত প্রকাশ করিয়া যাইতেন। গিরিবালা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

এই সময়ে অযোধ্যা হইতে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন এক যোগিপুরুষ কলিকাতায় আসেন। কালিদাসী দেবী সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে আনাইয়া সকল দুঃখ নিবেদন করিলেন। যোগীর নির্দ্দেশানুযায়ী প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং যাগযজ্ঞ করান হইল। তিনি বলিয়া গেলেন, গিরিবালার আরও পুত্রকন্যা হইবে। ইহার পর অবিনাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরে বিপিনকালীর জন্ম হয়।

তিনটি সন্তানের জননী হইয়াও গিরিবালা দেবীর মন পূর্ব্ববৎ মহামায়ার পাদপদ্মেই বিচরণ করিত। একদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জপধ্যানে নিমগ্ন থাকাকালে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন।—নীরব নিস্তব্ধ রজনী। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া এক জ্যোতিঃ বাহির হইয়া ভূমণ্ডল আলোকিত করিল। ক্রমে সেই জ্যোতিঃ সংহত হইয়া মহামায়ার মূর্ত্তি ধারণ করিল। মহামায়া ভুবন আলো করিয়া হাসিতেছেন, দুই হাতের উপর এক দিব্য শিশু কন্যা। শিশুর রূপ এমনই অনিন্দ্যসুন্দর যে, বার-বার দেখিয়াও গিরিবালার নয়নের তৃষ্ণা এবং মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা মিটিতেছে না। দেবশিশুকে একটিবার নিজের বুকে তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মহামায়া সহাস্যবদনে গিরিবালার দিকে দুই হস্ত প্রসারণ করিলেন। তিনিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়

মহামায়ার হাত হইতে শিশুকে লইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সব ভুলিয়া গেলেন। পরম আনন্দে যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তখন মহামায়া এবং বক্ষঃস্থিত শিশু দুই-ই ইন্দ্রজালের মত অদৃশ্য হইয়াছেন। সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। গিরিবালা সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটাইলেন।

ইহার পরেই মৃড়ানী জন্মগ্রহণ করেন, ১২৬৪ সালে।

বাল্যজীবন

শিশুকাল হইতেই মৃড়ানীর আচরণে অসাধারণ ধর্ম্মভাব দেখা যায়। কখনও কোন কারণে কাঁদিলে, কেহ ঠাকুরদেবতার নাম করিলেই বালিকা শান্ত হইতেন। খেলার ঠাকুরকে নিজের ভাবে পূজা করিতেন, ভোগ দিতেন এবং প্রাণের আনন্দে সাজাইতেন। দীনদুঃখী দেখিলে তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত। ভিক্ষুককে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু ভিক্ষা দেওয়া না হইত, তিনি স্বস্তি অনুভব করিতেন না। কোন কিছুর জন্য আবদার বা যাচ্ঞা তাঁহার ছিল না। খেলাধুলা, আহার বা বেশভূষায় তাঁহার কোনদিনই বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না।

একদিন অগ্রজের সহিত গঙ্গাবক্ষে নৌকাভ্রমণের সময় মৃড়ানীর মনে হইল, আচ্ছা, মেয়েরা এত গয়নার বোঝা ব'য়ে বেড়ায় কেন? আমারও গয়না না পরলে দুঃখ হবে কি? বালিকার কি খেয়াল হইল, হাতের একগাছি সোনার বালা খুলিয়া কতক্ষণ দাঁতে চিবাইয়া দেখিলেন, তাহাতে কোন সুস্বাদ নাই। তাহার পর অগ্রজের দৃষ্টির অগোচরে তাহা জলে ফেলিয়া দিলেন। অবশ্য, বাড়ী ফিরিয়া ইহার জন্য আত্মীয়পরিজনের নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মাছমাংসের প্রতি তাঁহার জন্মাবধি বিতৃষ্ণা ছিল। আমিষ আহার ভাল কি মন্দ, এই বিচারবিতর্ক মনে জাগিবার পূর্ব্ব

হইতেই আমিষের গন্ধ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই বিরুদ্ধ সংস্কারের জন্য কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন, কোথাকার সাতজন্মের বিধবা! মাছ খাবে না, গয়না পরবে না; মেয়ের সবই যেন সৃষ্টিছাড়া!

বালকবালিকাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সামান্য কারণে কলহ হইয়া থাকে। গুরুতর কারণ ঘটিলেও মৃড়ানী কাহারও সহিত বিবাদ করিতেন না, গুরুজনের কাছে কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন না; অথচ নির্ভীকতা এবং চিত্তের দৃঢ়তা তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তিরস্কার বা প্রহারের ভয়ে তিনি নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেন না।

মৃড়ানীর উপর কালিদাসী দেবীর অত্যধিক স্নেহ ছিল। মৃড়ানীও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার পরেই চণ্ডী-মামা। চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের জনৈক বৃদ্ধ আত্মীয় এবং সাধুচরিত্রের লোক। বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁহাকে 'বাছা' বলিয়া ডাকিতেন, আর পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'চণ্ডীমামা' বলিয়া ডাকিত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। একদিন তিনি বালকবালিকাদিগের হাত দেখিতে বসিয়া মৃড়ানীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এ মেয়ে যোগিনী হবে।" বলা বাহুল্য, মৃড়ানীর আত্মীয়স্বজনেরা জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

চণ্ডীমামা অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, অনেক তীর্থ পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি নানান স্থানের গল্প বলিতেন।

কোন্ তীর্থে কোন্ ঠাকুর আছেন, হিমালয়ের পথ কিরূপ দুর্গম, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিরূপ মনোরম, কোথায় কোন্ নদী, কোথায় উষ্ণ প্রস্রবণ ইত্যাদি বিবরণ শুনিয়া মৃড়ানীর কল্পনা অপরিচিত রহস্যময় জগতে ঘুরিয়া বেড়াইত, তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। গ্রহতারার গল্প শুনিতে শুনিতে বালিকা একদিন বলিয়াছিলেন, "যে মালমসলায় ঈশ্বর চাঁদ গড়েছেন, তারই বাকিটা ছিটিয়ে বুঝি আকাশে এত তারার সৃষ্টি করেছেন?" নিতান্ত ছেলেমানুষেরই কথা, কিন্তু ইহাতে বালিকার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃড়ানীর মাতা এবং মাতামহী তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসের সর্ব্ব-প্রকার সুযোগ প্রদান করেন। যেমন স্বভাবচরিত্রে তেমনই লেখাপড়ায় আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রশংসা ছিল। ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীগণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

স্যার জন লরেন্স যখন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা তখন রবার্ট মিলম্যান নামক এক সদাশয় ইংরেজ পাদ্রী কলিকাতায় বিশপ হইয়া আসেন। তাঁহার ভগিনী কুমারী ফ্রান্সিস মেরিয়া মিলম্যানও ভ্রাতার সহিত আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় উচ্চবর্ণের হিন্দু বালিকাদিগের জন্য ভবানীপুরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।* মৃড়ানী এই

*"Amongst the good works set on foot by Bishop Milman in India, was a high-caste girls' school in Bhowanipore, the native quarter, near Cathedral.

বিদ্যালয়ে কিছুকাল পাঠাভ্যাস করেন। ইহার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন কুমারী হারফোর্ড। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ও স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, এবং অনারেব্‌ল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুগণ এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

কুমারী মিলম্যান মৃড়ানীর গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশ্য, সেকালের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। তদানীন্তন লাট সাহেবের পত্নী বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিষয়ে উত্তম ছাত্রী বলিয়া মৃড়ানীকে একটি বহুমূল্য স্বর্ণখচিত পেটিকা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

Miss Hurford, the lady placed in charge of the school, lived in a small house in the Bishop's compound, where she was joined before long by Miss Cameron, a lady who was sent out, on the application of Bishop Milman, by the Committee of the Ladies' Association of the S. P. G."

"Bishop Milman had been accompanied to India in 1867 by his sister Maria, who had always made her home with him. She was of invaluable assistance to her brother during the eight years of his episcopate, sympathising with all his work, and entering most ably and warmly into the social side of it..."

"Life of Angelina Margaret Hoare,"
published by Wells, Gardner, Darton & Co., London.

বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়ায় মৃড়ানী মিশনারীদিগের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছাত্রী তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি একটি ছোট পাঠশালা খুলিলেন, অবস্থা বুঝিয়া অল্পদিনের মধ্যেই মিশনারীগণ ছাত্রীদের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলিলেন।

এই ঘটনার পর মৃড়ানীর আর বেশীদিন বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় নাই। তাঁহার প্রবল ধর্ম্মানুরাগ এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তৎকালীন সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ—প্রধানতঃ এই দুই কারণে তাঁহার বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়। তথাপি, এই বয়সের মধ্যেই বহু দেবদেবীর স্তোত্র, চণ্ডী, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অনেক অংশ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল।

দামোদর

মহাপুরুষগণের জীবনকথা সম্যক্ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই জনকজননীর আদর্শ তাঁহাদের চরিত্রকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। জনকজননী চতুষ্পার্শ্বে যে আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেন, সন্তানের চরিত্রগঠন এবং প্রতিভার উন্মেষসাধনে সেই আবেষ্টনীর প্রভাব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ, সন্তানের শিক্ষার উৎকর্ষ এবং মনোবৃত্তির বিকাশসাধনে জননীর চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করে।

মৃড়ানীর চরিত্রগঠনেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মাতা এবং মাতামহী যে কিরূপ অসাধারণ নারী ছিলেন তাহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পিতা পার্ব্বতীচরণ ছিলেন উচ্চবংশের সন্তান এবং সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের প্রভাব বালিকার চরিত্রে সংক্রমিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে ভাগবত মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। মৃড়ানীর মনের স্বাভাবিক গতি ছিল ভগবদভিমুখী। তাঁহার জীবনের প্রথম এবং প্রধান কথা—ভগবানে অবিচলিত ভক্তি। সে ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে মাতা এবং মাতামহীর পবিত্র প্রভাবে। তাঁহাদের অনুকরণে বালিকাও পূজার্চ্চনায় যোগ দিতেন, রাত্রিতে উঠিয়া ঠাকুরনাম করিতেন। ইহা বালিকাসুলভ বাহ্যিক অনুকৃতিমাত্র নহে, ইহাতেই তিনি অপার আনন্দ লাভ করিতেন।

মৃড়ানীর মাতা এবং মাতামহী কালীর উপাসিকা ছিলেন। মৃড়ানীর মনে বাল্যকাল হইতে কালীর প্রতি যেমন, শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গদেবের প্রতিও তেমনই ভক্তি ছিল। বিশেষতঃ, চণ্ডীমামার নিকট মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রেম ও বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তিনি প্রাণে গভীর আনন্দ এবং অনুপ্রেরণা পাইতেন। ঈশ্বর এক, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে এবং রূপে তিনি বিভিন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশমান,—এই বিষয় লইয়া অন্যের সহিত তর্ক করিবার ক্ষমতা তখন তাঁহার না থাকিলেও, এই পরম সত্য সহজাত সংস্কারের বশে আপনা হইতেই যেন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

একদিন সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, মৃড়ানী মাটীর এক শালগ্রাম গড়িয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে তাঁহাকে বুঝাইলেন, মাটীর শালগ্রাম পূজা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া বংশের একমাত্র দুলাল অবিনাশচন্দ্রকে পাওয়া গিয়াছে, ইহার ফলে হয়ত তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু, বালিকাকে ঐ শালগ্রাম-পূজা হইতে বিরত করা গেল না। নয়ন নিমীলন করিয়া নিষ্ঠাবতী বালিকা যখন পূজায় মনোনিবেশ করিতেন, তখন সত্যই মনে হইত, নগাধিরাজ হিমালয়ের পরম আদরের দুহিতা গৌরী বুঝি কঠোর তপশ্চরণে বসিয়াছেন।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন প্রাক্তন পুণ্যফলে তাঁহাদের বাটীর সন্নিকটে জনৈক সাধকের সহিত শুভক্ষণে মৃড়ানীর সাক্ষাৎ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নিকট মৃড়ানী যেভাবে দীক্ষালাভ করেন, তাহা পূর্ব্বেই 'অবতরণিকা'য় বর্ণিত হইয়াছে।

এই সাধক মধ্যে মধ্যে কালীঘাটে মা-কালীর মন্দিরে এবং চেতলায় যাতায়াত করিতেন। কালিদাসী দেবীর আশ্রিতা এক বৃদ্ধা তাঁহাকে 'ঠাকুরমশাই' বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এবং ভক্তি করিতেন।

সাংসারিক কোন কার্য্যোপলক্ষে এই সময় মৃড়ানীর অগ্রজ অবিনাশচন্দ্র এবং একজন পুরাতন কর্ম্মচারীকে মাসীমাতা বগলা দেবীর শ্বশুরালয় বরাহনগরে যাইতে হইয়াছিল। মৃড়ানী এই সুযোগ ছাড়িলেন না, তিনিও ভ্রাতার সহিত বরাহনগরে গেলেন; কিন্তু, মনের অভিপ্রায় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। সেইস্থান হইতে আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে তিনি একদিন নিমতে-ঘোলার কলাবনে পূর্ব্বোক্ত সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষালাভ করেন। সাধক মধ্যে মধ্যে এই কলাবনে আসিয়া একটি নিভৃত অংশে সাধনভজন করিতেন।

বরাহনগর হইতে মৃড়ানীর অদর্শনের সংবাদ ভবানীপুরে আসিয়া যখন পৌঁছিল, তখন গিরিবালা এবং অপর সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। উক্ত সাধকের সহিত মৃড়ানীর ভবানীপুরে সাক্ষাতের দিন ঐ আশ্রিতা বৃদ্ধাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেদিনকার কথাবার্ত্তা অনুযায়ী তিনি অনুমানে বলেন, "ঠাকুরমশায়ের এখন নিমতে-ঘোলার উৎসবে থাকার কথা, মান্তু হয়ত তাঁকে দেখতে গেছে।" এই সংবাদ বরাহনগরে প্রেরিত হয় এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই অবিনাশচন্দ্র কলাবনের কুটীরে গিয়া ভগিনীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

হিন্দুর সাধনপথে প্রধান সোপান—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা-লাভ। শাস্ত্র বলে, সদ্‌গুরুর কৃপা না পাইলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। আবার গোবিন্দের কৃপা থাকিলে সদ্‌গুরু আপনি আসিয়াই সিদ্ধির পথ দেখাইয়া দেন। সাধনার ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মৃড়ানীর ঐকান্তিক ব্যাকুলতা এবং সুকৃতির ফলে তাহাই ঘটিল।

কে এই সাধনপথের পথিক—যাঁহার ক্ষণিকের বিদ্যুৎস্পর্শ মৃড়ানীর ঊর্দ্ধমুখী চিত্তকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়াছিল, কে এই মহান সাধক—যাঁহার অমোঘ মন্ত্রশক্তি মৃড়ানীর আধ্যাত্মিক রাজ্যকে আলোকিত এবং সমৃদ্ধ করিয়াছিল, কে এই সনাতন ব্রাহ্মণ—যাঁহার পদতলে নব্যভারত অমৃতমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, তাহা দৈবচালিত বালিকা তৎকালে সবিশেষ জ্ঞাত না থাকিলেও, উত্তরকালে তাঁহার চরণপ্রান্তে পুনরায় উপনীত হইয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই মন্ত্রগুরু সাধকের পরিচয় আমরা যথাকালে বলিব।

দীক্ষালাভের কিছুকাল পরে তাঁহাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে এক অপরিচিতা ব্রজরমণী অতিথিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আদরযত্ন করিয়া রাখা হইল। তিনি বলিতেন, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ব্রজরমণী অতিশয় ভক্তিমতী, চিরকুমারী এবং শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-নিবেদিতা। অধিকাংশ সময় তিনি পূজাধ্যানে রত থাকিতেন এবং অন্য সময় মহিলাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতেন।

একদিন মৃড়ানী দেখিতে পাইলেন, ঘরের মেঝেতে একখণ্ড কাল পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরটি হাতে তুলিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, বাঃ! এ ত নারায়ণশিলার মত, ভারী সুন্দর! কোথেকে এলো? ইতোমধ্যে ব্রজরমণী আলুথালুবেশে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "খুকি, কৈ আমার ঠাকুর? আমার ঠাকুর দাও।" জ্বলন্ত দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বালিকার দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বালিকার হাত হইতে নারায়ণশিলা একরকম কাড়িয়া লইয়াই নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি ঝড়ের মত বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বালিকা বিস্ময়ে অবাক্!

ক্রমে ব্রজরমণীর সহিত বালিকার খুব ঘনিষ্ঠতা হইল। বালিকার নিষ্ঠাভক্তি দর্শনে তিনি পরম প্রীত হইলেন, আবার সময় সময় যেন রোষ ও অভিমানের ভাবও দেখাইতেন। কিন্তু, বালিকার মন তাঁহার ঘরেই পড়িয়া থাকিত। উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব দেখিয়া বাড়ীর সকলে কৌতুক বোধ করিতেন।

একদিন ব্রজরমণী বালিকাকে নিভৃতে নিজের কক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর-ধারায় অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হইল। বালিকা অপরাধীর মত বিমূঢ়দৃষ্টিতে কেবল দেখিতে লাগিলেন। ব্রজরমণী তাঁহার নিকট নারায়ণশিলার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। বালিকা সবিস্ময়ে তাঁহার কথাগুলি যেন কর্ণপুটে পান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল, একি স্বপ্ন, না সত্য?

ব্রজরমণী বলিতে লাগিলেন, "তুমি বয়সে আমার কন্যাস্থানীয়া হইলেও, আজ হইতে তুমি আমার ভগিনী; বড় ভাগ্যবতী তুমি। এই * * শিলা আমার ইহকালের ও পরকালের সর্ব্বস্ব। বড় জাগ্রত ঠাকুর ইনি। তোমার প্রেমে ইনি মজিয়াছেন। তোমার হাতে ইঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি * * চলিলাম। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। * *"

রহস্যময়ী ব্রজরমণী একদিন যেমন অলক্ষ্যে অযাচিতভাবে আসিয়াছিলেন, তেমন সেই দিনই আবার অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন! পরবর্ত্তী জীবনে মৃড়ানী অনেক দেশভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আর তাঁহার দর্শন পান নাই।

এই নারায়ণশিলা 'রাধা-দামোদর,' 'দামোদর' এবং 'দামু' নামে অভিহিত। ইনি সেইদিন হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মৃড়ানীর অবিচলিত সেবা, ভক্তি ও ভালবাসা পাইয়াছেন। ব্রজরমণী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দামোদরের নিত্যসেবার প্রত্যেকটি বিধি মৃড়ানী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অতিশয় নিষ্ঠার সহিত যথাযথ-ভাবে পালন করিয়াছেন। তাঁহার অলোকসামান্য জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত এই জাগ্রত ঠাকুরটি ছিলেন তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়,—নিত্যসাথী।

বিবাহের চেষ্টা

সংসারে মৃড়ানীর অনাসক্তি দেখিয়া পরিবারের সকলেই চিন্তিত হইলেন। সত্বর তাঁহার বিবাহ দেওয়া সঙ্গত বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন। ভাবিলেন, হয়ত ইহার ফলে তাঁহার মন সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইবে। দশম বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার বিবাহের অনেক সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, "তেমন বরকেই বিয়ে করবো যে কখনো মরে না,"—ভগবান ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে তিনি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার দিব্য ভাবলক্ষণ জানিয়া পাত্রপক্ষীয় লোকদের মনেও ধারণা হইল যে, 'কন্যা একেবারে পাগল না হইলেও ঠিক প্রকৃতিস্থ নহেন; এইরূপ মানুষকে 'দেবী' বলিয়া প্রশংসা করা চলে, কিন্তু ইঁহাকে লইয়া ঘরসংসার করা চলিবে না।

গিরিবালা কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিলেন। স্বপ্নে মহামায়ার দর্শন, কন্যার আধ্যাত্মিক উন্মাদনা এবং তাঁহার বৈরাগ্য সম্বন্ধে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী, এইসকল গিরিবালাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। বিবাহ দিলে কন্যা সুখী হইবে, কি দুঃখ পাইবে, ভাবিয়া তিনি কিছুই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কন্যার পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন জোর করিয়াই তাঁহার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, বিবাহ

একবার হইয়া গেলে ক্রমে ক্রমে মৃড়ানীর মনের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তাঁহার ভাবাবেশকে ব্যাধিবিশেষ মনে করিয়া আত্মীয়গণ তাঁহার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিলেন।

বিবাহ সম্বন্ধে মৃড়ানীর প্রতিকূল আচরণে পরিবারে অশান্তির সূত্রপাত হইল। কন্যার প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করিয়া, জোর করিয়া তাঁহার বিবাহ দিতে গিরিবালা উৎসাহ পাইলেন না। বিবাহদানে যাঁহারা প্রধান উদ্যোগী হইলেন, তাঁহাদের জেদ ইহাতে আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা স্থির করিলেন, সমাজের বিধি লঙ্ঘন করা চলিবে না, বিবাহ দিতেই হইবে। অন্যান্য সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে তাঁহারা বালিকার ভগিনীপতি পানিহাটি-নিবাসী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কেই পাত্র স্থির করিলেন। এরূপ ব্যবস্থায় সকলে এই ভাবিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন যে, শ্বশুরবাড়ী যদি কখনও যায়, তাহা হইলেও সহোদরা বিপিনকালীর যত্নে মৃড়ানীর কোন কষ্ট হইবে না।

তাঁহার বয়স তখন তের। বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত হইল। বিবাহদিবসে তিনি রুদ্রাণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বাড়ীর একটা ঘরে ইমারতের পুরাতন জিনিষপত্র স্তূপীকৃত ছিল। বিবাহোৎসবের কিছু কিছু দ্রব্যও সেই ঘরে রাখা হইয়াছিল। মৃড়ানী তাঁহার নিত্যপূজার দামোদর এবং গৌরাঙ্গদেবের একখানি পট লইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দরজার খিল বন্ধ করিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে গেলে তিনি কটূক্তি

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে যতই স্তোক বাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করা হইল, তাঁহার ক্রোধ ততই বাড়িয়া চলিল। বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি একেবারে রণচণ্ডী হইয়া উঠিলেন। কন্যার অবস্থা দেখিয়া পিতা পার্ব্বতীচরণের উৎসাহ এবং চেষ্টা আস্তে আস্তে কমিয়া আসিতেছিল, অবশেষে তিনি একেবারে দমিয়া গেলেন। যাঁহারাই কাছে আসিলেন, মৃড়ানী সকলকেই ইটপাটকেল, দই-এর ভাঁড় প্রভৃতি ছুড়িয়া মারিতে লাগিলেন। তাঁহারাও চটিয়া আগুন,—একি সৃষ্টিছাড়া কথা! এতটুকু মেয়ে, তা'র আবার এত জেদ! আমরা যা' ভাল বুঝব, তাই হবে।

তাঁহারা এইবার গিরিবালা দেবীকে ধরিলেন। তিনি বলিলেন, "বাপভাই সকলে মিলে বোঝাতে পারলে না। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি করব? তোমরা নিজেরা যা' পার কর।"

বাহিরে বিবাহসভায় সকলে মিলিয়া যখন মন্ত্রণা করিতেছিলেন, পরের লগ্নে যে-ভাবেই হউক সম্প্রদানকার্য্য শেষ করিতে হইবে, তখন অন্তঃপুরে গিরিবালা কন্যার ঘরের জানালায় আসিয়া বলিলেন, "মান্তু, লক্ষ্মীটি, আমায় বিশ্বাস কর্, দোর খুলে দে।"

দরজা খুলিয়া দিয়া মৃড়ানী মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।—"মানুষকে আমি বিয়ে করবো না, মা।"

গিরিবালা আসিয়াছিলেন কন্যাকে সদুপদেশ দানে বিবাহে সম্মত করাইবার সঙ্কল্প লইয়া; কিন্তু কন্যার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়ে দুঃখও হইল, আশঙ্কাও হইল, শেষে কি মেয়ে আমার

পাগল হ'য়ে যাবে, আত্মঘাতী হবে ? কুলীনের মেয়ে, না-ই-বা হলো বিয়ে।

কন্যাকে প্রবোধ দিয়া তিনি বলিলেন, "মা, তোর যদি বৈরাগ্যের ফুল সত্যিই ফুটে থাকে, আমি বাধা দেবো না।" মঙ্গলময় নারায়ণের পাদপদ্মে নয়নজলে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া কল্যাণময়ী জননী ভক্তিমতী কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আচ্ছা, ভগবানের পায়েই তোকে সমর্পণ করলুম। তিনিই তোকে সকল বিপদ থেকে রক্ষে করবেন।" নির্দ্দিষ্ট লগ্নে জননী অজর অমর জগৎস্বামীর পাদপদ্মে কন্যাকে সমর্পণ করিলেন।

গিরিবালা অন্যান্য আত্মীয়পরিজনের মনের গতি জানিতেন, উপস্থিত সঙ্কট হইতে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া কন্যাকে বলিলেন, "ওরা এক্ষুণি এসে তোকে মারধর করবে। তুই আজ ঠান্‌দির বাড়ী গিয়ে লুকিয়ে থাক্।" মহানিশার মধ্যে বালিকা অপ্রত্যাশিত-ভাবে মুক্তিপথের আলোক দেখিতে পাইলেন। লৌকিক সম্প্রদান এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের পূর্ব্বেই দামোদর-গৌরাঙ্গকে লইয়া বালিকা খিড়কী-দরজা দিয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন।

গিরিবালা গর্ভধারিণী হইয়া, বাংলার তৎকালীন হিন্দুসমাজের পুরোভাগে থাকিয়া, স্বামিপুত্রের অগোচরে যে-পথ নিজ দুহিতাকে দেখাইয়া দিলেন তাহা অভাবনীয়। দেবতার বিভুত্বে বিশ্বাসবতী, ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিতা গিরিবালার পক্ষেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

এমনই একদিন রাজমহিষী সুনীতি নিজের বুক শূন্য করিয়া একমাত্র নয়নমণি শিশুপুত্র ধ্রুবকে গহন বনের পথে ছাড়িয়া

দিয়াছিলেন। এমন ভাবেই একদিন তত্ত্বদর্শিনী রাণী মদালসা একে একে তাঁহার তিন পুত্রকে স্বামীর অগোচরে প্রব্রজ্যায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ভারতবর্ষে একদিকে যেমন অনেক বীর-জননী স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য আপন সন্তানকে নিজহস্তে অসিবর্ম্মে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে অনেক ভগবৎপ্রাণা জননী নিজহস্তে আপন সন্তানকে সন্ন্যাসী সাজাইয়া পরমধনের সন্ধানেও পাঠাইয়াছেন। ধন্য এই দেশ ভারতবর্ষ!

বন্ধন-মুক্তি

মুক্তিলাভ করিয়া মৃড়ানীর খুব আনন্দ হইল। নিকটেই ছিল গিরিবালা দেবীর এক বিধবা মামীমার বাড়ী, জননীর নির্দ্দেশানুযায়ী কন্যা সেই রাত্রিতে তথায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি স্থির করিলেন, ভোররাত্রিতে সেই স্থানও ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, আর গৃহে ফিরিবেন না। তিনি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতবাসের সংবাদ যেন কাহাকেও বলা না হয়।

মৃড়ানীর অদর্শনে সকলেরই মনের রোষ আতঙ্কে পরিণত হইল। এই রাত্রিতে মেয়ে গেল কোথায়? জলে ডুবিয়া মরে নাই ত? গিরিবালা নীরব, যেন কিছুই জানেন না, কিছুই হয় নাই! উপস্থিত সকলে পরামর্শ করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন, বিবাহ ঠিকই হইয়া গিয়াছে, সম্প্রদানের পর শেষরাত্রিতে কন্যা পলায়ন করিয়াছে।

আশ্রয়দাত্রীর কৌশলে মৃড়ানী সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না। দুই-এক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনা হইল। গিরিবালা যে কন্যাকে গোপনে পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অপ্রকাশ রহিল না। সকলে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

মৃড়ানীর উপর সকলের প্রখর দৃষ্টি সজাগ রহিল। তিনি আপন মনে পূজাধ্যান করেন। যাহাতে তাঁহার কোন অসুবিধা

না হয় এবং যাহাতে তিনি বাড়ীতেই থাকেন, এই উদ্দেশ্যে পৃথক্ একখানা ঘর তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মাতাপিতা কন্যার আচরণে বাধা না দিলেও অন্যান্য আত্মীয়পরিজনের কেহ কেহ তাঁহার পূজাধ্যান এবং স্তবকীর্ত্তন লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না। বালিকা নীরবে সকলই সহ্য করিতেন। কিন্তু সংসারকে তাঁহার সাধনভজনের বিঘ্নস্বরূপ মনে হইতে লাগিল। চণ্ডীমামার মুখে তিনি হিমালয়ের সাধুসন্ন্যাসিগণের তপস্যার কথা শুনিয়াছিলেন। দেবভূমি হিমালয়ের গভীর অরণ্যানীতে বসিয়া কঠোর তপস্যা না করিলে ভগবানকে লাভ করা যায় না, এই ধারণা তাঁহার মন অধিকার করিয়া বসিল।

সুযোগ পাইয়া একদিন ভোররাত্রিতে মৃড়ানী আবার পলায়ন করিলেন। সদর দরজায় তন্দ্রাচ্ছন্ন দারোয়ান তাঁহাকে দুই-একটি প্রশ্ন করিয়াই ছাড়িয়া দিল। বড় রাস্তায় যাইয়া বালিকা কেবল দৌড়াইতে লাগিলেন। মহামায়া এইবার তাঁহাকে মায়ার পরীক্ষায় ফেলিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখেন —মাতুলালয়ের সদর দরজা। অন্য পথে গেলেন, সেদিকেও যেন ঐ দরজা। তখন দিশাহারার মত বালিকা প্রাণপণে এদিক-ওদিক দৌড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে দারোয়ানের তন্দ্রা যখন ছুটিয়া গেল, সে ভাবিল, তাইত, খিড়কী-দরজা দিয়া গঙ্গায় না গিয়া দিদিমণি আজ এই পথে কেন গেলেন? বুঝিতে বাকি রহিল না, দিদিমণি আবার পলাইয়াছেন। সংবাদটা প্রকাশ হইলে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি

পড়িয়া গেল। বালিকা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া এইবার বাড়ীর একটি পৃথক্ মহলে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল।

তাঁহার বৈরাগ্যদর্শনে পরিবারস্থ সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে কোনপ্রকারে উৎপীড়ন অথবা অসন্তুষ্ট করাও তাঁহারা অসমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহার বিবাহের চেষ্টা আর তাঁহারা করিবেন না; কিন্তু তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গৃহে থাকিয়া কি ভগবান লাভ করা যায় না? সকলে স্থির করিলেন, তাঁহাকে গৃহেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শন এবং সাধুদর্শনে লইয়া গেলেই হইবে। তাহাতে হয়ত তিনি মনে শান্তি পাইবেন। নিমতে-ঘোলায় সেই সাধকের সংবাদ লইয়া জানিলেন, "ঠাকুরমশাই এ তল্লাটে নেই, কোথায় চ'লে গেছেন।"

পরমভক্ত ভগবানদাস বাবাজী তখন কালনায় থাকিতেন। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তৎকালে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল এবং অনেকে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। মৃড়ানীর খুল্লতাত করালীচরণ এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া বাবাজীর দর্শনে গেলেন। তাঁহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া যাহাতে তিনি বাড়ীতে থাকিয়াই সাধনভজন করেন, বাবাজীর মুখ হইতে তাঁহারা এইরূপ উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

বালিকার অলৌকিক ইতিহাস শ্রবণে প্রীত হইয়া বাবাজী তাঁহাদিগকে বলিলেন, "বাবা, তোমাদের মেয়ে ত তবে সামান্য নয়! এযে তোমাদের ভাগ্যের কথা। জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যবল

না থাকলে ওভাবে গুরুকৃপা লাভ হয় না।" মৃড়ানীকেও উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "উত্তম পথ ধরেছ মা, গুরুর নাম সম্বল ক'রে এগিয়ে যাও।"

তাঁহারা মৃড়ানীকে লইয়া নবদ্বীপেও গিয়াছিলেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বালিকা মুগ্ধ হইলেন। মহাপ্রভুর মন্দিরসংলগ্ন এক কুটীরে পরমবৈষ্ণব সিদ্ধ-চৈতন্যদাস বাবাজী বাস করিতেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকে তিনি পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং নিজে আচারব্যবহারে বেশভূষায় ঠিক পত্নীর ন্যায় থাকিতেন। তাঁহাকেই দর্শন করিতে যাইয়া, কিন্তু নারীবেশে থাকাহেতু তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অনেকে হতাশ মনে ফিরিয়া আসিতেন। সাধনভজনের ব্যাঘাত হইত বলিয়া তিনিও লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। প্রিয়তম গৌরাঙ্গদেবের দেহের রঙ গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া তিনি তাঁহার বস্ত্র, গায়ের কাঁথা, হাতের নখ, এমন-কি, অন্নব্যঞ্জন পর্য্যন্ত হলুদ অথবা জাফরান দিয়া গৌর রঙে রাঙাইতেন। এই সৌর জগৎটাই তাঁহার নিকট 'গৌর-জগৎ' হইয়া গিয়াছিল।

সিদ্ধ-চৈতন্যদাস বাবাজীর নিষ্ঠাভক্তি মৃড়ানীর বড় ভাল লাগিল। আবার, এমন একটি অল্পবয়স্কা বালিকার বৈরাগ্য এবং দামোদর-লাভের কথায়, বিশেষ করিয়া তাঁহার গৌরাঙ্গ-প্রীতির কথা শুনিয়া বাবাজীও উল্লসিত হইয়া বলিলেন, "বাঃ, একি সত্যি? এমনটি ত শোনা যায় না!"

বাবাজীর একখানি গৌরবর্ণের বেনারসী শাড়ী পরিয়া

গৌরাঙ্গদেবের সেবা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার অনেক ভক্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনোমত শাড়ী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। একবার কথাপ্রসঙ্গে মৃড়ানীর নিকট তিনি তাহা ব্যক্ত করেন। মৃড়ানী অগ্রজের সাহায্যে ঐরূপ একখানি শাড়ী ক্রয় করিয়া বাবাজীকে প্রদান করেন। শাড়ীখানি পাইয়া বাবাজীর এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি বহু লোককে তাহা দেখাইয়া তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।*

* সিদ্ধ-চৈতন্যদাস বাবাজী সম্বন্ধে গৌরীমা বলিতেন,—ভগবানকে এইভাবে প্রিয়তম পতির ন্যায় কায়মনোবাক্যে ভালবাসিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয় তাঁহার প্রিয়তম গৌরাঙ্গদেবকে বুকে লইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতেন। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে যদি প্রিয়তমের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কখনও বাম পার্শ্বে শয়ন করিতেন না। এই কারণেই না-কি অবশেষে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ এবং ভক্তগণের অনুনয় বিনয় কিছুই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি হাসিয়া বলিতেন, এই তুচ্ছ রক্ত-মাংসের খাঁচা প'চে গেলেও বাকি ক'টা দিন আমার এভাবেই যাবে।

বৃন্দাবনবাসী জনৈক শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের লীলাভূমি বৃন্দাবনে যাইতে একবার আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি যথেষ্ট বিনয়সহকারে বলিয়া পাঠাইলেন, শ্রীবৃন্দাবনের পতি আমার হৃদিবৃন্দাবনে আছেন, ন'দে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। যেদিন দেহরক্ষা করেন, সেদিন সকাল হইতে তিনি গাহিয়াছিলেন,—

ন'দের চাঁদের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা।
আমার সাধন হলো সারা, আমার ভজন হলো সারা॥

আরও কিছুকাল গত হইল, কিন্তু মৃড়ানীর মন কিছুতেই শান্ত হইল না। কোলাহলময় সংসারে অবস্থান তাঁহার পক্ষে ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। কিসের অন্বেষণে, কাহার আকর্ষণে তাঁহার চিত্ত নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইত! কি যেন চাহিতেছেন, অথচ তাহা তাঁহাকে ধরা দিয়াও দিতেছে না!

চিন্তার অকূল পাথারে মৃড়ানী ভাসিতে লাগিলেন।—দৈবানুগ্রহে গুরুর কৃপা লাভ লইল, অযাচিতভাবে দামোদর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাপি কেন চিত্ত পূর্ণতায় পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে না? কিন্তু, এই পাওয়াই কি চরম সার্থকতা? কৈ, এই প্রস্তরময় ঠাকুর ত আমার সঙ্গে কথা কন না! আমাকে ত তাঁহার ভুবনমোহন রূপে দেখা দেন না! কৈ, তাঁহার নূপুরের রুণুঝুণু ধ্বনি, মোহনমুরলীর সুর ত শুনিতে পাই না! দামোদর কি তবে শুধুই শিলা? গিরিধারিলাল ত মীরাবাঈ-এর সঙ্গে কথা কহিতেন! ব্রজমায়ী কি তবে মিথ্যা বলিয়া গেলেন? নাঃ, তিনি মিথ্যা বলিতে পারেন না। আমাকে অনেক তপস্যা করিতে হইবে, কঠোর তপস্যা। আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া দামোদরকে ভালবাসিব। ইঁহার মুখ হইতে কথা বাহির করিব, ইঁহার রূপ দেখিয়া নয়ন এবং জীবন সার্থক করিব। কিন্তু সংসারের মধ্যে বাস করিয়া, এইভাবে বন্দিনী থাকিয়া তাহা কি কখনও সম্ভব হইবে?

তিনি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কিভাবে তাঁহার অভীষ্ট লাভ হইবে। দিবারাত্র ঐ এক ধ্যান—কি করিলে

ভগবানকে পাওয়া যায়। মনের এইরূপ ঐকান্তিক অবস্থায় কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিয়া গেল, মন্ত্রের সাধনেই পরম অভীষ্ট লাভ হইবে। ইষ্টলাভের জন্য যদি তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর, তিনিই তোমাকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবেন। মৃড়ানী কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন, চিত্ত দৃঢ় করিলেন।

সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যার চিত্ত ক্রমেই সংসারবিমুখী হইয়া উঠিতেছে বুঝিয়া গিরিবালা দেবী স্থির করিলেন, কন্যাকে লইয়া তিনি একবার নিজেই তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইবেন। প্রথম গঙ্গাসাগরে যাওয়া স্থির হইল; তাহার পর বারাণসী, মথুরা এবং বৃন্দাবন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি নিজে আর যাইতে পারিলেন না, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী বগলা, ভগিনীপতি বিহারিলাল এবং দেবর করালীচরণের সহিত কন্যাকে সাগরতীর্থে পাঠাইয়া দিলেন। ১২৮২ সালের পৌষ মাসে আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী মিলিয়া প্রায় ত্রিশ জন নৌকাযোগে চলিলেন। মৃড়ানীর বয়স তখন প্রায় আঠার।

সাগরসঙ্গমে যাইয়া মেলা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে আনন্দ ও কোলাহলের মধ্য দিয়া দুইদিন মৃড়ানীকে বেশ খুসী দেখা গেল। তৃতীয় দিনে সুযোগ পাইয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার পূজার ঠাকুর এবং অন্যান্য উপকরণ যখন দেখা গেল না, তখন কাহারও আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি আবার পলায়ন করিয়াছেন। আত্মীয় এবং সঙ্গিগণ হতবুদ্ধি

হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আরও দুই-তিন দিন সেখানে থাকিয়া সাগরতীর, কোতোয়ালের ঘাঁটি প্রভৃতি স্থানে অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু মৃড়ানীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

ষষ্ঠ দিনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বগলা দেবী এই নিদারুণ সংবাদ গিরিবালা দেবীর নিকট প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া নতমুখে কাঁদিতে লাগিলেন। অপর সঙ্গিগণের নিকট হইতে মৃড়ানীর পলায়নের কথা শুনিয়া পরিবারমধ্যে একটা হাহাকার উঠিল। গিরিবালা কন্যাকে অসাধারণ জ্ঞান করিতেন সত্য, তথাপি তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, স্বগৃহে থাকিয়াই মৃড়ানী সাধনভজনের সহায়তায় অভীষ্টপথে অগ্রসর হইবে। ভগবানের কৃপা লাভ করিবার দুর্দ্দম প্রেরণায় তাঁহার কন্যা যে সংসার এবং আত্মীয়পরিজনের মায়াবন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া এইভাবে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে, এত বড় আশঙ্কা গিরিবালার মনে উদিত হয় নাই। কন্যার শোকে স্নেহময়ী জননী শয্যাগ্রহণ করিলেন।

অভিভাবকগণ ঘোষণা করিলেন, যে মৃড়ানীর সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কেবল পুরস্কার ঘোষণা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত রহিলেন না, তাঁহার অন্বেষণে তীর্থে তীর্থে লোকও প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

আত্মীয়গণের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া মৃড়ানী গঙ্গাসাগরেই অদূরবর্ত্তী একটা ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি সকলকে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাঁহারা দেখিতে অথবা বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি অদূরেই আছেন। যখন তিনি বুঝিলেন, সঙ্গীরা সকলে দেশে চলিয়া গিয়াছেন, তখন ঝোপ হইতে বাহির হইয়া সাধুসন্ন্যাসিগণের নিকট ভারতবর্ষের নানাতীর্থের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাসাগর হইতে তিনি একদল উত্তর-পশ্চিম দেশীয় সাধুর সহিত হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। ইঁহাদের দলে কয়েকজন সন্ন্যাসিনীও ছিলেন। এইরূপ যোগাযোগে তিনি খুবই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হইলেন। তাঁহার মনে কেবল একটা আশঙ্কা ছিল, কখন আত্মীয়স্বজনের কাছে ধরা পড়িয়া যান; এইজন্য তিনি পাহাড়ীদের মতই বেশভূষা করিতেন এবং অতি সাবধানে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন।

তাঁহার দেহের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল গৌর, দেখিতেও তিনি গিরিরাজ-দুহিতা গৌরীর মতই সুন্দরী ছিলেন, সেইজন্য তীর্থপর্য্যটনকালে প্রথমে পাহাড়ীরা এবং পরে অন্য অনেকে তাঁহাকে 'গৌরামায়ী' বলিয়া ডাকিত। কি করিয়া তাঁহার নাম 'গৌরীমা' হইল, তাহা আমরা যথাস্থানে বলিব। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে 'গৌরীমা' বলিয়াই অভিহিত করিব।

পথে বহু তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিয়া, তাঁহারা প্রায় তিন মাস পরে হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই দীর্ঘ পথ তাঁহারা অনেকটা পায়ে হাঁটিয়া এবং কতকটা রেল গাড়ীতে অতিক্রম করিয়াছিলেন। হরিদ্বার হইতে তাঁহারা হৃষীকেশে আসিলেন। হৃষীকেশ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং এই স্থান হইতেই অধিরোহণ আরম্ভ হয়।

হিমালয় সাধকের সাধনভূমি, দেবতার লীলাভূমি এবং গৌরীর তপোভূমি,—একথা গৌরীমা বাল্যকাল হইতে চণ্ডীমামার মুখে শুনিয়া আসিয়াছেন। এইজন্য হিমালয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। হৃষীকেশে আসিয়া হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন, বিশ্বজননীর মহিমা যেন হৈমবতী প্রকৃতির অঙ্গে ঝলমল করিতেছে!

গৌরীমা আজ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। এখন তিনি আপন ইচ্ছানুসারে দিনের পর দিন একান্তভাবে বসিয়া গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন, কেহ আসিয়া বাধা দিবে না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরম শরণ, অপার আনন্দের শাশ্বত নিলয় পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য নশ্বর রক্তমাংসের দেহ ক্ষয় পাইলেও তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবেন না। যাঁহার প্রেরণায় তিনি স্নেহময় আত্মীয়পরিজনের মায়াপাশ ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহার আকর্ষণে তিনি সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া কৃচ্ছ্র তপস্যা বরণ করিয়া লইয়াছেন, যাঁহার ডাকে তিনি

ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছেন,—তপস্যা এবং ভক্তির সহায়তায় তিনি সেই ইষ্টকে উপলব্ধি করিবেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবেন। অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় গৌরীমার দেহে আজ অমিত শক্তি, প্রাণে অসীম উৎসাহ, গুরুদত্ত মহামন্ত্র তাঁহার দুর্গম পথের সম্বল।

হৃষীকেশ হইতে গৌরীমা দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ তীর্থে গমন করেন। কেদারনাথজী—লিঙ্গরাজ মহাদেব, বদরীনারায়ণজী—কৃষ্ণপ্রস্তরে গঠিত নারায়ণমূর্ত্তি। হিমালয়ের এই দুই শ্রেষ্ঠ তীর্থ দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘকালের মনোবাসনা পূর্ণ হইল এবং সকল শ্রম সার্থক মনে হইল।

কেদারনাথজী ও বদরীনারায়ণজী দর্শনান্তে তিনি রামনগরের পথে হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, অতঃপর পাঞ্জাবে জ্বালামুখী এবং কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শন করেন। জ্বালামুখী—দেবীর পীঠস্থান, অমরনাথজী—লিঙ্গরাজ মহাদেব। এইরূপে প্রায় তিন বৎসর তিনি হিমালয়ের নানাতীর্থে অতিবাহিত করেন। অধিক শীতের সময় হিমালয়ের পাদদেশে থাকিয়াই তপস্যা করিতেন, ধরা পড়িবার ভয়ে একেবারে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিতেন না। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী দর্শন করিতেও গিয়াছিলেন।

অধিকাংশ সময় তিনি পায়ে হাঁটিয়াই চলিতেন। গলায় দামোদর-শিলা ঝুলাইয়া রাখিতেন, ঝোলাতে থাকিত মা-কালী ও গৌরাঙ্গদেবের পট, চণ্ডী, ভাগবত এবং নিত্য ব্যবহার্য্য সামান্য

জিনিষপত্র। অনভ্যাসবশতঃ প্রথম প্রথম পথশ্রমে তাঁহার ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় কষ্টবোধ হইত, ক্রমশঃ সমস্ত কষ্ট অভ্যস্ত হইয়া গেল। হিমালয়ে ভ্রমণকালে অনাহার, দুর্ব্বলতা এবং শীতের প্রকোপে তিনি অনেকবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, সরল পরোপকারী পাহাড়ী নারীগণ নিজেদের বস্‌তিতে লইয়া গিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন।

এই সময় হইতে গৌরীমা গৈরিক বসন পরিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দৈহিক রূপ লোপ করিয়া দিবার জন্য ভগবানের নিকট তিনি প্রার্থনা করিতেন। সময় সময় মৃত্তিকা এবং ভস্ম গায়ে মাখিতেন, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিতেন, কখনও-বা পাগল সাজিতেন। আবার কখনও আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিয়া পুরুষের বেশে থাকিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও সহিত তিনি কথা কহিতেন না। প্রয়োজনমত কখন বলিতেন, তিনি বিবাহিতা, স্বামীর অনুমতি লইয়াই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন; কখনও বলিতেন, স্বামী সঙ্গেই আছেন। বলা বাহুল্য, স্বামী বলিতে তিনি তাঁহার নিত্যপূজিত দামোদর, শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গদেবকেই বুঝাইতেন।

তাঁহার জীবনে এমন সময়ও গিয়াছে যে, দিনের পর দিন উদয়াস্ত তপস্যা করিয়াছেন, মাধুকরীতে বাহির হইবার অবসর পান নাই, ইচ্ছাও করেন নাই; ক্ষুধার তাড়নাই অনুভব করেন নাই। আবার এমনও ঘটিয়াছে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া

কেহ আহার্য্য দ্রব্য রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি আশ্বাসবাণী তাঁহার জীবনে খুবই মিলিয়া যায়,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ *

ক্ষুধাতৃষ্ণা, আপদবিপদ এবং সকল সঙ্কটজনক অবস্থাতেই গৌরীমা অবিচলিত এবং উদাসীন থাকিতেন; কিন্তু ভক্তবৎসল মঙ্গলময় ভগবানের অযাচিত করুণা তাঁহার এই একান্ত শরণাগত ভক্তকে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়াছে।

কোন নির্দ্দিষ্ট দলের সহিত গৌরীমা সকল সময় চলিতে পারিতেন না। যাত্রিগণ হিসাব-করা পথে চলিতেন, তাঁহার তাহা মনোমত হইত না। কোন বিশেষ স্থান বা মন্দির ভাল লাগিলে, তিনি সেই স্থানে অনির্দ্দিষ্ট কাল থাকিয়া তপস্যা করিতেন; পরে হয়ত অন্য এক দলের সহিত মিলিয়া আবার কিছুদূর অগ্রসর হইতেন। কিন্তু এই কারণে অনেক সময় তাঁহাকে দারুণ অসুবিধা এবং কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে; কোন কোন দিন পথ ভুল হওয়ায় গভীর অরণ্যানীর মধ্যে দিগ্‌ভ্রম ঘটিয়াছে, বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পান নাই।

---

* শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৯।২২,—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "নিরবচ্ছিন্ন এবং একান্তভাবে আমারই মনন দ্বারা যাঁহারা ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্য উপাসনায় রত যোগিগণের যোগক্ষেম (অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তু রক্ষার প্রয়োজনীয় ভার) আমিই বহন করিয়া থাকি।"

একবার তিনি ভ্রমবশতঃ এক নির্জ্জন পথে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছেন, একটা পার্ব্বত্য নদীর উপর তুষারাচ্ছন্ন সেতু পার হইবার সময় মধ্যস্থলে যাইবামাত্র তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি নদীর জলে পড়িয়া গেলেন। নদীর তীর উচ্চ, স্রোতের বেগ অত্যন্ত প্রখর, জল তুষার-শীতল ; জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া তিনি ইষ্টনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্রোতে কিয়দ্দূর নীত হইবার পর বিরাট এক বরফের স্তূপ উপর হইতে আসিয়া নদীর একস্থানে এমনভাবে আটকাইয়া গেল যে, জলের স্রোত তাঁহাকে আর টানিয়া লইতে পারিল না। ঐ বরফের স্তূপের সাহায্যেই তিনি অতিকষ্টে তীরের উপর উঠিতে সমর্থ হইলেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল।

আর একবার জঙ্গলের মধ্যে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে কোথাও লোকালয় দেখিতে পাইলেন না। ঐদিন অতিরিক্ত তুষারপাত হইতেছিল, তাঁহার দেহ তুষারে আচ্ছন্ন হওয়ায় তিনিও যেন বরফের চলন্ত পুতুলের রূপ ধরিলেন। অত্যন্ত শীতে তাঁহার হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল। ক্রমে জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় উনের ঘাগরা-পরা, মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা এক প্রৌঢ়া নারী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "জলদি উঠ্।" তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে গৌরীমাকে এক বস্তিতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে সেই নারীকে আর দেখা গেল না। পাহাড়ীরা সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল।

একদিন তিনি এক অদ্ভুত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোথাও জনমানব নাই, সম্মুখে এক মন্দির, পার্শ্বেই একটি বেলগাছ। গাছ হইতে বেলপাতা গঙ্গার জলে পড়িয়া স্রোতের টানে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, দেখা যায় না। মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন দরজা তিনি উপর হইতে দেখিতে পাইলেন না। একস্থানে একটা ছোট গর্ত্ত মাত্র রহিয়াছে। তাঁহার কৌতূহল হইল, মন্দিরের মধ্যে কি আছে দেখিতেই হইবে। একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তিনি সেই গর্ত্তটাকে প্রশস্ত করিতে লাগিলেন। অনেক পরিশ্রমের পর যেটুকু পথ প্রস্তুত হইল, তাহাতে মস্তক প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু স্কন্ধদেশ আটকাইয়া যায়। আবার আঘাত করিতে লাগিলেন, গর্ত্তটা আরও প্রশস্ত হইল। তাহার মধ্য দিয়া অতিকষ্টে গৌরীমা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে অতীব বিস্ময় জন্মিল। মন্দিরাভ্যন্তরে মহাদেব বিরাজমান, কতকগুলি সর্প তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। পার্শ্বেই একটি প্রজ্জ্বলিত পিত্তলের প্রদীপ। বায়ুর তাড়নায় উপর হইতে এক-একটি বেলপাতা জলে পড়িতেছে, আর কলনাদিনী জাহ্নবী যেন তদ্দ্বারা নিভৃতে আপন মনে দেবাদিদেবকে অঞ্জলি দিতেছেন। প্রস্তরাঘাতের শব্দেই সর্পকুল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার একজন মানুষকে মন্দিরাভ্যন্তরে দেখিতে পাইয়া মহাদেবকে ছাড়িয়া তাহারা এক কোণে যাইয়া জড় হইল। গৌরীমা

মনের আনন্দে গঙ্গাজলে এবং বিল্বদলে দেবাদিদেবের অর্চ্চনা করিয়া স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন।

বদরীনারায়ণের মন্দিরের নিকটে তিনি এক অতিবৃদ্ধ সাধুর দর্শন পাইয়াছিলেন। ইনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, কেহ নিকটে গেলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেন। এই কথা শুনিয়া গৌরীমা মনস্থ করিলেন, এই সাধুর নিকট যাইতেই হইবে। তিনি নিকটে গেলে সাধু ঈষৎ হাসিয়া হস্তদ্বয় পাশা-পাশিভাবে নিজের মুখের সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার এই ইঙ্গিতের গূঢ় অর্থ গৌরীমা এইরূপ বুঝিলেন যে, দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায়, সেইপ্রকার নিজের হৃদয়-দর্পণে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করাই সকল সাধনার সার।

কেদারনাথের সন্নিকটে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া গৌরীমা প্রায় দুই দিন অনাহারে ছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একটা পাথরের উপর শুইয়া পড়েন। এমন সময় এক পাহাড়ী বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার পাশে বসিলেন এবং মাথায় হাত বুলাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লালি, কহাঁ যাওগী?" বৃদ্ধার প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া এবং সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার ভারী আনন্দ হইল। সকল কষ্ট ভুলিয়া গিয়া তিনি তাঁহাকে জানাইলেন, কেদারনাথজীকে দর্শন করিতে আসিয়া তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তু ইধার কাহে আয়া? আও মেরা সাথ।"

গৌরীমা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বৃদ্ধার সঙ্গে চলিলেন। সামান্য মাত্র অগ্রসর হইয়াই বৃদ্ধা দেখাইয়া দিলেন,—ঐ কেদারজীর মন্দির। দুই দিন এত নিকটে ঘোরাঘুরি করিয়াও কোন মন্দির দেখিতে পান নাই, আর বৃদ্ধা এত শীঘ্র মন্দিরের নিকট লইয়া আসিলেন! ইহাতে গৌরীমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি বৃদ্ধাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ফিরিয়া দেখেন, কোথাও কেহ নাই, নিমেষমধ্যে বৃদ্ধা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন! মহামায়া তাঁহাকে ধরা দিয়াও দিলেন না, ইহা মনে করিয়া তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ এবং অভিমান হইল। তিনি সেই স্থানে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

একবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে তিনি স্নান করিতে যাইতেছিলেন। এক বনের মধ্যে তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হয়, কোন দিকেই লোকালয় অথবা পথ দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু, রাত্রির নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার চারিদিক ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি একদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। এমন সময় দূরে অশ্ব-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন, একটা আলোক তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইল, বুঝি ডাকাত; নিকটে আসিলে দেখিলেন,—একজন অশ্বারোহী, এক হাতে জ্বলন্ত মশাল। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি-দর্শনে গৌরীমার আশঙ্কা দূর হইল। অশ্বারোহী তাঁহাকে একটা পথ দেখাইয়া বলিলেন,—এই দিকে যাও, কাছেই বসতি।

হিমালয়ের অরণ্যানীতে পর্য্যটনকালে গৌরীমা কয়েকবার

হিংস্র পশুর সম্মুখেও পড়িয়াছেন, কিন্তু কিছুই তাঁহাকে ভীত বা বিচলিত করিতে পারে নাই। একবার এক চটিতে আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গে তিনিও অবস্থান করিতেছিলেন। অপরিচিত স্থানে রাত্রিকালে তিনি নিদ্রা যাইতেন না, সারারাত্র জপধ্যান এবং কীর্ত্তন করিয়া অতিবাহিত করিতেন। চটিতে প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গৌরীমা সম্মুখে আগুন জ্বালিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দূরে একটা কোলাহল উঠিল—বাঘ আসিয়াছে। তিনি সকলকে সাবধান হইতে বলিলেন এবং প্রচুর কাষ্ঠদ্বারা আগুনের তেজ খুব বাড়াইয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঘ তাঁহাদের অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল তিনি ভীত না হইয়া একখানি করিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ তাহার দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিন-চারি বার এইরূপ করিতেই বাঘ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

একদিন হিমালয়ের এক নির্জ্জন স্থানে তিনি আত্মহারা হইয়া ভগবানের নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন। একটি মৃগশিশু দূর হইতে তাঁহার কীর্ত্তন শুনিতেছিল। কিছুক্ষণ পর তাঁহার অহিংস উদাসীন ভাব বুঝিয়া মৃগশিশু আস্তে আস্তে নিকটে আসিল এবং অবশেষে আরও কাছে বসিয়া তাঁহার গাত্র লেহন করিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি মৃগশিশুর গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। চলিয়া আসিবার সময় দেখেন, সেও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। তাঁহার মনে হইল, সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া আসিয়া এ আবার কি নূতন

মায়ার পরীক্ষায় পড়িলাম! কিছু ঘাসপাতা সংগ্রহ করিয়া মৃগশিশুকে খাইতে দিয়া তিনি সেই অবসরে সরিয়া পড়িলেন।

কয়েকবৎসর হিমালয় প্রদেশে তীর্থপরিক্রম এবং তপস্থায় অতিবাহিত করিয়া গৌরীমা কিছুকাল বৃন্দাবন, যাবট ও বর্ষাণায় সাধনভজন করেন। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে তাঁহার এক পিসতুতো কাকা মথুরায় বাস করিতেন। হঠাৎ একদিন এক মন্দিরে গৌরীমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে বাসাবাটীতে লইয়া গেলেন এবং কলিকাতায় আত্মীয়-গণের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। শ্যামাচরণকাকার স্ত্রী এবং কন্যারা তাঁহার গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য তাঁহারা গোপনে আয়োজন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে মথুরা হইতে গৌরীমা একদিন অদৃশ্য হইলেন।

বৃন্দাবনের নিকটে যমুনার তীরবর্ত্তী একটা নির্জ্জন স্থানে তিনি কয়েকদিন লুকাইয়া রহিলেন। এইস্থানে একদিন এক প্রিয়দর্শন বালক ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলে, "এ মায়ি! তেরে পাকড়নেকো আয়া, তু জল্দি হিঁয়াসে ভাগ্ যা।" ধরা পড়িবার ভয়ে অবিলম্বে তিনি জয়পুরের দিকে রওনা হইলেন। এই যাত্রায় তিনি জয়পুর, পুষ্কর, প্রভাস, দ্বারকা প্রভৃতি পশ্চিম-ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেন।

সুদামাপুরী হইয়া তিনি দ্বারকাধামে যান। পথিমধ্যে জনৈক

রাজার প্রতিষ্ঠিত এক দেববিগ্রহ দর্শন করেন। বিগ্রহটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর। সেইস্থানে তিনি দুই-এক দিন রহিলেন। মন্দিরে এক সাধুমায়ীর আগমন হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং রাজপ্রাসাদের এক অংশ তাঁহার জন্য ছাড়িয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গৌরীমা রাজার প্রাসাদে বাস করিতে সম্মত হইলেন না।

রাজা ছিলেন নিঃসন্তান, সাধুমায়ীর নিকট তিনি দৈব ঔষধ এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। গৌরীমা বুঝাইয়া বলেন, ভগবানে নিষ্কাম ভক্তিই মোহমুগ্ধ জীবের পরম ঔষধ, অন্য কোন ঔষধের সন্ধান তিনি জানেন না। মন্দিরের ঠাকুরকে দেখাইয়া তিনি রাজাকে বলিলেন, "এর চেয়ে সুন্দর ছেলে আর পাবে না। একেই তনুমন দিয়ে ভালবাস, তাতেই মনে শান্তি পাবে।"

সুদামাপুরীর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে গৌরীমাকে নিষেধ করা হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন, সেই গ্রামে বিসূচিকা রোগ আরম্ভ হইয়াছে, প্রতিদিন অসংখ্য লোক মরিতেছে, বাহিরের লোকের তথায় প্রবেশ কোতোয়ালের নিষেধ। মড়ক এত ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, মৃতদেহের সৎকার করিবার লোকেরও তৎকালে সেইস্থানে অভাব হইয়া পড়িয়াছিল।

সকল কথা শুনিয়া গৌরীমা কোতোয়ালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রোগার্ত্তদিগের সেবার ভার লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পরামর্শমত কোতোয়াল গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে

আহ্বান করিলেন। আলোচনায় স্থির হইল যে, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং দ্বাদশজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদ্বারা গ্রামের স্থানে স্থানে তিন দিবস যজ্ঞানুষ্ঠান এবং শাস্ত্রপাঠ করান হইবে। প্রাচীনগণ এই পরামর্শ মানিয়া লইলেন। ইহাতে তিন-চারি দিনের মধ্যেই মড়কের প্রকোপ কমিয়া গেল। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে ভগবৎপ্রেরিত দেবী মনে করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিলেন।

দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর মূর্ত্তি অতীব মনোহর। গৌরীমা যখন তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন, সেই সময় ভোগারতি মাত্র শেষ হইয়াছে। নাটমন্দিরে তিনি জপ করিতে বসিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন, মন্দিরাভ্যন্তরে একটি ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর বালক আহারান্তে আচমন না করিয়াই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। তিনি মনে করিলেন, এদেশে পুরোহিতের ছেলেদের বুঝি ঠাকুরমন্দিরের মধ্যে বসিয়া প্রসাদগ্রহণ দূষণীয় নহে। কিন্তু তাঁহার আচারনিষ্ঠ মন এই প্রথা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারিল না। পরক্ষণেই তিনি দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত আসিয়া সযত্নে বালকের হাতমুখ ধুইয়া দিলেন, এবং আচমনান্তে বালক যাইয়া মন্দিরে সিংহাসনের উপর উঠিলেন। গৌরীমার আর কোন সংশয় রহিল না যে, কে এই বালক! তিনি মন্দিরের দরজায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পুরোহিত অপরিচিতা এই নারীর এইরূপ ব্যাকুলতাদর্শনে

স্নেহপূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু দর্শন হইয়াছে বুঝি মা ?" গৌরীমা প্রাণের আবেগে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। যে অলৌকিক দৃশ্যের আভাসমাত্র তিনি পাইলেন, তাহা যে নিতান্তই ক্ষণিকের ব্যাপার, এইরূপ দর্শনে তাঁহার চিত্ত ভরিয়া উঠে কৈ !

গুজরাট প্রদেশের তীর্থসমূহ দর্শন করিতে করিতে গৌরীমা এমন একস্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন তাঁহার এক অতিপ্রিয়জনকে হারাইয়াছেন, সমস্ত অন্তর তাঁহারই বিরহব্যথায় আকুল হইয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি ইহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না, অথচ তাঁহার হৃদয় এক অজানা বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিল।

পরে তিনি জানিতে পারেন, ইহাই সেই প্রভাসতীর্থ, যেখানে তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জরাব্যাধ-রূপী অঙ্গদের শরাঘাতে তনুত্যাগ করেন। তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, কেন এই স্থানে আসিয়া তাঁহার এইরূপ হৃদয়বৈক্লব্য উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিতে লাগিল,—বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট যদুপতির সুকোমল চরণকমল হইতে নিষ্ঠুর ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর লীলাময় ভগবান দ্বাপর যুগের খেলা সাঙ্গ করিয়া আপনার স্বরূপে আপনি মিলিয়া যাইতেছেন। এই চিত্র সহ্য করিতে না পারিয়া গৌরীমা অবিলম্বে প্রভাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

গৌরীমা এখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। স্বপ্ন অথবা আভাস-ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, এমন-কি হৃদয়ে দিব্যানন্দের অনুভূতিতেও আর তিনি পরিতৃপ্ত নহেন। মানুষ যেমন নিজের প্রিয়জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে চায়, অভীষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে দর্শন করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। কোথায় গেলে, কি করিয়া ডাকিলে শ্যামসুন্দর বংশীধারীকে পাওয়া যায়, অহোরাত্র তাঁহার কেবল এই একই অনুধ্যান। অন্তরের আকিঞ্চন আর তিনি গোপন রাখিতে পারেন না। আবার বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

অন্তরের তীব্র বিরহবেদনা এবং দর্শনাকাঙ্ক্ষা লইয়া কখনও সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অনাহারে একাসনে কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন ; কখনও বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে, যমুনার তীরে তীরে খুঁজিয়া বেড়াইতেন—কোথায় তাঁহার শ্যামল বংশীধারী গিরিধারী। আবার কখনও-বা নির্জ্জন স্থানে গিয়া অভিমানী শিশুর মত ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেন,—ঠাকুর, তোমারি জন্যে আমি ঘর ছেড়ে এসেছি। একটিবার প্রাণভ'রে দেখা দাও।

বংশীধারীর দর্শন যখন প্রাণ ভরিয়া পাইলেন না, তখন অভিমানে ভাবিলেন, বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইবেন, আর আসিবেন না। আবার বিচার করিয়া দেখিলেন, দূরে গেলে বংশীধারীর ত ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হইবে না বরং নিজেরই মনোবেদনা তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে ; সুতরাং এ জীবনে আর কি প্রয়োজন, ইহা বিসর্জ্জন দিয়া সকল দুঃখের অবসান করিবেন।

আত্মবিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া এক গভীর নিশীথে তিনি গোপনে ললিতাকুণ্ডে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। সেই চরমমুহূর্ত্তে এমন কিছু অলৌকিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল, যাহাতে তাঁহার কঠোর সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত আর সিদ্ধ হইল না। এই অভূতপূর্ব্ব যোগাযোগে তাঁহার অভিমান দূর হইল, এতকালের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। বিপুল আনন্দপ্রবাহে তিনি নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে ব্রজরমণীগণ দেখিতে পাইলেন, গৌরীমার অচেতন দেহ ললিতাকুণ্ডে পড়িয়া আছে। তাঁহারা অনেকে তাঁহাকে চিনিতেন এবং আপন জনের মত স্নেহ করিতেন। ব্রজ-রমণীগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নিজেদের গৃহে লইয়া গেলেন। তাঁহাদের সেবাযত্নে গৌরীমার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

এই ঘটনার পর তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত এক অবস্থা হইল,—কখনও কাঁদিতেন, কখনও হাসিতেন, আবার কখনও দেখা যাইত, কোথাও অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন, দুই চক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমের অশ্রু-যমুনা বহিয়া যাইতেছে। কখনও-বা দেহের কোন অংশ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, তাহাতে তাঁহার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, বাহিরের কোন চেতনা নাই। আত্মানন্দের আনন্দে তিনি বিহ্বল।

প্রত্যাবর্ত্তন

ললিতাকুণ্ডের ঘটনার পর বৃন্দাবনে এক মন্দিরের মধ্যে গৌরীমাকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া শ্যামাচরণকাকা তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার শোকার্ত্তা গর্ভধারিণীর কাতরতাপূর্ণ কয়েকখানি পত্র দেখাইলেন। অনেক করিয়া বুঝাইয়া তিনি গৌরীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

দীর্ঘকাল অদর্শনের পর এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে হারা-নিধিকে পাইয়া স্নেহময়ী জননী গিরিবালা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরীমার মাতামহী এবং পিতা ইতঃপূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার গৈরিক বেশ এবং মুখের পবিত্র জ্যোতিঃ দর্শনে বয়োজ্যেষ্ঠগণও তাঁহাকে দেবীজ্ঞানে সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাঁহার দীর্ঘ পর্য্যটনের ইতিহাস শুনিবার জন্য সকলে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে ভারতবর্ষের নানাতীর্থের মাহাত্ম্য এবং নানাবিধ বিবরণ শুনিয়া তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। গৌরীমা অধিকদিন আত্মীয়স্বজনের নিকট রহিলেন না। শীঘ্রই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া পুরুষোত্তম দর্শনমানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই যাত্রায় তিনি শ্রীক্ষেত্র এবং তন্নিকটবর্ত্তী সাক্ষিগোপাল, রেমুণা, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিয়া তাঁহার নিরতিশয় আনন্দ হইল। একদিকে নীলাচলের শীর্ষদেশে অবস্থিত গগনচুম্বী মন্দিরের মধ্যে বিরাজমান পুরুষোত্তমের বিরাট মূর্ত্তি, অন্যদিকে তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—বিশাল সুনীল সমুদ্র!

প্রধান মন্দিরের দ্বার যতক্ষণ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত, গৌরীমা সতৃষ্ণনয়নে জগন্নাথদেবের চক্রলোচন-মাধুরী পান করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার মনে জাগিত,—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই মন্দিরে এবং শ্রীক্ষেত্রের পথে পথে কত অপূর্ব্ব লীলা করিয়া গিয়াছেন!

মন্দিরের প্রধান পুরোহিতগণ ক্রমে এই সন্ন্যাসিনীর গভীর নিষ্ঠাভক্তি বুঝিতে পারিয়া, যাহাতে তিনি তাঁহার ইচ্ছামত জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এমন-কি, শেষে তিনি পৃথকভাবে ভোগরন্ধন করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে জগন্নাথদেবকে নিবেদন করিবার অনুমতিও পাইয়াছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি মন্দিরমধ্যেই অতিবাহিত করিতেন। তথায় দামোদরের পূজা সমাপন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। সংসারত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এবং তাহার পরেও দীর্ঘকাল তাঁহার চিত্তে যে ব্যাকুলতা ছিল, তাহা এখন দিব্য দর্শন এবং আনন্দের অনুভূতিতে প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে সিদ্ধপুরুষ বাসুদেব বাবাজীর সহিত গৌরীমার পরিচয় হয়। তিনি আকৌমার ব্রহ্মচারী এবং পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি ও সাধুজনোচিত ব্যবহারে শ্রীক্ষেত্রের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। গৌরীমার অন্তর্নিহিত ভাগবত ভাবের সন্ধান পাইয়া বাবাজী তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বাবাজী তথাকার 'সমাধি মঠের' অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। দিবাভাগে তিনি জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত দক্ষিণ পার্শ্বে একটি উদ্যানে থাকিতেন। রথযাত্রার পূর্ব্বে যে-কয়েকদিবস মন্দির বন্ধ থাকে, প্রভুজীর দর্শনলাভ হয় না, বৎসরের মধ্যে সেই কয়েকদিবস মাত্র তিনি শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া ভক্তগণের অনুরোধে অন্যান্য স্থানে গমন করিতেন। কখনও কলিকাতায় আসিলে গৌরীমার সহিত তিনি অবশ্যই সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন।

শ্রীক্ষেত্র হইতে গৌরীমা উত্তর-কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার এবং ভক্ত রাধামোহন বসুর আমন্ত্রণে উড়িষ্যার অন্তর্গত তাঁহাদের জমিদারী কোঠারে স্থাপিত শ্যামচাঁদ-বিগ্রহ দর্শন করিতে গমন করেন। ১২৮৭ সালে অথবা তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে বসু মহাশয়ের সহিত গৌরীমার পরিচয় হয়। তিনি এই সন্ন্যাসিনী মায়ের বৈরাগ্য ও ভক্তি দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইলেন। এই পরিচয় হইবার পর হইতে তাঁহার অনুরোধে গৌরীমা তাঁহাদের কলিকাতাস্থ বাটীতে এবং

বৃন্দাবনস্থিত 'কালাবাবুর কুঞ্জে' মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন।* তাঁহার পুত্র বলরাম বসুর সহিত গৌরীমার জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্রের সৌহৃদ্য ছিল।

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌরীমা নবদ্বীপধামে গমন করেন। নবদ্বীপে সাধারণতঃ তিনি 'হরিসভা'য় অবস্থান করিতেন। হরিসভার অধ্যক্ষ ব্রজ বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং যত্নসহকারে আপন পরিবারের মধ্যে রাখিতেন।

নদীয়াবল্লভ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে গৌরীমা পতিভাবে ভজনা

* গৌরীমার নিকট বসু মহাশয়ের লিখিত একখানা পত্রের নিম্নে উদ্ধৃত কিয়দংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, গৌরীমার প্রতি তাঁহার ভক্তি কত গভীর ছিল।—

"* * মাগো অধম সন্তানে অসীম কৃপা করিয়াছ তাহা অনন্ত জন্মে পরিশোধ করণের সামর্থ নাই। যাহার হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠিন ছিল কখন দ্রবীভূত হইত নাই তাহাকে খুব কাঁদাইতেছ। তোমার পাদপদ্ম দুখানি যেন সতত হৃদয়পদ্মের ভূষণ হইয়া থাকে। তাহা হইলে আর হৃদয় কঠিন হইবেক নাই। * * তুমি ও তোমার দামোদর আমাকে এই কৃপা কর যেন তোমাদের নাম করিতে করিতে * * পৌছিয়া তোমাদের নিত্যসেবার প্রাপ্তি শীঘ্র হয়। * * কি সরল অন্তঃকরণ তোমার। * * কি সুন্দর মন ও দীনভাব * *। তোমার ন্যায় এরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ এ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই * *।

দীন সন্তান রাধামোহন দাস"

করিতেন। বৈষ্ণব মহাজনগণের ন্যায় তিনিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, যমুনাপুলিনের শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন শ্রীরাধার হেমকান্তিতে স্বীয় কৃষ্ণতনু প্রচ্ছন্ন করিয়া ভক্তগণের প্রাণের আকুল আহ্বানে গঙ্গাতীরে শচীমাতার ক্রোড়ে পুনরায় ধরা দিয়াছেন। নবদ্বীপের পথে, ঘাটে, ধূলিতে, বাতাসে তাঁহার মধুময় পুণ্যস্মৃতি আজিও ভক্তগণ অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তের প্রাণ সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়া বাংলার এই বৃন্দাবন দেখিতে ছুটিয়া যায়।

এই কারণেই নবদ্বীপ ছিল গৌরীমার অতিপ্রিয় তীর্থ। তিনি বলিতেন, "ন'দে আমার শ্বশুরবাড়ী।" এই সম্পর্ক লইয়াই তিনি সেখানে চলাফেরা করিতেন। পথে চলিতে চলিতে কোথাও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি নয়নগোচর হইলে, লোকাচারমতে আপন ভাসুরঠাকুর বোধে, সেই স্থানে মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেন।

মহাপ্রভুর মন্দিরে যাঁহারা গৌরীমাকে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত তাঁহার অন্তরের ভাবসম্পদের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। সঙ্গীতের পর সঙ্গীত গাহিয়া তিনি গৌরপ্রেম-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেন, বহির্জগতের কথা তাঁহার একেবারেই মনে থাকিত না।

নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া গৌরীমা কাশীধামে কিছুদিন অবস্থান করেন, তৎপর পুনরায় বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

ভক্ত বলরাম বসু ইতোমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষের

সন্ধান পাইয়া তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। বলরাম বসু জানিতেন, গৌরীমা অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, অনেক সাধু দর্শন করিয়াছেন এবং সাধনপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তথাপি তিনি যদি দক্ষিণেশ্বরের এই মহাপুরুষকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও জীবন ধন্য হইবে। এইরূপ মনে করিয়া বলরাম বসু বৃন্দাবনে তাঁহাকে জানাইলেন, দিদি, দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছি। সনক-সনাতনের মত তাঁহার ভাব। ভগবৎপ্রসঙ্গ বলিতে বলিতেই সমাধি হয়। কলিকাতায় আসিয়া তুমি একবার অবশ্য তাঁহাকে দেখিয়া যাইবে।

এদিকে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৌরীমা অকস্মাৎ হৃষীকেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; অভিপ্রায়, আবার বদরী-নারায়ণ দর্শনে যাইবেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা এইবার পূর্ণ হইল না। হৃষীকেশের নিকটবর্ত্তী একস্থানে অতিবৃদ্ধ এক সাধু তপস্যা করিতেন। গৌরীমা তাঁহাকে পূর্ব্ববারেও দেখিয়াছিলেন এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মান্য করিতেন। সাধু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোর গর্ভধারিণী কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী, তোকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। তুই একবার দেশে ফিরিয়া যা।" সাধুর কথা শুনিয়া গর্ভধারিণীর মহত্ত্বের কথা তাঁহার বারবার মনে পড়িতে লাগিল।—তাঁহার সেই মহিমময়ী মা, যিনি তাঁহাকে মুক্তির আলোক দেখাইয়াছেন, পরমধনের সন্ধান দিয়াছেন। আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় কন্যার দর্শনার্থ ব্যাকুল।

গৌরীমা আর অগ্রসর হইলেন না। মথুরায় আসিয়া

শ্যামাচরণকাকার নিকট শুনিলেন, মা কঠিন আমাশয় রোগে শয্যাশায়িনী এবং কন্যাকে একবার দেখিবার জন্য নানাস্থানে আত্মীয়পরিজনকে চিঠি লিখিয়াছেন। গৌরীমা কলিকাতায় আসিলেন। জননী এইসময়ে কন্যাকে পুনরায় নিকটে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর গৌরীমা পুনরায় জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। গঙ্গাসাগর হইতে এইরূপে প্রায় আট বৎসর তিনি বহুতীর্থ পরিক্রম করেন। তিনি ভারতবর্ষের সকল তীর্থক্ষেত্র পরিক্রম করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দেবস্থানের মাহাত্ম্যে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লৌকিক প্রথায় পুণ্যসঞ্চয়-মানসে তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান নাই। তাঁহার প্রাণের কাম্য ছিল—বিশেষ বিশেষ স্থানের দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে নিজের ইষ্টকে উপলব্ধি করা।

একদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরে গৌরীমা বসিয়া আছেন, এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কথাপ্রসঙ্গে ছলছল নেত্রে তাঁহাকে বলেন,"ঠিক তোমারি মত আমার একটি মেয়ে ছিল, মা!" এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় হয়। বৃদ্ধ মাঝে মাঝে কন্যা-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। গৌরীমা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেন, "বাবা, যে চলে গেছে তা'র মায়ায় আর কেন কষ্ট পাচ্ছ? আমাকেই-বা ক'দিন দেখবে, ফকির মানুষ, কবে কোথায় পালাই ঠিক নেই।"

বৃদ্ধের নাম হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইনি একদিন গৌরীমাকে

বলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ। অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপূর, প্রেমে ঢলঢল, ঘনঘন সমাধি!"

শ্রীক্ষেত্র হইতে কলিকাতায় আসিয়া গৌরীমা বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে উঠিলেন। বলরাম বসু তাঁহার নিকট প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের আশ্চর্য্য সাধনভজন এবং ভাবসমাধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন, দিদি, শেষে কিন্তু আপশোষ করবে। এমনটি আর দেখ নাই, চল একবার দক্ষিণেশ্বরে। দিদি উত্তরে বলিতেন, জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে দাদা, নতুন কোন সাধু দর্শনের সাধ আমার নেই।

বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরের আত্মভোলা সাধকের ভাবরসে তখন ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৌরীমাকে সেই আনন্দের ভাগী করিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না, মাঝে মাঝে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেন। গৌরীমাও হাসিয়া বলিতেন, তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, তবে আমায় টেনে নিয়ে যান। তার আগে আমি যাচ্ছিনে।

কে টানে

ভক্ত বলরাম বসুর গৃহে অবস্থানকালে একদিন দামোদরের অভিষেকের সময় গৌরীমা আপন মনে গুণগুণ স্বরে শ্রীনিবাস দাসের একখানি পদ গাহিতেছিলেন,—

বদন-চাঁদ কোন কুঁদায়ে কুঁদিলে গো
কে না কুঁদিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোণায় মুড়িত তার পাশে।
বিজুরী জড়িত যেন চাঁদের কালিমা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
রতন কাড়িয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না পরাইয়া দিল কাণে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥

অভিষেকের পর দামোদরকে হাতে লইয়া তাঁহাকে মুছাইয়া সিংহাসনে রাখিতে গিয়া দেখেন,—সেখানে মানুষের দু'খানি কাঁচা পা আসন জুড়িয়া রহিয়াছে। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, হয়ত ইহা দেখার ভুল। কিন্তু যতই অভিনিবেশসহকারে দেখিতে লাগিলেন,

ততই দেখিতে পাইলেন—দামোদরের সিংহাসনোপরি দুইখানি কাঁচা পা, অথচ দেহের অন্য কোন অংশ দেখা যাইতেছে না।

ভক্তের সহিত ভগবানের লীলাখেলার পরিচয় তাঁহার জীবনে ইতঃপূর্ব্বেও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল, কিন্তু আজিকার এই রহস্যের তিনি কিছুই সমাধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল, দামোদর মেঝেতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল, হাত হইতে নারায়ণশিলা কখনও ত পড়িয়া যান নাই? আজ এমন হইল কেন? দামোদরকে তুলিয়া বারবার ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন, পুনরায় অভিষেকান্তে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তুলসী দিলেন,—আবার সেই পা? তুলসী যাইয়া পড়িল সেই পায়! একবার, দুইবার, তিনবার,—দামোদরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তুলসী বারবার সেই পায়েই যাইয়া পড়িল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গৌরীমা ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

গৌরীমার সেবার প্রতি বলরাম বসুর পরিবারস্থ সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঐ দিন বেলা বাড়িয়া চলিল, তথাপি ঘরের ভিতর হইতে তিনি বাহিরে আসিতেছেন না, এমন-কি, তাঁহার কোন সাড়াশব্দও পাওয়া যাইতেছে না দেখিয়া জনৈকা মহিলা তাঁহার ঘরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে পাইলেন—গৌরীমা ভূমিতলে পড়িয়া আছেন, আর তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া দরবিগলিতধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। বলরাম বসুর পত্নী কৃষ্ণভাবিনী দেবী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অনেক ডাকাডাকি

করিয়াও গৌরীমার কোন উত্তর পাইলেন না। তিনি শঙ্কিত হইয়া তাঁহার অবস্থা স্বামীকে জানাইলেন। বলরাম বসু তথায় আসিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, ইহা কোন ব্যাধি নহে,—ভাবাবেশ।

আরও তিন-চারি ঘণ্টার পর গৌরীমার বাহ্যচৈতন্য কতকটা ফিরিয়া আসিল। কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে, অর্থবিহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, কিন্তু কাহারও কোন কথার উত্তর দিতে পারেন না। বারবার নিজের বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত করিয়া কি-একটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনে হইল, বুকে সুতা বাঁধিয়া কে যেন তাঁহাকে টানিতেছে। কিন্তু সেই সুতা তিনি ধরিতে পারিতেছেন না; কোথা হইতে কে তাঁহাকে টানিতেছে, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। চারিদিকের জনকোলাহল তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, ইচ্ছা হইতেছিল কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদেন।

সমস্ত দিন এবং রাত্রি তাঁহার একইভাবে—অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় অতিবাহিত হইল। এক অব্যক্ত বেদনায় তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তন্দ্রার ঘোরে শুনিলেন, কে এক আনন্দময় পুরুষ যেন তাঁহাকে অভিমানের সুরে বলিতেছেন, "আমি না টান্‌লে তুই আস্‌বিনি!"

গৌরীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? তোমার কণ্ঠস্বর যে আমার পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে!"

সেই আনন্দময় পুরুষ বলিলেন, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, কাছে এলে তবে ত চিন্‌বি! তুই আয় না, শীগ্‌গির আয়।"

গৌরীমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তিনি জাগিয়া উঠিলেন। চারিদিকে চাহিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সুরের মধুর রেশ যেন বায়ুর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কানের মধ্যে তখনও বাজিতেছে সেই মধুমাখা 'আয় আয়' ডাক। সেই ডাক তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিল—আয়, আয়, আয়। তিনি অন্তরে বাহিরে কেবল শুনিতে লাগিলেন সেই অনাহত ধ্বনি—আয়, আয়, আয়। সেই ডাক তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। ঘরের মধ্যে আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, ডাক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিলেন অনির্দ্দিষ্ট পথে।

রাত্রি তখনও প্রভাত হয় নাই। সদর দরজায় আসিয়া গৌরীমা কড়া ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। প্রত্যুষে তিনি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন বলিয়া দারোয়ান দরজা খুলিয়া দিত। কিন্তু পূর্ব্বদিনের ঘটনা জ্ঞাত থাকায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "পিসিমা, এমন ভোররাত্রিতে আপনি কোথায় যাবেন?" বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও গৌরীমা কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে দারোয়ান দরজা না খুলিয়া বলরাম বসুকে গিয়া সংবাদ দিল। তিনি নীচে আসিয়া গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, কোথায় যাবে?" দিদি নিরুত্তর।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে মহাপুরুষের কাছে যাবে?"

গৌরীমা বলরাম বসুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

বলরাম বসু তাঁহার এতদিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া তখনই গাড়ী ডাকাইলেন। তাঁহার পত্নী, প্রতিবেশী চুণীলাল বসুর পত্নী এবং আরও দুই-এক জন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া বলরাম বসু যাত্রা করিলেন। তাঁহার পত্নী কি মনে ভাবিয়া একখানি চাদরে গৌরীমাকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া লইলেন। গৌরীমা উদাসদৃষ্টিতে নির্ব্বাক বসিয়া রহিলেন। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে চলিল।

তাঁহারা যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রভাতের সোনার কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্বচ্ছতরঙ্গ যেন কি-এক আনন্দবার্ত্তা বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তটসংলগ্ন তরুশাখায় বিহঙ্গকুল মধুর কূজনে নবজাগরণের আগমনী গাহিতেছে। পঞ্চবটীর চতুষ্পার্শ্বে একটা শুচিমধুর আবেষ্টনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাপুরুষের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, একখানি চৌকীর উপর বসিয়া তিনি একটি কাঠিতে কতকগুলি সুতা জড়াইতে জড়াইতে গাহিতেছেন,—

“যশোদা নাচাত গো মা ব'লে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্যামা,
একবার নাচ মা শ্যামা।”

তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিলে, মহাপুরুষের সুতা জড়ান সমাপ্ত হইল। তিনি কাঠিটি এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। গৌরীমা অনুভব করিলেন, পূর্ব্বদিনের অব্যক্ত বেদনা কোন্ যাদুমন্ত্রবলে

অন্তর্হিত হইয়া এক অপার্থিব আনন্দ ও শান্তির প্রলেপে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইয়া গেল। বুকে সুতার টান আর অনুভূত হয় না, কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে বুকের সেই সুতা খুলিয়া গিয়াছে।

সকলে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন, যন্ত্রচালিতের ন্যায় গৌরী-মাও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিতে যাইয়া দেখেন—সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পা দুইখানি। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তিনি ঈষৎ হাসিতেছেন। বিস্ময়ে সন্দেহে গৌরীমা ভাবিতে লাগিলেন, কে এই মহাপুরুষ?—কোথায় যেন দেখেছি, নিশ্চয়ই দেখেছি। চিন্তাকুলচিত্তে তিনি সকলের পশ্চাতে গিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বলরাম বসুকে মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বলরাম, এটি কে?"

—"আমার ভগ্নী।"

—"তোমার আপন ভগ্নী?"

বলরাম বসু ক্ষণিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন," আজ্ঞে হাঁ।"

তিনি দ্ব্যর্থবোধক কথা বলিতেছেন বুঝিয়া মহাপুরুষ রঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "এ্যাঁ, কা-য়ে-ত! উঁ-হুঃ।"

ইহাতে বলরাম বসু হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যা। আমার এক বন্ধুর কনিষ্ঠা ভগ্নী, আমার পিতাকে পিতা সম্বোধন করেন।"

মহাপুরুষও সহাস্যবদনে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই বল, এ-যে এখানকার থাকের লোক। অনেক কালের চেনা।"

ঠাকুরের লীলাসহচর অক্ষয়কুমার সেন এই সময়ের বর্ণনায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"তে লিখিয়াছেন,—

"প্রভুর নিকটে নাই কিছু অবিদিত।
হাজার না থাক্ কেহ যত আবরিত॥
যতগুলি ভক্তনারী বসে একধারে।
বসনে বদন গুপ্ত স্বভাবানুসারে॥
আকার কি হৃদি-ভাব কি প্রকার কার।
প্রভুদেব সুবিদিত সব সমাচার॥
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া গৌরমায়।
বলরামে পুছিলেন প্রভু দেবরায়॥
কেবা এই ভক্তিমতী কহ পরিচয়।
গুপ্ত উপযুক্ত মুখ ইহার ত নয়॥
লজ্জা-ঘৃণা-ভয়হারা ঘর বাড়ী ছাড়া।
কৃষ্ণ-হেতু বিদেশিনী অনুরাগে ভরা॥"

যাঁহাকে অনেক চেষ্টার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আজ এই প্রথম উপস্থিত করিয়াছেন, সেই গৌরীমা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর এত কথা কি করিয়া জানিলেন, ইহা ভাবিয়া বলরাম বসু অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ করিলেন।

তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে অনেকক্ষণ রহিলেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌরীমাকে ঠাকুর বলিলেন, "আবার এসো, মা।" বলরাম বসু ইহাতে রহস্য করিয়া সঙ্গের মহিলাদিগকে বলিলেন, "সবাই

একসঙ্গে এলে, আর দিদি একা পাস হ'য়ে গেলেন !" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর এবং উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

গৌরীমার চিত্ত ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল। পুরাতন স্মৃতি একের পর এক আসিয়া তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।—"কৃষ্ণে ভক্তি হউক" বলিয়া বাল্যকালে সাধকের আশীর্ব্বাদ, নিমতে-ঘোলায় তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ, "আবার দেখা হবে গঙ্গাতীরে" এই আশ্বাসবাণী, পূর্ব্বদিবসে দামোদরের সিংহাসনে এই দুইখানি পা, "আয় আয়" বলিয়া এই কণ্ঠের ডাক, দক্ষিণেশ্বরে আনিবার প্রবল আকর্ষণ,—এইসকল কথা একের পর এক তাঁহার মনে উদিত হইল। তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, এই মহাপুরুষই সেই সাধক—তাঁহার দীক্ষাগুরু—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

দীর্ঘকাল পরে আবার গঙ্গাতীরে গুরু-শিষ্যা, পিতা-পুত্রীর দেখা হইল। ইহা ১২৮৯ সালের কথা। গৌরীমার বয়স তখন পঁচিশ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকারে এক স্মরণীয় যুগ। এই শতকে ভারতবর্ষ বহুবিধ কারণে জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হয়। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নিদারুণ পরিবর্ত্তন ঘটে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ এবং বহিরাগত শিক্ষাদীক্ষার সহিত সংঘর্ষে ভারতের জীবনধারা, বিশেষতঃ ধর্ম্মজীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অন্য কোন জাতি হইলে এই প্রচণ্ড আঘাতে একেবারেই হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, কিন্তু যুগযুগান্তরের সঞ্চিত আধ্যাত্মিক তপঃশক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষ কোনক্রমে তাহার সনাতন বৈশিষ্ট্যরক্ষায় সমর্থ হইল। মৃত্যুর পর জন্ম যেমন ধ্রুব, অন্ধকারের পর আলোক যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই জাতির পতনের পর উত্থান চিরন্তন নিয়ম। 'পতন এবং অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থা' অবলম্বন করিয়াই চলে মহাকালের রথ।

এইরূপে যখন ভাব ও আদর্শের ভীষণ সংঘর্ষ চলিয়াছে এবং তজ্জন্য ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের পূর্ব্বকোণে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে নব্যশিক্ষা-দীক্ষাহীন আত্মভোলা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ের পাঞ্চ-জন্য বাজিয়া উঠিল। সমন্বয়ের এই শান্তিমন্ত্রে সকলের মিথ্যা দ্বন্দ্ব এবং অহমিকা অপনীত হইল। নব্যভারতের প্রাচীনপন্থী

এবং নবীনপন্থী আচার্য্যগণ একে একে প্রায় সকলেই এই যুগাবতারের আকর্ষণে যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে, মহাশক্তির বিরাট মন্দিরের মঙ্গল-ছায়াতলে মিলিত হইয়া আবার গাহিলেন ভারতের তপোবনের সেই আর্ষবাণী,—

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"*

দক্ষিণেশ্বর তপোভূমি—চিরতীর্থ, ভবিষ্যৎ বিশ্বমানবধর্ম্মের অপূর্ব্ব মিলনক্ষেত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকল প্রকার সাধনাকে সিদ্ধির গৌরব দিলেন, অসাধ্য সাধন করিলেন এই দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ কি, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং শক্তি-দ্বারা নিরূপণ করিতে যাওয়া সম্ভব নহে। মনীষিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি এবং বিচারের মাপকাঠিতে কেহ তাঁহাকে সাধক বলিয়াছেন, কেহ বলিয়াছেন প্রেমিক, কেহ মহাপুরুষ, আবার কেহ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি ভগবান বলিয়া স্বীকার না করিয়া সাধক অথবা মহাপুরুষের পর্য্যায়েই স্থান দেওয়া যায়, তথাপি তাঁহার অমিয় জীবনচরিত আলোচনা

* বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৩।২৮,—

(হে পরমেশ্বর,) আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যপথে লইয়া চল, (অজ্ঞান-) অন্ধকার হইতে (জ্ঞান-) আলোকে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে লইয়া চল।

করিলে আমরা যাহা লাভ করি তাহার তুলনা কোন যুগের কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় নাই, যৌবনেও তিনি কোন চতুষ্পাঠী অথবা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই, বরং স্পষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ও চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না।" অথচ সকল শাস্ত্রের সার, সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব তিনি নিজে সাধনাদ্বারা উপলব্ধি করিয়া সকলকে অতি অল্প কথায় এবং সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, ধর্ম্মের মর্ম্মকথা যতটা দুরূহ ও দুরধিগম্য বলিয়া মনে করা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতায় আচ্ছন্ন ও জড়তায় অভিভূত হইয়া মানুষ তাহার নিত্য কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, সৃষ্টির মোহে মুগ্ধ হইয়া স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা মোহমুগ্ধ মানুষকে সরল কথায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজারী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পুরোহিতের গতানুগতিক ক্রিয়াপদ্ধতি অনুসরণ করেন নাই। পূজার ক্রিয়ানুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বরে ব্যাপৃত না থাকিয়া তিনি হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্যে ভবতারিণীর পাদপদ্ম পূজা করিতেন। মায়ের রাতুল চরণে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া সরল শিশুর মত সরস প্রাণে ডাকিতেন, "মাগো, সন্তানের পূজা গ্রহণ কর, মা।" সন্তানের ব্যাকুল আহ্বান মায়ের অন্তর স্পর্শ করিল। মাতৃপূজার সাধক সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান পাইলেন, রূপের মধ্যে



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব



শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

অরূপকে উপলব্ধি করিলেন। পাষাণী মূর্ত্তি হাসিয়া উঠিলেন, চিন্ময়ী মা অভয় দিলেন। সাধকের সাধনা সিদ্ধ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ধর্ম্মকে নিন্দা বা উপেক্ষা করেন নাই। কোন ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে তিনি আসেন নাই, নূতন কোন সম্প্রদায় গড়িতেও তিনি আসেন নাই। তিনি বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন,—সকল ধর্ম্মেই সত্য নিহিত আছে, প্রত্যেক মানুষ স্বধর্ম্মে থাকিয়া সত্যধর্ম্ম আচরণ করিবে। তন্ত্র, বেদান্ত, নারীভাব ইত্যাদি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সাধনা এবং ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—যত মত তত পথ। সেই সনাতন পুরুষ এক, বিভিন্ন ধর্ম্মের এবং বিভিন্ন মতের লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার প্রকাশ দেখিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল সাধনার চরম আদর্শ, সমন্বয়ের ভাস্বর প্রতীক। কত মত, কত পথ, কত বিপরীত ধারা,—সকল আসিয়া এই মহাসাগরের মধ্যে মিলিত হইয়াছে। ভেদ নাই, দ্বেষ নাই, সংঘর্ষ নাই,—এক বিরাট পূর্ণতা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের লৌকিক জীবনের অন্য একদিকে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার বিবাহ। বিবাহ-সংস্কার তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন,

কিন্তু সহধর্ম্মিণীতে তাঁহার স্ত্রী-বোধ ছিল না, পত্নীর মধ্যে তিনি মহাশক্তিকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সাধক এবং সন্ন্যাসী, তথাপি সংসারের মধ্যেই বাস করিয়া শিক্ষা দিয়া গেলেন, —সংযম এবং ঐকান্তিকতা থাকিলে সংসারে থাকিয়াও মানুষ জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী এবং ত্যাগী সকলেরই আদর্শ এবং উপাস্য।

তাঁহার সকল উপদেশের সার, এক কথায় বলিতে গেলে—কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ। ইহাতে অনেকে মনে করিয়া থাকেন, তিনি নারীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির প্রতি তাঁহার যে বিন্দুমাত্র ঘৃণা বা হীন ধারণা ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে সকলের বড় যে কথাটি মনে আসে তাহা এই,—শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের মাতৃরূপের পূজারী।

“যে মহীয়সী নারীর গর্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি আজীবন ভক্তির সহিত পূজা করিয়াছেন। উপনয়নকালে ধাত্রীমাতা জনৈকা কর্ম্মকারপত্নীর হস্ত হইতেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী এই ব্রাহ্মণকুমার প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি যে-মন্দিরের পূজারী এবং যেস্থানে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, সেই দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রীও ছিলেন নারী। তন্ত্রসাধনকালে তিনি বহুশাস্ত্র-পারদর্শিনী এক নারীকেই গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন; আবার নারীকে তিনি দীক্ষাদানও করিয়াছেন। সকল নারীতেই ছিল তাঁহার মাতৃভাব,

এমন-কি অবজ্ঞাতা নারীর মধ্যেও তিনি জগজ্জননীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত অনুশীলন করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি নারীকে লেশমাত্র অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করেন নাই, বরং আজীবন মাতৃজ্ঞানে তাঁহাদের পূজাই করিয়াছেন।"*

সংযমের অভাবে ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতন, নরনারী শৌর্য্য-বীর্য্যহীন, মনুষ্যত্বহীন। তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের এই সতর্কবাণী,—কাম ও কাঞ্চনের বিরুদ্ধে, ভোগ-সর্ব্বস্বতার বিরুদ্ধে, কিন্তু নারীজাতির বিরুদ্ধে নহে। তাহা না হইলে, তিনি নিজে বিবাহ করিলেন কেন? দক্ষিণেশ্বরে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের শিক্ষাদানকালেও তিনি পত্নীকে ত্যাগ অথবা অবহেলা করেন নাই। পরন্তু, তাঁহাকে আনাইয়া দক্ষিণেশ্বরে নিজের নিকট স্থান দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বিশ্বের সমগ্র নারীকে তিনি মাতৃরূপে দেখিতেন। ত্যাগী সন্তানদিগকে যেমন তিনি কামিনীর মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন, তেমনই আবার ধর্ম্মার্থিনী নারীদিগকেও বলিতেন, "চতুর্ভুজ হ'য়ে এলেও পুরুষ-মানুষকে বিশ্বাস করো না।"

মাতৃজাতির সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যে উচ্চধারণা পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাতেও প্রকাশ পাইয়াছে,—"জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না

* "সারদা-রামকৃষ্ণ" (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত)

হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু' গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাবে সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার।"

সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য—নারী।

শ্রীরামকৃষ্ণের লোকশিক্ষার এই অভিনব সাধনায় যে নীরব সাধিকা অসামান্য ত্যাগ ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন, যে মহিমময়ী অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বামীর অসম্পূর্ণ লীলাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ উত্তরকালে ভাগ্যবান জনের মনোভূমিকে তপোভূমিতে পরিণত করিয়াছিল, সেই পরমারাধ্যা দেবী শ্রীশ্রীমা সারদাও সন্তানগণের সমক্ষে এই দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যতীর্থেই প্রথম দর্শন দান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি, নারীজাতির মুকুটমণি, মূর্ত্তিমতী করুণা। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, কত পঙ্কিল হৃদয় কলুষমুক্ত হইয়াছে। সম্পদ এবং সম্মানের অধিকারিণী হইয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্তা এবং নিরভিমানা। তাঁহার অন্তর ছিল স্নেহমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, বাহির ধীর-গম্ভীর। তাঁহার সরল পবিত্র দৃষ্টিতে সমস্তই ছিল সুন্দর, কাহারও দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না। সর্ব্বোপরি ছিল তাঁহার সহনশীলতা; জীবনে নানাবিধ অস্বাচ্ছন্দ্য এবং আবদার তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন, কখনও প্রতিবাদ বা অভিযোগ জানান নাই। কোনপ্রকার অভাব অথবা অসুবিধা তাঁহার সদাপ্রসন্ন চিত্তকে কখনও কাতর করিতে পারে নাই। নিজের

সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না; কায়মনোবাক্যে পতির সন্তোষবিধান করাই ছিল তাঁহার পরম কাম্য।

"দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর ঠাকুর একদিন মা-সারদাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—তুমি কি আমায় মায়ায় আবদ্ধ করতে এসেছো?

—না, তা' কেন? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমাকে ধর্ম্মপথে সহায়তা করতেই কাছে এসেছি।

ধনী মাড়োয়ারী-ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ যখন ঠাকুরের সেবার উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন ঠাকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন,—টাকা…কাঞ্চন… অবিদ্যা? মাগো, তুই একি করলি?…

লক্ষ্মীনারায়ণ ভক্ত হইলেও ব্যবসায়ী, তিনি ধীরে ধীরে ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন,—সাধুমহাত্মাদিগের পক্ষে অর্থগ্রহণ ধর্ম্মহানিকর হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেবার জন্যও তো অর্থের প্রয়োজন হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। তিনি নিজে নাই-বা গ্রহণ করিলেন, যাঁহারা তাঁহার সেবাযত্ন করেন তাঁহাদিগের নামে এই সাধুসেবার অর্থ গচ্ছিত থাকিতে পারে।

তাঁহার এই নিবেদন ঠাকুর সময়ান্তরে মা-সারদাকে জানাইলেন,—ওগো, লক্ষ্মীনারান মাড়োয়ারী দশ হাজার টাকা আমায় দিতে এসেছিলো। তা,' আমি তো আর টাকা লই না। তোমার নামে সে কোম্পানীর কাগজ কিনে দিতে চাইছে, তাই থেকে বছর বছর অনেক টাকা সুদ পাওয়া যাবে, তা'তে তোমার খরচ চ'লে যাবে। বেশ হবে, কি বল তুমি?

মায়ের শ্রীমুখের উত্তর,—সে কি হয়? আমি নিলেও তোমারই নেওয়া হবে, সে টাকা তোমার সেবাতেই খরচ হবে। তুমি যে-টাকা নেবে না, আমি তা' কি ক'রে নেবো? ও টাকা আমাদের চাই না।

মা-সারদার পক্ষে এইরূপ উত্তরই স্বাভাবিক। যেমন ঠাকুর, তেমনই ঠাকুরাণী। সংসারের প্রয়োজন একপ্রকার চলিয়া যাইত সত্য, কিন্তু সচ্ছলতার মধ্যে অবশ্যই নহে। সেই অবস্থায় দশ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান, তুচ্ছ কথা নহে।

পত্নীর কঠোর আদর্শ এবং বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হইলেন। পত্নীর অন্তরের এই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যক জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন; এবং এমন শ্রদ্ধা করিতেন, যাহা পতিপত্নীর মধ্যে দেখা যায় না।"

এইস্থানে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

"মা-সারদা একদিন কর্ম্মোপলক্ষে ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তিনি মুদ্রিতনয়নে শয্যায় শায়িত আছেন। কর্ম্মান্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহার পদশব্দে মনে করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি কোন কাজে ঘরে আসিয়াছে; বলিলেন,—যাবার সময় দোরটা ভেজিয়ে দিস।

মা-সারদা বলিলেন,—হ্যাঁ, দিচ্ছি।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন,—ইনি পত্নী,

ভ্রাতুষ্পুত্রী নহে। পত্নীকে তিনি কখনও 'তুই' সম্বোধন করিতেন না। এখন লক্ষ্মী মনে করিয়া 'তুই' বলিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাতে তিনি মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন,—ওঃ তুমি! ভেবেছিলাম লক্ষ্মী বুঝি, ভুলে 'তুই' ব'লে ফেলেছি। তা' তুমি কিছু মনে করোনি কিন্তু, আমি জেনেশুনে অমন বলিনি। এই ধরণের কথা শুনিয়া মা-সারদা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ওমা শোন কথা, আমি কী আবার মনে করবো? কিছু অন্যায় হয়নি এতে। এই বলিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অন্যায় হয় নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে পত্নীর প্রতি অসম্ভ্রমসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, এই বিষয় চিন্তা করিয়া রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। এইখানেই শেষ নহে, প্রাতঃকালে নহবতে গিয়া পত্নীর নিকট পুনরায় ত্রুটিস্বীকার করিলেন,—তোমাকে অমন অশিষ্ট সম্বোধন ক'রে অশান্তিতে রাত্রে আমার ঘুম হয়নি, তুমি সত্যই অসন্তুষ্ট হওনি তো?

সামান্য একটা কথাকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়া পতি সারা-রাত্রি কষ্ট পাইয়াছেন, ইহাতে মা মনে মনে আহত হইলেন। মুখের হাসিতে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—এসব কি বলছো তুমি? এতে অন্যায়টা কি হয়েছে? আমিই-বা অকারণে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'তে যাবো কেন? অমন ক'রে আমায় আর লজ্জা দিওনা।"

"একদিন ভাগিনেয় হৃদয়রাম মা-সারদাকে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মা তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া

ক্ষুণ্ণমনে নিজকক্ষে চলিয়া যান। ঠাকুর তখন ভাগিনেয়কে বুঝাইয়া বলিলেন,—ও হৃদু, তোর কল্যাণের জন্যেই বলছি বাবা, আমাকে উপেক্ষা কর, অপমান কর, তা'তে তোর ক্ষতি নাও হ'তে পারে। কিন্তু সাবধান, ওর মনে দুঃখু দিসনি ; ও রাগলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও তোকে রক্ষে ক'রতে পারবে না।"

পত্নীর সহিত একত্র থাকিতে হইয়াছে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকেও নারীজ্ঞান করিতেন, তাঁহারা উভয়েই ধর্ম্মসঙ্গী এবং আনন্দময়ীর সন্তান। শ্রীশ্রীমা যে তাঁহার স্ত্রী একথা তাঁহার মনেই হইত না। একদিন স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "মন্দিরে যে মায়ের পূজা হয়, সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করিতেছেন। আবার তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়াই তোমাকে সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি।"

পত্নীও পতিকে নানাভাবে দর্শন করিয়াছেন,—দেবপতিজ্ঞানে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, নিজেকে বিশ্বজননীবোধে তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিয়াছেন, আবার পতিদেহে মা-কালীর রূপও তিনি দর্শন করিয়াছেন।

"একদিবস ঠাকুরের ভোজনকালে তিনি নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার হস্ত নিশ্চল হইয়া আসিল, বিস্মিত হইয়া তিনি পতির বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূমিনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম

করিলেন। ইহাতে ঠাকুর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—কি গো, এমন অসময়ে প্রণাম ?

মা-সারদা কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

ঠাকুর পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—কি হয়েছে, বল না গো ?

এইবারও মা নিরুত্তর রহিলেন।

বালকস্বভাব ঠাকুরের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, ভোজন বন্ধ রাখিয়া তিনি তৃতীয়বার বলিলেন,—সে হবে না, কি হয়েছে তোমায় বলতেই হবে।

অগত্যা মা বলিলেন,—আমি দেখলাম কি, তুমি তো খাচ্ছ, তোমার কাঁধ পর্য্যন্ত তোমার দেহই রয়েছে, কিন্তু তার উপরে মা-কালীর মাথা, আর তা'তে সোনার মুকুট ঝলমল করছে। তোমার হাত দিয়ে মা-কালীই খাচ্ছেন।

ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুর বলিলেন,—ঠিকই দেখেছো তুমি।

অলৌকিক তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী, অনুপম তাঁহাদিগের চরিত্র, আর অপূর্ব্ব তাঁহাদিগের সাধনা। প্রাকৃত নরনারীর দাম্পত্য-জীবনের বহু উর্দ্ধে ঠাকুরের সহিত মা-সারদার সম্বন্ধ—দেবদুর্লভ বস্তু।

সুরভিত কুসুম দেবতার পূজায় নিজেকে নিবেদিত করিয়া সার্থক হয়। ব্রজের রাধারাণী নিজের দেহ এবং প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্ত্যর্থে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া—নিজের পৃথক সত্তা ভুলিয়া—প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়াছিলেন। মা-সারদাও তাঁহার অভীষ্টকে

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াই পূর্ণ, তাঁহার সহিত অভিন্ন এবং একাত্মা।

নারীতে মাতৃভাব এবং পত্নীতে ব্রহ্মময়ীভাব উপলব্ধি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে আর এক সংকল্পের উদয় হইল এবং তিনি চাহিলেন সেই উপলব্ধিকে পূর্ণতা দিতে। স্থির করিলেন, পরবর্ত্তী অমাবস্যা তিথিতে সর্ব্বকর্ম্মফল-বিনাশিনী শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে প্রত্যক্ষ জগজ্জননীজ্ঞানে পত্নীকে ষোড়শী-পূজা করিবেন; সাধনা, সিদ্ধি, সর্ব্বস্ব সেই দেবীর চরণে সমর্পণ করিবেন। কালীমন্দিরে ঐ পুণ্যদিবসে অধিক জনসমাগম হইবে জানিয়া, তাঁহার নিজকক্ষেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে পূজার আয়োজন করা হইল। মা-সারদাকে যথাকালে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আহ্বান জানাইলেন।

অমাবস্যার তমোময়ী রজনী। সম্মুখে কলনাদিনী পূতসলিলা ভাগীরথী, অদূরে সিদ্ধপীঠ পঞ্চবটী এবং মাতৃমন্দির। পূজাপ্রকোষ্ঠ ধূপ গুগ্গুল পুষ্পচন্দনের দিব্য সৌরভে আমোদিত। পূজক একখানি আসনে উপবিষ্ট, বদনমণ্ডল তাঁহার দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার সভক্তি আহ্বানে আরাধ্যা দেবী মা-সারদা ধীর-পদক্ষেপে পার্শ্বস্থিত আলিম্পন-চিত্রিত পীঠের উপরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অধিষ্ঠিত হইলেন। কোন জিজ্ঞাসা নাই,—নির্ব্বাক, ভাবাবিষ্ট।

পূজক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূত গঙ্গোদকে দেবীর অভিষেক করিলেন। তাঁহাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। চরণ-যুগল রঞ্জিত করিলেন অলক্তকরাগে, হস্তদ্বয় শোভিত করিলেন

শঙ্খ ও সুবর্ণবলয়ে, সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিলেন ললাটে। কণ্ঠে দোলাইয়া দিলেন সুবাসিত পুষ্পমাল্য।

অতঃপর তদ্গতচিত্তে পূজক ষোড়শোপচারে পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার যথাবিধি পূজা করিলেন। নিবেদিত ভোজ্যদ্রব্যের কিঞ্চিৎ দেবীর শ্রীমুখে প্রদান করিলেন, বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিয়া দেবীর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন।

অমিতশক্তিসম্পন্না সহধর্ম্মিণী তাহাতে আপত্তি করিলেন না, জগজ্জননীরূপে পতির সেই পূজা গ্রহণ করিলেন। অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞানও তিরোহিত হইল,—তিনি সমাধিতে নিমগ্না।

পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণীর চরণকমলে রুদ্রাক্ষের মালা ও ইষ্টদ্রব্যাদির সহিত আত্মনিবেদন করিলেন, সচন্দন-পুষ্পপত্র অঞ্জলি দিয়া ভক্তিভরে দেবীর চরণসরোজে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর 'মা-মা-মা' বলিয়া গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।"*

সাধকের অপূর্ব্ব সাধনা সম্পূর্ণ হইল। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই আপ্তবাক্য যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—
"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

---

* "সারদা-রামকৃষ্ণ"

বিশ্ববাসীকে তিনি নিজের সত্যানুভূতি শুনাইলেন,—পবিত্র দেহমনে তপস্যাযুক্ত হইয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিলে ভগবানকে লাভ করা যায়, যদি ডাকার মত ডাকা যায়। মানুষ যেমন মানুষকে দেখিতে পায়, তেমনই তাঁহাকেও দেখা যায়। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে জানিয়াছি, তাঁহাকে পাইয়াছি। উপযুক্ত লোক পাইলে তাহাকেও দেখাইতে পারি।

এইরূপে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার ঐশ্বর্য্যে আপনিই বিভোর, কস্তুরীমৃগের ন্যায় আপনার গন্ধে আপনিই মাতোয়ারা, তখন সেই দিব্যগন্ধ বিকীর্ণ হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া লীলাসঙ্গিগণ একের পর এক আসিয়া তাঁহার পাদমূলে মিলিত হইলেন। কত গৃহী আসিলেন, ত্যাগী আসিলেন, কত বিশ্বাসী আসিলেন, সংশয়ী আসিলেন, কত পণ্ডিত আসিলেন, মূর্খ আসিলেন, করুণার সাগর শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকেই মুক্তহস্তে কৃপা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

প্রথমদিকে আসিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি এবং ভগবৎপ্রেমে তন্ময়তার কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা কিছুদিন যাবৎ তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সাধারণের মধ্যে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

তাঁহার প্রায় চারি বৎসর পরে মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। আরও দুই-এক বৎসর

পরে অন্যান্য অন্তরঙ্গগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সঠিক করিয়া কিছু জানা যায় না। শেষের চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গৌরীমা, গোপালের মা, গোলাপমা-প্রমুখ পূজনীয় গৃহী ও ত্যাগী অন্তরঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগুরুর চরণতলে মিলিত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কতিপয় প্রিয় সন্তানকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাতাঠাকুরাণীর নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। ঠাকুরের নির্দ্দেশ-মত তাঁহার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে কেহ কেহ মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষালাভও করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই কোন কোন নারীকেও তিনি দীক্ষাদান করেন। কেবল ইঁহারাই নহেন, রসিক মেথর, পথভ্রষ্টা সরযূ প্রভৃতি সমাজে অবজ্ঞাত কত নরনারীকেও তিনি কৃপা করিয়াছেন। যেদিন এইসকল পুণ্যকথা সম্যক প্রকাশিত হইবে, মানুষ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিবে যে, তাহারা এতকাল যাহা জানিয়া আসিয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণ চিত্র নহে,—দক্ষিণেশ্বর কেবল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নহে, দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ উভয়েরই বিচিত্র লীলাভূমি।

দক্ষিণেশ্বরে

দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বসু এবং অন্যান্য সঙ্গিগণের সহিত গৌরীমা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চিত্ত গুরুপাদ-পদ্মেই নিবদ্ধ রহিল। তিনি স্থির করিলেন, পরদিবস গিয়া ঠাকুরের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।

পরদিবস প্রত্যূষে গৌরীমা পুনরায় বাহির হইলেন। বলরাম বসুর দারোয়ান ঐদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। গঙ্গার ঘাটে যাইয়া স্নানান্তে গৌরীমা দারোয়ানকে বলিলেন, "তুমি যাও এখন, আমার যেতে দেরী হবে। দাদাবাবুকে বলো, আমার জন্য যেন না ভাবেন।" দারোয়ানকে বিদায় দিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। সঙ্গে দামোদর, আর দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের সদর দরজার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, গৌরীমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "তোর কথাই ভাবছিলুম।"

ঠাকুরের সহিত দীর্ঘকাল অদর্শন এবং দামোদরের সিংহাসনের উপর তাঁহার চরণযুগল দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমা ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো তা বুঝতে পারিনি, বাবা!" উত্তরে ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে এত সাধনভজন কি ক'রে হ'ত?"

ঠাকুরের সেবাযত্নের উদ্দেশ্যে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানায় বাস

করিতেন। গৌরীমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়া ঠাকুর বলিলেন, "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, একজন সঙ্গিনী এলো।"

শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন, কোন পুরুষমানুষের সম্মুখে বাহির হইতে হইলে নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতেন। এমন-কি, পরবর্ত্তিকালেও নিজের ভক্তসন্তানগণের সকলের সহিত তিনি কথা বলিতেন না। গৌরীমাকে সঙ্গিনী পাইয়া, বিশেষতঃ বাহিরের কাজের পক্ষে, তাঁহার খুবই সুবিধা হইল। গৌরীমাও দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া পরমারাধ্য গুরুদেব এবং গুরুপত্নীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে না থাকিলে গৌরীমা কলিকাতায় গিয়া থাকিতেন ; কিন্তু তাঁহার মন দক্ষিণেশ্বরেই পড়িয়া থাকিত। বলরাম বসুর গৃহে অবস্থানকালে একদিন আহার করিতে করিতে ঠাকুরকে দর্শন করিবার ইচ্ছা তাঁহার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, আহারান্তে হাতমুখ ধুইতেও ভুল হইয়া গেল। সেই অবস্থাতেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হাতমুখ তখনও ধোওয়া হয় নাই। লজ্জিত হইয়া গঙ্গায় হাতমুখ ধুইতে গেলেন।

দক্ষিণেশ্বরের প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেবাসঙ্গী পূজনীয় রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "* * শ্রীযুক্তা গৌরী দিদিমণি * * শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রিয়শিষ্যা। মেয়েদের ভিতরে ঠাকুর ইঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ ও

ভালবাসিতেন এবং ইনি নিজহস্তে ঠাকুর যাহা ভোজনাদিতে খুবই প্রীতিপ্রসন্ন হইতেন ঐ সমস্ত উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী তৈয়ারি করিয়া পরমযত্নে সেবাদি কত সময় করাইতেন। এবং অতি সুকণ্ঠে নহবতে ঠাকুরকে কতোই অতিশয় ভাব ও মহাভাব সংযুক্ত গান এবং কীর্ত্তনাদিতে সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। এহা আমি প্রত্যক্ষে কতোই আনন্দিত হইতাম, * * আরোও ঠাকুর বলিতেন যে গৌরী মহাতপস্বিনী এবং মহাভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী। * *"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন গৌরীমার হস্তে সন্ন্যাসের বস্ত্র দেন। অন্যান্য বিধিব্যবস্থা ঠাকুরের উপদেশমত তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। ঠাকুর নিজে হোমে একটি বেলপাতা দিয়াছিলেন। এইসময় ঠাকুর তাঁহাকে 'গৌরী-আনন্দ' নাম দেন। গৌরীমা তাহাতে বলেন, "আমি গৌরের দাসীর দাসী, তাতেই আমার আনন্দ।" নিজেকে 'গৌরদাসী' বলিয়া তিনি গর্ব্বানুভব করিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'গৌরী' বলিয়াই ডাকিতেন, কদাচিৎ 'গৌরদাসী'ও বলিতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে 'গৌরদাসী' বলিতেন। তৎকালীন ভক্তগণ 'গৌরমা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।[১] তাঁহার আত্মীয়স্বজন অনেকে তাঁহাকে 'যোগিনীমা' এবং 'দামুর বৌ'[২] বলিতেন।

---

(১) স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দের বহু বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৫-৯৭ খৃষ্টাব্দে) লিখিত পত্রপাঠে জানা যায়, তাঁহারা তাঁহাকে তখন 'গৌরীমা' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন।

(২) শ্রীশ্রীদামোদরের পত্নী।

গৌরীমার নিত্যপূজিত নারায়ণশিলা দামোদরকে ঠাকুর বুকে মাথায় করিয়া আদর করিতেন, আর বলিতেন, "তোর এটি সিদ্ধ শালগ্রাম। আমায় যিনি সাধনভজন শিখিয়েছিলেন তাঁরও এরকম একটি ছিল। তাঁরটা আরও বড়।" শ্রীশ্রীমা দামোদরকে 'জামাই-ছেলে' বলিতেন এবং জামাইষষ্ঠীতে তাঁহাকে কাপড় ও ফলমিষ্টি দিতেন।

গৌরীমার একবার অভিলাষ হইয়াছিল, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যেমন ভক্তবৃন্দ লইয়া মহাভাবে মত্ত হইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে একবার সেইরূপ দেখেন। অবশ্য, মনের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া তিনি কাহাকেও বলেন নাই।

"কিছুদিন পরে রবিবারে একদিন।
একত্রিত বহু ভক্ত নবীন প্রবীণ॥
সেইদিন গৌরমাতা মায়ের মন্দিরে।
রন্ধনশালায় রত ভকতির ভরে॥
শ্রীপ্রভুর সেবা-হেতু পরম যতন।
খেচরান্ন ব্যঞ্জনাদি করেন রন্ধন॥"*

ঠাকুর বসিয়া আছেন। ঘরে বাহিরে ভক্তগণ তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন, কেহ দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছেন। সকলের মনে আনন্দ—ঠাকুরের ভোজন দর্শন করিবেন।

"হেনকালে গৌরমাতা ভক্তি-অনুরাগে।
থুইল ভোজন থাল শ্রীপ্রভুর আগে।"*

* "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"

প্রসন্নচিত্তে ভোজন করিতে করিতে ঠাকুর ভক্তগণের নিকট গৌরীমার ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। এইসময় গৌরীমার ভাবাবেশ হইল, ঠাকুরও মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেইস্থান মহাভাবের বন্যায় প্লাবিত হইল। ভক্তগণ একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, সকলে ভাবাবেগে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে ঠাকুর সকলের দেহ স্পর্শ করিলেন,—

"স্বভাবস্থ হয় সবে শ্রীহস্ত-পরশে।
বলিবার নহে কথা ভাষা যায় ভেসে॥
থালভরা প্রসাদ আছিল শ্রীমন্দিরে।
ভক্তগণ খায় মহা আনন্দের ভরে॥
প্রসাদে প্রসাদজ্ঞান সমান সবার।
একত্রে ভোজন, নাই জাতির বিচার॥"

আর এক দিনের ঘটনা।

গৌরীমা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেব কীর্ত্তনানন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূমিতলে পড়িয়া যাইতেন। ঠাকুরের সেইরূপ ভাবের বন্যা আসে, কিন্তু তিনি কখনও আছাড় খাইয়া পড়িয়া যান না। এইদিন গৌরীমা, রামচন্দ্র দত্ত এবং আরও কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ বলিতে বলিতে ঠাকুর প্রেমাবেশে য়া দাঁড়াইলেন এবং কেহ ধরিবার পূর্ব্বেই টলিতে টলিতে

ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, এমন ত কখনো হয় নাই! ঠাকুর এইভাবে পড়িয়া গেলে গৌরীমা মর্ম্মাহত হইলেন,—কেন আমার মনে এমন কথার উদয় হলো? আমার জন্যই ঠাকুরের অঙ্গে আঘাত লাগলো। রামচন্দ্র দত্ত এই নূতন লীলারঙ্গের মধ্যে কোন রহস্য আছে মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট প্রশ্ন করিলেন। ঠাকুর শুধু ঈষৎ হাসিয়া গৌরীমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র দত্ত তখন গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নিশ্চয়ই এর কারণ জানেন।" গৌরীমা অগত্যা তাঁহার মনে যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিলেন।

ঠাকুর একবার পানিহাটি যাইতেছিলেন। দুইখানা নৌকা ভাড়া করা হইল। কয়েকজন মহিলাভক্তসহ গৌরীমা দ্বিতীয় নৌকাতে ছিলেন। আড়িয়াদহের কাছে একস্থানে ঠাকুর নৌকা ভিড়াইতে বলিলেন। সেখানে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া জনৈকা মহিলা নিবিষ্টচিত্তে শিবপূজা করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহার সমক্ষে গিয়া উপস্থিত। তাহার পর নিজেও ভাবাবিষ্ট হইলেন, আর সেই ভক্তিমতী মহিলার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। কিছুক্ষণ পর সেই মহিলার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঠাকুর ভাববিহ্বল অবস্থায় পুনরায় নৌকায় আসিয়া উঠিলেন।

একদিন কয়েকজন মহিলাসহ গৌরীমা কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে খড়দহে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া যাওয়া স্থির হইল। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে আসিয়া তিনি সঙ্গিনীদিগকে বলিলেন, "তোমরা একটু

অপেক্ষা কর, আমি দেখে আসি ঠাকুর আছেন কি-না।” ঠাকুরের ঘরে গিয়া তিনি দেখেন, ঠাকুর সমাধিস্থ, অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। হাতের কাছে দৈত্যশিশু প্রহ্লাদের একখানি চিত্র পড়িয়া আছে। তিনি বুঝিলেন, প্রহ্লাদের চিত্র দেখিয়াই তাঁহার ভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পর ঠাকুর বলিলেন, "জ-জ-জল।" তিনি জল দিলেন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

গৌরীমার সহিত কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বলিলেন, “ঘাটে যে মেয়েদের রেখে এলি, ওরা ত এতক্ষণ ছটফট কচ্ছে!” ঠাকুরের অবস্থা দর্শনে গৌরীমা তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তখন যাইয়া মহিলাদিগকে লইয়া আসিলেন। বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, “আমি আজ শ্যামকে কোলে করেছিলুম। শ্যামের বেশ পরিবর্ত্তন হয়েছে, পরনে কল্কাপেড়ে কাপড়, মাথায় মুকুট।” খড়দহে যাইয়া মহিলাগণ দেখিতে পাইলেন, শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে ঠাকুরের সকল বর্ণনাই সত্য।

গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। গৌরীমার কনিষ্ঠা ভগিনী ব্রজবালা এবং আরও দুই-এক জন আত্মীয়ও ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। গিরিবালার রচিত মাতৃসঙ্গীত তাঁহারই সুমধুর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুরের ভাল লাগিত। কিন্তু গিরিবালা অপরিচিত লোকের সম্মুখে গাহিতে বড়ই লজ্জানুভব করিতেন। ঠাকুরও ছাড়িতেন না, তাঁহার সঙ্কোচ বুঝিয়া বলিতেন, “আচ্ছা, আমি সব লোক ঘর

থেকে বের ক'রে দিচ্ছি। সেই গানটি আর একবার গাও, মা।" ঠাকুরের আদেশে গিরিবালা দেবীকে অগত্যা গাহিতে হইত,—

হর-হৃদি-পদ্মে মায়ের পাদ-পদ্মে কি এতই শোভা,
কত যোগী ঋষি চিন্তে যাঁরে, চিন্তামণির মনোলোভা।
যেন মুক্তি অভিলাষী নখরে পড়েছে শশী,
বিনাশে হৃদি-তামসী তরুণ অরুণ জিনি আভা।
'কিঙ্করী' মনেরে বলে, পূজ ও-পদ-কমলে
রাখিয়ে হৃদি-কমলে মনে মনে দাও রে জবা॥

গিরিবালা শ্রীশ্রীমাকেও ভক্তি করিতেন, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল অধিক। মাতা ও কন্যায় সময় সময় এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক চলিত। গিরিবালা বলিতেন, তোদের ভেতরে এখনও অনেক অভাব রয়েছে। আমার হৃদয়ে স্বয়ং ত্রিপুরেশ্বরী বিরাজ কচ্ছেন, আমার আর কারুর প্রয়োজন নেই। গৌরীমা দুঃখিত হইয়া বলিতেন, ভাগ্যে থাকলে তবে ত বুঝবে!

এইরূপ বাদানুবাদের পর গৌরীমা একবার গিরিবালাকে একপ্রকার জোর করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবৎখানায় গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা যাইতেই তিনি সহাস্যবদনে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিবালা শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই বিস্মিতকণ্ঠে "এ্যাঁ, মা তুমি! তুমি! এ যে আমার সেই—" বলিয়া পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পদধূলি কপালে ও মাথায় মাখিতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমা হাসিয়া উঠিলেন, "কি হয়েছে গো,

অমন কচ্ছ কেন?" ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বুঝিয়া গৌরীমা বিজয়গর্ব্বে বলিলেন, "হবে আবার কি? যা হবার তাই হয়েছে।" শ্রীশ্রীমা খুব হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা ভবানীপুরে গিরিবালা দেবীর গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-ঘরে বসিয়াছিলেন সেই ঘরখানি গিরিবালার অবর্ত্তমানেও দীর্ঘকাল পূজাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়, বলরাম বসু-প্রমুখ ভক্তগণ অনেকেই একাধিকবার গিরিবালার গৃহে গিয়াছেন এবং মা-কালীর প্রসাদ পাইয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে গৌরীমা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের দিন ভক্ত বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। ঐ নবাগতকে দেখিতে পাইবামাত্র ঠাকুর আনন্দে গদগদ হইয়া তোত্‌লার মত বলিয়াছিলেন, "কে আসছে বল ত, বলরাম?" বলিতে বলিতেই দাঁড়াইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া সমাধিস্থ। তাঁহাদের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেন, "এ-যে সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব আর অরুন্ধতী।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বেলতলাস্থ কুটীরেও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা পদধূলি দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মনোমোহন মিত্র-প্রমুখ ভক্তগণও তাঁহাদের কুটীরে যাইয়া উৎসব করিয়াছেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণদম্পতীর অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী একদিন

বলিয়াছিলেন, "বাপ্-রে, এরা এই হোগলার চালার মধ্যে কি কাণ্ডটাই না কচ্ছে!"

ঠাকুরের ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিত মিষ্টার উইলিয়াম নামক জনৈক সাহেব ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া গৌরীমাকে দর্শন করিতে বলেন। তদনুযায়ী উইলিয়াম সাহেব একদা বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরীমা সম্মুখে আসিলে উইলিয়াম ভাবাবিষ্ট অবস্থায় "মাদার মেরী, মাদার মেরী" বলিতে বলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং "ভগবানে আমার ভক্তি হউক" এই প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরীমা তাঁহাকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ জানাইয়া প্রসাদ দিলেন। উইলিয়াম সাহেব প্রসাদকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যে-সকল ত্যাগী সন্তান আসিতেন, ঠাকুরের নির্দ্দেশমত তাঁহারা কেহ তাঁহার ঘরে, কেহ মন্দিরে, কেহ পঞ্চবটীতলায়, কেহ-বা বেলতলায় বসিয়া জপধ্যান করিতেন। ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে ভাবিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে ডাকিয়া খাইতে দিতেন। তিনি বলিতেন, ওরে, তোরা খেয়ে নে, তারপর আবার জপধ্যান করবি। মা ত পর নন। পেট ঠাণ্ডা ক'রে ডাকলেও মা রাগ করবেন না। আবার বলিতেন, কলিতে বেশী কঠোরতা করলে শরীরে সইবে না। শরীর সুস্থ না থাকলে নির্ব্বিঘ্নে সাধনভজন হয় না। ঠাকুরের নির্দ্দেশমত গৌরীমাও এই

সাধনরত ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে আহার্য্য দিয়া আসিতেন। তাঁহাদিগকে তিনি সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল টাখাল এরা সব তখন ছোট। একদিন রাখালের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বড় ক্ষিধে পেয়েছে, ঠাকুরকে বল্‌লে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে'—বলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হতে বলরাম বাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলো এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুর ত আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন, 'ওরে আয় না রে, রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। ক্ষিধে পেয়েছে বল্‌লি যে।' রাখাল তখন রাগ করে বলতে লাগল, 'আপনি অমন করে সকলের সামনে ক্ষিধে পেয়েছে বল্‌লেন কেন?' তিনি বললেন, 'তাতে কি রে, ক্ষিধে পেয়েছে, খাবি, তা বলতে দোষ কি?"*

একবার রামনবমীর উপবাসদিবসে ঠাকুর জলযোগ করিতেছিলেন, একটা মিষ্টির অর্দ্ধেকটা খাইয়া বাকিটা গৌরীমাকে দিলেন। তিনিও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা ভক্তিভরে গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই রেঃ! আজ

* "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" (উদ্বোধন কার্য্যালয়)

যে রামনবমীর উপোস!" গৌরীমা সহজভাবেই ইহার উত্তর দিলেন, "তোমার ওপরেও কি আমার বিধিনিষেধ?" গৌরীমা অত্যন্ত কঠোরতার সহিত নিয়মনিষ্ঠা পালন করিতেন। ঠাকুর আস্তে আস্তে তাঁহার কঠোরতা অনেকটা কমাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা ভক্তদের অনেককে বলিয়াছেন, "গৌরদাসীর মত কঠোর তপস্যা একালে কারুর ধাতে কুলোবে না।"

গৌরীমা যখন বৃন্দাবনে তপস্যা করিতেন, তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন-সম্বন্ধে একদা এক ব্রজবালক তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আরে মায়ী, ক্যা তু দিনভর ভজন সাধন করতে হ্যায়? সবেরে উঠ্‌কে একদফে বোল দেনা 'রাধেশ্যাম', ব্যস্, হো গিয়া।" গৌরীমা নিজেও বলিতেন, "সত্যিকারের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যদি ডাকার মত ডাকা যায়, তবে ত এক ডাকেই হয়। কিন্তু মনকে সেভাবে প্রস্তুত করতে হ'লে অভ্যাসযোগ অর্থাৎ তপস্যার প্রয়োজন।" তিনি নিজে কঠোর তপস্যা করিয়া আনন্দ পাইতেন। বৃদ্ধবয়সেও তিনি প্রতিদিন লক্ষনাম জপ করিতেন। দিনের বেলায় কর্ম্ম-কোলাহলে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে গভীর নিশীথে জপ করিতেন।

গৌরীমা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পিতৃজ্ঞানে এবং শ্রীশ্রীমাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিতেন। তিনি ঠাকুরকে অবতার মনে করিতেন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত দেখিয়া গৌরীমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। ইহাতে কেহ সংশয় প্রকাশ করিলে তিনি প্রাণে আঘাত পাইতেন।

কলিকাতার এক বিশিষ্ট এবং ভক্তিমান ব্যক্তির সহিত মধ্যে

মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা হইত। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কথা বলিতে বলিতে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিত। একদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে গৌরীমা বলেন, "আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও তিনি, এই দু'য়ে অভেদ।" ইহা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, "অহো, একি শুনলুম! ভগবানের নামের সঙ্গে মানুষের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হলো!" এই কথায় গৌরীমা ব্যথিতচিত্তে তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, সেই এবে রামকৃষ্ণ," এই বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

ঠাকুর একদিন গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ মা, আমাকে তোর কি মনে হয়?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, "তুমি আবার কে? তুমি সেই।" এই বলিয়া তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে একটি চরণ আবৃত্তি করিলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" *

এইরূপ উত্তর শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ইল্লি'! সেদিন যে-সকল ভক্ত তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, বালকের ন্যায় সরলভাবে তিনি তাঁহাদের কাছে বলেন, "দেখ গো, গৌরী বলছে, আমি না-কি 'সেই'—।

* একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। আর এইসকল (মৎস, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ) কেহ কেহ তাঁহার অংশবিশেষ এবং কেহ কেহ তাঁহার বিভূতিবিশেষ।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি গৌরীমার অনুরাগাধিক্য দর্শনে ঠাকুর একদা কৌতুকচ্ছলে বলেন, "তুই কা'কে বেশী ভালবাসিস্ ?" গৌরীমা গান গাহিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন,—

"রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হ'লে
ডাকে মধুসূদন ব'লে,
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।"

গান শুনিয়া শ্রীশ্রীমা কুণ্ঠায় গৌরীমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া ঠাকুর মৃদু হাসিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দক্ষিণেশ্বরে যে-সকল নারী যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতেন, মাতাঠাকুরাণী যে কর্ণাভরণাদি অলঙ্কার ধারণ করিতেন তাহা আদর্শবিরোধী, কারণ, পরমহংস মশাই যাঁর স্বামী, তাঁর কি গয়না পরা ভাল দেখায় ?

কিন্তু গোপালের মা, গৌরীমা, কৃষ্ণভাবিনী-প্রমুখ কয়েকজন বিপরীত মতাবলম্বী ছিলেন। মাতাঠাকুরাণী যাহা করিতেন, তাঁহারা তাহাই নিশ্ছিদ্র ও নির্ভুল বলিয়া মনে করিতেন।

অলঙ্কারসম্বন্ধে একদিন জনৈকা ভক্তিমতীর প্রতিকূল মন্তব্য শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। পতির চিহ্ন কিছু একটা গায়ে থাকা উচিত, বালাজোড়া হাতে রহিল।

অলঙ্কারবর্জ্জনের ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল গৌরীমার অসাক্ষাতে। তিনি সেদিন কলিকাতায় ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের গৃহে গিয়াছিলেন।

ফিরিয়া আসিতেই যোগেনমা মায়ের যোগিনীবেশের কারণ তাঁহাকে জানাইলেন। গৌরীমা চিরকালই তেজস্বিনী, মাতৃ-অঙ্গের আভরণ খুলিতে যাঁহারা উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহা-দিগের উদ্দেশে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহার পর মাকে বলিলেন,—তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তোমায় এমন বেশ কি ধরতে আছে মা! তোমার গায়ে সোনা থাকলে তা'তে জগতেরই কল্যাণ।

গৌরীমা ও যোগেনমা দুইজনে মিলিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সকলপ্রকার আভরণ এবং উত্তম বস্ত্রে সজ্জিত করিলেন। তাহার পর চরণে প্রণত হইয়া গৌরীমা বলিলেন, কেমন সুন্দর মানিয়েছে, বলতো! চল, একবার কর্ত্তাকে দর্শন দেবে। মা এইরূপ বেশে ঠাকুরের নিকট যাইবেন না, গৌরীমাও ছাড়িবেন না; একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

গৌরীমা মাতাঠাকুরাণীকে জগজ্জননীজ্ঞানে ভক্তি করিলেও মায়ের সঙ্গে তাঁহার ছিল এক অপূর্ব্ব সম্পর্ক। কখনও মাতাপুত্রী, কখনও সঙ্গিনী, আবার কখনও সখীরূপে তাঁহাদের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ হাস্যপরিহাসও চলিত।—একদিন শেষরাত্রে নহবৎ-ঘরের সম্মুখস্থ ঘাটে মা স্নান করিতে গিয়াছেন। গৌরীমা তখনও কয়েক ধাপ উপরে আছেন। জলের নিকটে সিঁড়িতে প্রকাণ্ড কি-একটা পড়িয়া ছিল, তাহাতে মায়ের একখানি পা লাগিবামাত্র তিনি "আ-রে বাপ্-রে" বলিয়া ত্রস্তপদে উপরে উঠিয়া আসিলেন। গৌরীমা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—কু-মী-র গো!

গৌরীমা সহাস্যে বলিলেন,—কুমীর নয় মা, কুমীর নয়; ও শিব, তোমার চরণপরশ পাবার লেগে প’ড়ে আছে।

মা বলিলেন,—রাখ তোমার রঙ্গ, আমি বলে ভয়ে মরি! কী সর্ব্বনাশ, একেবারে কুমীরের ওপর গিয়ে পড়েছিলুম!

তুমি অভয়া, তোমার আবার ভয় কিসের? উত্তরে বলেন গৌরীমা।

শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশমত গৌরীমা মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন, তিনি কি করিতেছেন। ঘরে তাঁহাকে না দেখিলে বাগানের দিকে, বিশেষ করিয়া গঙ্গার ধারে খুঁজিতে বাহির হইতেন,—কোথায় ভাবঘোরে বেহুঁস হইয়া তিনি পড়িয়া আছেন। একদিন দেখেন, তিনি গঙ্গার ধারে গোলাপ বাগানের মধ্যে সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন। পরিধেয় বস্ত্র কাঁটায় জড়াইয়া গিয়াছে। গৌরীমা কাঁটা খুলিয়া আস্তে আস্তে তাঁহাকে ঘরে লইয়া আসিলেন। দুই-এক দিন তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে একেবারে জলের ধারেও পাইয়াছেন, শেষ-সিঁড়িতে বসিয়া গঙ্গার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন।

একদিন ঠাকুর তাঁহার ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বারবার ডাকিতেছেন, “মায়া আয়, মায়া আয়, মায়া আয়।” গৌরীমা ইহা দেখিয়া বলিলেন, “ব্যাপারখানা কি? বড় ব্যস্ত হ’য়ে মায়াকে ডাকা হচ্ছে যে!” কন্যার নিকট ধরা পড়িয়া ঠাকুর বলেন, “বুঝলি না, মনটা আজকাল সব সময়েই

ওপরের দিকে উঠে থাকে, চেষ্টা করেও নাবাতে পারি না। তাই মায়াকে ডাক্‌ছি, যাতে মায়ায় জড়িয়ে ছেলেদের নিয়ে আরও কিছুদিন ভুলে থাকা যায়।"

লীলাসঙ্গিগণের সহিত বিমল আনন্দ উপভোগের মধ্যেও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলনাদিনী জাহ্নবীর তরঙ্গে তরঙ্গে শুনিতে পাইতেন,—পৃথিবীর পাপতাপহত জীবের হাহাকার, অভাব অভিযোগের আর্ত্তনাদ। তাঁহার হৃদয় জীবের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিত, নয়নে অবিরল ধারা বহিত। সেই কারণেই তিনি 'শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা'র বীজ উপ্ত করিয়া গেলেন তাঁহার সন্তানগণের হৃদয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীগুরুর প্রাণের এই কথাই বলিয়াছেন,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

পরবর্ত্তিকালে গুরু মহারাজের নাম লইয়া নবীন কর্ম্মীর দল আত্মসুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যেখানে দৈন্য, যেখানে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারী। স্থানে স্থানে অসংখ্য সেবাসংস্থা গড়িয়া উঠিল। সুশৃঙ্খল সেবাপ্রতিষ্ঠান বলিতে আজ প্রথমে 'রামকৃষ্ণ-মিশন'কেই বুঝায়। ইহার মূলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর আস্তে আস্তে গৌরীমার হৃদয়েও এই সেবাধর্ম্মের প্রেরণা জাগাইতে লাগিলেন। সময়

সময় ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেন, মা এক একবার বাগবাজারে (বলরাম বসুর বাড়ীতে) যাস্, ক'লকাতার মায়েরা সব রয়েছে। মায়েদের কাছে ভগবানের কথা বল্‌লে তাদের মধ্যে সহজে ভক্তির উদ্দীপনা হয়। গৌরীমা বলরাম বসুর বাড়ীতে দুই-এক দিন থাকিয়া মহিলাদের মধ্যে ঠাকুরের কথা বলিতেন।

যদু মল্লিকের বাড়ী হইতে আসিয়া একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "যদু মল্লিকের বাড়ীর মায়েরা তোকে দেখতে চেয়েছে। একদিন যাস্ ওখানে।" গৌরীমা অনুযোগ করিয়া তাঁহাকে বলেন, "তোমার ঐ কাণ্ড। তুমি লোকের কাছে আমার এত প্রশংসা কর কেন?"* ঠাকুর একটু হাসিয়া বলেন, "তুই যাবিনি?"

আর একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "চল্, ওদের বাড়ী।" এই বলিয়া তিনি যদু মল্লিকের বাগানে চলিলেন। সঙ্গে গৌরীমাও

---

* গৌরীমা সম্বন্ধে ঠাকুর কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার লীলাসঙ্গিগণের কথা হইতে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম—মাষ্টার মহাশয় বলিয়াছেন, "গৌরীমার কথা এক কথায় বলতে গেলে—'ভক্তি'। হিন্দুব্রাহ্মণের মেয়ে একমাত্র ভগবানের জন্য সংসারটা ত্যাগ করে গেলেন, এটা কি কম কথা? ভগবানের বিষয় ক'টা লোক চিন্তা করে? তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা ত দূরের কথা। ঠাকুর বলতেন, 'ইনি ব্রজের মেয়ে, এঁর গোপীভাব।"

স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, 'গৌরী হচ্ছে কৃপাসিদ্ধা গোপী, ব্রজের গোপী * * *'। ঠাকুরের মেয়ে শিষ্যাদের মধ্যে গৌরীমাই সন্ন্যাসিনী এবং প্রধানা।"

গেলেন, যাইয়া দেখেন—কলিকাতা হইতে অনেক মহিলা সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। ঠিক সরল শিশুর মত ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর একটা গান গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। তখন গৌরীমা ভগবানের নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মণি মল্লিকের বাগানে ব্রাহ্ম মহিলাদিগের নিকট ঠাকুর কৌশল করিয়া গৌরীমাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে নিরাকারতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছিল। গৌরীমার সহিত তাঁহাদের সেদিন সাকারবাদ এবং অবতারবাদের অনেক আলোচনা হইল। ইহার পর হইতে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত এবং ঠাকুরকে ভক্তি করিতে লাগিলেন।

আর একদিন পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে ঊষার আলোকে দাঁড়াইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরীমাকে বলেন, "গ্যাখ্ গৌরি, আমি জল ঢাল্‌ছি, তুই কাদা চট্‌কা।"

নহবৎখানার সন্নিকটে বকুলমূলে পুষ্পচয়নরতা শিষ্যা বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এখানে কাদা কোথায় যে চট্‌কাব? সবই যে কাঁকর!" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি বল্‌লুম, আর তুই কি বুঝলি? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।"

বাম হস্তে বকুলের একটি শাখা ধরিয়া ঠাকুর তখনও দক্ষিণ

হস্তস্থিত পাত্র হইতে জল ঢালিতেছিলেন। নহবৎখানার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়া শ্রীশ্রীমা স্নেহপূর্ণ-নয়নে এই দৃশ্য দেখিয়া এবং গুরু-শিষ্যার কথোপকথন শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

গুরুকর্তৃক জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় উন্মীলিত দিব্য চক্ষে শিষ্যা দেখিতে পাইলেন,—অজ্ঞতা ও অবিবেক পুঞ্জীভূত হইয়া মূক নারীহৃদয়ের উপর পাষাণভারের মত চাপিয়া আছে। তিনি যেন আজ নূতনভাবে এইসকল দেখিতে পাইলেন। আজ নূতন করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিল। সত্যই ত, নারীর ব্যথা যদি নারী না অনুভব করে, নারীর ব্যথা যদি নারী দূর না করে, তবে করিবে কে?

কিন্তু যখন তিনি গভীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিলেন, তাঁহার পক্ষে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করা সহজ হইবে না। তাই তিনি একদিন নিজের অক্ষমতার কথা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিলেন, "সংসারী লোকের সাথে আমার পোষাবে না। হৈ হৈ আমার ধাতে সয় না। আমার সাথে কতকগুলো মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গ'ড়ে দিচ্ছি।"

ঠাকুর হাত নাড়িয়া বলিলেন, "না গো, না, এই টাউনে ব'সে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের হয়েছে, এবার এ তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগবে। ওদের বড় কষ্ট।"

আবার বৃন্দাবনে

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিবার পর গৌরীমার কৃচ্ছ্র-সাধন অনেকটা কমিয়াছিল ; তথাপি একটি বিশেষ সাধনার জন্য তাঁহার মন মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আবার সময় সময় ভাবিতেন,—ঠাকুরই ত সব, কি আর হবে দূরে যেয়ে। কিন্তু ঠাকুর নিজেই একদিন বলিলেন, "হ্যাঁ মা, তোর যে একটা সাধনা বাকি রয়েছে, এবার সেরে ফেললে হয় না ?" গৌরীমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বুঝিয়া পরক্ষণেই আবার বলিলেন, "কি-ই-বা হবে দূরে যেয়ে ? যার গুরুপদে আছে মন, তার হেদয়মাঝে বৃন্দাবন। যার হেথা আছে, তার সেথাও আছে।" এইরূপে বুঝাইয়াও পুনরায় বলিলেন, "নাঃ, শেষ করেই আয়। যত শীগ্‌গির হয় ফিরবি।"

দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে গৌরীমা ঠাকুরের নিকট বিদায় লইলেন। বৃন্দাবনের অদূরবর্ত্তী এক নির্জ্জন স্থানে তিনি কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া এবং একাসনে বসিয়া নয় মাস সাধনা করিতে হইবে।

এদিকে ঠাকুর মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কঠিন গলরোগ হইল। সুচিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রথমতঃ কলিকাতায় এবং পরে কাশীপুরে এক উদ্যান-বাটীতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঠাকুর এইসময়ে গৌরীমাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ঠাকুরের নিকট আসিবার জন্য গৌরীমার চিত্তও ব্যাকুল হইত, কিন্তু তাঁহার ব্রত সমাপ্ত হইবার তখন মাত্র অল্প কিছুকাল বাকি। ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী বলরাম বসু তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র লেখেন। দৈবক্রমে সেই পত্র যথাসময়ে তাঁহার হস্তগত হয় নাই।

লীলাসম্বরণের কয়েকদিন পূর্ব্বেও গৌরীমাকে দেখিবার জন্য আবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না। আমার ভেতরটা যেন বিল্লিতে আঁচড়াচ্ছে।" বলরাম বসু আবার বৃন্দাবনে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু গৌরীমার সন্ধান পাওয়া গেল না।

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পূর্ণিমারাত্রিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। পরদিবস তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব দেহ কীর্ত্তনসহযোগে সুরধুনীর তীরে কাশীপুর মহাশ্মশানে নীত হইল। দেব বৈশ্বানর কনকরথে তুলিয়া তাঁহার দিব্যদেহ নিত্যধামে লইয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর যখন মাতাঠাকুরাণী অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিতেছিলেন, সশরীরে আবির্ভূত হইয়া ঠাকুর বলেন, "কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ তো এঘর আর ওঘর।" এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী বুঝিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে, তিনি সধবার বেশ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং সুবর্ণবলয় হস্তেই রহিল, সূক্ষ্মপাড়যুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি সধবার চিহ্ন রক্ষা করিলেন।

পুনরায় একদিন শ্রীশ্রীমা লোকমত গ্রাহ্য করিয়া যখন শ্রীঅঙ্গ হইতে সুবর্ণবলয় মোচন করিতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া বলেন, "আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিজ্ঞেস করো, সে ওসব শাস্ত্র জানে।"

ওদিকে আরব্ধ সাধনা শেষ করিয়া গৌরীমা যখন বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন এদিকেও সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে যোগেনমাও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, কিন্তু গৌরীমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কালাবাবুর কুঞ্জের কর্ম্মচারিগণ গৌরীমার তৎকালীন সাধনস্থানের সন্ধান জানিতেন না, সেইজন্য ঠাকুরের নির্দ্দেশ ও পীড়ার গুরুত্বের সংবাদ তাঁহাকে জানাইতে পারেন নাই। বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট সকল সংবাদ অবগত হইয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনায় গৌরীমা পিতৃহারা কন্যার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। আবার অভিমানও হইল, ঠাকুর শেষকালে তাঁহাকে কেন এইভাবে ফাঁকি দিবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

আর দেহধারণ অপ্রয়োজন মনে করিয়া 'ভৃগুপাতে' দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুই মরবি না-কি?" ঠাকুরকে এইরূপে দর্শন করিয়া গৌরীমা স্তম্ভিত হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তে উঠিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দেহত্যাগ ঠাকুরের

অভিপ্রেত নহে, তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় নাই। বাধা পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর গৌরীমা বৃন্দাবনে ভাণ্ডারা উৎসব করিতে অভিলাষী হইলেন। অথচ তাঁহার নিকট টাকাপয়সা নাই। বৃন্দাবনের এক জনবহুল স্থানে যাইয়া তিনি দোকানদারদের নিকট নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তীর্থস্থানের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসিগণ এই প্রকার ব্যাপারে অভ্যস্ত। দোকানদারেরা তাহাদের সাধ্যানুসারে ঘি, আটা, মিঠাই প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি তদ্দ্বারা সাধু এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিলেন।

অতঃপর পুনরায় তিনি সাধনস্থানে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের কয়েকদিবস পর শ্রীশ্রীমা তীর্থপরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লক্ষ্মীদিদি, গোলাপমা, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী নিকুঞ্জবালা দেবী-প্রমুখ সঙ্গে ছিলেন। পথে বারাণসী ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া তাঁহারা বৃন্দাবনে গিয়া কালাবাবুর কুঞ্জে উঠিলেন।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণীর ধারণা ছিল যে, বৃন্দাবনে গেলে সহজেই গৌরীমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, অথবা তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। আসিয়া বুঝিলেন, অবস্থা অন্যরূপ। তিনি যোগানন্দ এবং অদ্ভুতানন্দজীকে গৌরীমার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করেন, কিন্তু গৌরীমার সহিত কোন মন্দিরে বা অন্য কোথাও সাক্ষাৎ হইল না।

একদিন যোগানন্দজী রাওলে রাধারাণীর আবির্ভাবক্ষেত্র দর্শন করিতে গিয়া তথায় এক নির্জ্জন স্থানে দূর হইতে একখানি গৈরিক শাড়ী শুকাইতেছে দেখিতে পাইলেন, ইহাতে তাঁহার কৌতূহল হয়। নিকটে গিয়া তিনি দেখেন,—যমুনাতটে একটা গুহার মধ্যে গৌরীমা যোগাসনে বসিয়া আছেন,—ধ্যানমগ্না। তখন কোনপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না; কিন্তু এই শুভসংবাদ অবিলম্বে মাতাঠাকুরাণীকে জানাইতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

পরদিবস শ্রীশ্রীমা এবং আরও কয়েকজন গৌরীমার সাধনার সেই অদ্ভুত স্থান দর্শন এবং তাঁহাকে আনয়নের জন্য চলিলেন। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ, ঠাকুরের লীলাসম্বরণের পর ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। শ্রীশ্রীমা ও গৌরীমা সদ্যশোকার্ত্তার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের বিচ্ছেদবেদনা পুনরুদ্দীপিত হওয়ায় সকলেই শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

লীলাসম্বরণের পর ঠাকুর দর্শন দিয়া তাঁহাকে যে সধবার বেশ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই বিবরণ জানাইয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন,—ঠাকুর একথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। শাস্ত্রে না-কি কি লেখা আছে? এখন তুমি বল। তোমায় সেই থেকে খুঁজছি।

গৌরীমা বলিলেন,—আমাদের অন্য শাস্ত্রের কি কাজ মা? ঠাকুরের কথা শাস্ত্রের ওপরে। ঠাকুর নিত্য বর্ত্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী; তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।

লীলাসম্বরণের অব্যবহিতপূর্ব্বে ঠাকুর যে গৌরীমাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও বিবৃত করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "ঠাকুর ব'লে গেছেন, তোমার জীবন 'জ্যান্ত জগদম্বাদের' সেবায় লাগবে।"

রাত্রিকালে সেই গুহার মধ্যে ধুনি জ্বালিয়া মাতাপুত্রী কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে দুইটা সাপ প্রবেশ করিল। শ্রীশ্রীমা এত নিকটে সাপ দেখিয়া ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও গৌরদাসি, কি হবে গো, দুটো সাপ যে!" গৌরীমা শান্তভাবে বলিলেন, "ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা! কিছু ভয় নেই মা, পেসাদ পেয়ে এক্ষুণি চলে যাবে।" এই বলিয়া গৌরীমা এক কোণে দামোদরের খানিকটা প্রসাদ ঢালিয়া দিলেন। সাপ দুইটা তাহা নিঃশেষ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীমা এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া তাহাদের ব্যাপার দেখিতেছিলেন, তাহারা চলিয়া গেলে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি সাপ নিয়ে কি ক'রে থাক এখানে?"

পরদিবস গৌরীমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি শ্রীশ্রীমায়ের তীর্থবাসকালে গৌরীমা তাঁহার সঙ্গেই রহিয়া গেলেন।

বৃন্দাবনবাসকালে শ্রীশ্রীমায়ের প্রায়ই ভাবসমাধি হইতে লাগিল। একদিন গৌরীমা 'ধীরসমীরে' গিয়া দেখেন—মা একাকিনী, বাহ্যজ্ঞানহীনা, চক্ষে পলক পড়িতেছে না, শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভূত হইতেছে না। গৌরীমা ভাবিলেন, গোবিন্দভাবিনী

শ্রীরাধা আজ কৃষ্ণবিরহে উন্মনা, কৃষ্ণের অদর্শনে ভাববিহ্বলা। তিনি রাধানাম গাহিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে যোগেনমা এবং যোগানন্দজীও আসিয়া ধীরসমীরে উপস্থিত হইলেন। সকলেই সম্মিলিতকণ্ঠে রাধানাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর মা বাহ্যচেতনা ফিরিয়া পাইলেন।

আর একদিন মাতাঠাকুরাণী নৌকাযোগে যমুনায় বেড়াইতে গিয়া যমুনার জলে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, কি যেন দেখিতেছেন। অতঃপর কাহাকে ধরিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন। মাতার দেহের অধিকাংশ নৌকার বাহিরে এবং তাঁহার নিজের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে জলে পড়িয়া যাইবেন, তাহা বুঝিয়াই ভীতত্রস্ত যোগানন্দজী চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; এবং যুগপৎ গৌরীমা ও গোলাপমা শ্রীশ্রীমাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

মাতাঠাকুরাণী ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনের সকল লীলাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গৌরীমার পরিচিত ; তিনি রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন সকলকে দর্শন করাইলেন। গৌরীমা, স্বামী যোগানন্দ এবং অন্যান্য সন্তানগণসহ মাতাঠাকুরাণী বৃন্দাবনধাম পরিক্রমাও করেন।

শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন সেই সময় তাঁহার অনুমতি লইয়া যোগেনমা এবং স্বামী যোগানন্দ গৌরীমার সহিত কড়োলীর মদনমোহন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

কড়োলীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রিতে

তাঁহারা পথিমধ্যে একস্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাত্রি অধিক হইলে একটা লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরীমা এবং যোগেনমার মধ্যভাগে তাঁহাদের জিনিষপত্র ছিল; লোকটার উদ্দেশ্য ছিল তাহা চুরি করা। সে নিকটেই আনাগোনা করিতে লাগিল। গৌরীমা তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। গৌরীমার গায়ে একটা আলখাল্লা ছিল, তিনি আস্তে আস্তে আলখাল্লার মধ্য হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন। ইতোমধ্যে লোকটা তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া তাঁহার মাথার নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া পুঁটলিতে হাত দিবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক এমন সময়ে শায়িত থাকিয়াই গৌরীমা দিয়াশলাই জ্বালিলেন। লোকটার ছিল লম্বা দাড়ি, দিয়াশলাই জ্বালিতেই সেই আগুন গিয়া ধরিল তাহার দাড়িতে। গৌরীমা মার্ মার্ বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চোরটা ততক্ষণে চীৎকার করিয়া দুই হাতে দাড়ি চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে দৌড়িয়া পলাইল। গোলমাল শুনিয়া সঙ্গিদ্বয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দাড়িতে আগুন লইয়া চোরকে পলাইতে দেখিয়া যোগেনমা এবং যোগানন্দ স্বামী হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট রাত্রিটা তাঁহারা জাগিয়া রহিলেন।

শ্রীশ্রীমা প্রায় এক বৎসর বৃন্দাবনে অবস্থান করেন, এবং হরিদ্বার, প্রয়াগ ইত্যাদি কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শনান্তর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে প্রয়াগতীর্থ পর্য্যন্ত আসিয়া গৌরীমা পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের ব্যথা তাঁহার মনকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল, তিনি দেশে ফিরিলেন না।

মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই পতির জন্মভূমি পুণ্যতীর্থ কামারপুকুরে গমন করেন। কয়েকমাস পরে কলিকাতায় ভক্তগণ মায়ের দর্শনলাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিল, এবং যখন তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার কথা আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় গৌরীমা অপ্রত্যাশিতভাবে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর দেহরক্ষা করিয়াছেন, আর তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে না, আর তাঁহার অমৃতবাণী শুনিতে পাওয়া যাইবে না,—ইহা ভাবিয়া গৌরীমা প্রাণে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। মনকে শান্ত করিবার আশায় তিনি কালীঘাটে মায়ের দর্শনে গেলেন। মন্দিরে মাকে দর্শন করিতে করিতে তিনি আকুলভাবে কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন,—মায়ের মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া দক্ষিণহস্ত মৃদু সঞ্চালনপূর্ব্বক শোকাকুলা কন্যাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন।

কলিকাতায় গৌরীমার উপস্থিতিতে ভক্তগণও আশান্বিত হইলেন যে, তিনি কামারপুকুর হইতে মাতাঠাকুরাণীকে অবশ্যই কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। ভক্তগণের নিকট মায়ের সকল সমাচার অবগত হইয়া মাতৃদর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। বলরাম-ভবনে এই বিষয়ে গৌরীমা, স্বামিজী, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় এবং কতিপয় ভক্তের মধ্যে আলোচনা হয়। অতঃপর গৌরীমা কামারপুকুর যাত্রা করেন।

মাতা ও কন্যার মধ্যে দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ নাই, গৌরীমাকে তথায় পাইয়া মাতাঠাকুরাণী অতীব আনন্দিত হইলেন। কামারপুকুরের বিজনতীর্থে ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া তাঁহারা উভয়েই বেদনামিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিতেন। গুরুমাতার সঙ্গে এইভাবে একান্তে বাস এবং তাঁহার সেবা করিয়া গৌরীমা পরম তৃপ্তি পাইলেন।

অতঃপর ভক্তবৃন্দের প্রার্থনানুযায়ী শ্রীশ্রীমা জননী শ্যামাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌরীমাসহ কলিকাতায় বলরাম-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে ভক্তগণের ব্যবস্থানুসারে তিনি বেলুড়ে এক ভাড়াটিয়া বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গৌরীমা ও গোলাপমা এবং মধ্যে মধ্যে যোগেনমাও তাঁহার সহিত থাকিতেন। সেখানেও ভক্তসমাগম হইত। মাষ্টার মহাশয় কোন কোন দিন তথায় গিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে শুনাইতেন।

কামারপুকুর, কলিকাতা ও বেলুড়ে কয়েকমাস শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাস করিয়া ঝুলনের পূর্ব্বে গৌরীমা পশ্চিম-ভারতে চলিয়া গেলেন। স্বামী যোগানন্দের লিখিত এক পত্রপাঠে জানা যায় কিছুদিন পরে গৌরীমা বৃন্দাবনে রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন।*

বেলুড়, ৬ই অক্টোবর, ১৮৮৮

শ্রীমতি গৌরমাতা ঠাকুরাণী শ্রীচরণকমলেষু

আপনার দুইখানি আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া পরম সুখি হইয়াছি। প্রথম পত্রের জবাব দিই নাই আপনি কোথায় আছেন ঠিক জানি নাই বলিয়া।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। গৌরীমা তখন মন্দিরমধ্যে নিবিষ্টমনে স্তবকীর্ত্তন কচ্ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতেন, যেন তেজস্বিতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি।"

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত (তাঁহার "মাতৃদ্বয়" পুস্তিকায়) লিখিয়াছেন,—

"স্ত্রীভক্তদের ভিতর এই মহাতপস্বিনী গৌরীমাতা অনেক তীর্থ, অনেক পাহাড় জঙ্গল ঘুরিয়া তেমনই কঠোর তপস্যাদি করিয়াছিলেন। শেষকালে কোন কোন সময় আমাকে তিনি সে সব ঘটনা বলিতেন। একদিন আমি গৌরীমার কাছে বসিয়া বলিতেছিলাম যে, কি করিয়া আমি পাহাড়, জঙ্গল, দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, গৌরীমা তা সব শুনিয়া তাঁর নিজের জীবনকাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনিও কি করিয়া দুর্গম পর্ব্বত, জঙ্গল ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, সেই সব শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'গৌরীমা! তুমি করেছিলে কি? এরূপ দুঃসাহসিক কাজ করেছিলে?' গৌরীমা হাসিয়া বলিলেন, 'তোদেরই ত মা।"

"তদবধি গৌরীমার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা জন্মিল। আমি যেরূপ জীবনে পর্য্যটক অবস্থায় একেবারে মরিয়ার মত পাহাড় পর্ব্বত ঘুরিয়াছিলাম, গৌরীমাকেও দেখিলাম বাঙালীর ঘরের মেয়ে হইয়াও তদ্রূপ সব করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। শক্তি শক্তিকেই শ্রদ্ধা করে। তেজী তেজীকেই শ্রদ্ধা করে।"

কলিকাতায়

হিমালয় হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌরীমা একদিন ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের সংবাদ লইয়া বরাহনগরে গেলেন। সন্তানগণ তখন বরাহনগরে এক ভাড়া-বাড়ীতে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনভজন করিতেন। সেইস্থানে না গিয়া গৌরীমা নিকটস্থ গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কোন প্রয়োজনবশতঃ গঙ্গাতীরে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে মঠে যাইতে অনুরোধ করিলেন। গৌরীমা শুনিয়াছিলেন, 'মঠে মেয়েমানুষের প্রবেশ নিষেধ;' তাঁহাদের বিধিনিষেধের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মঠের মধ্যে যাইতে তিনি অসম্মত হইলেন।

ঠাকুরের এবং রামেশ্বর-মহাদেবের স্নানের উদ্দেশ্যে দুইটি পাত্র ভরিয়া তিনি গঙ্গোত্রীর পবিত্র জল আনিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাতে একটি পাত্র দিয়া তদ্দারা ঠাকুরের স্নানপূজা করিতে বলিয়া দিলেন। ঠাকুরের ভোগের উদ্দেশ্যে আনীত অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ গৌরীমা গঙ্গাতীরেই বসিয়া রহিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মঠে ফিরিয়া গৌরীমার আগমনবার্ত্তা গুরু-ভ্রাতাদিগকে জানাইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ অনেকে সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ গৌরীমাকে বলিলেন, "একি ব্যাপার? ওঠ, মঠে চল শীগ্‌গির। তুমি কি মেয়েমানুষ? তুমি যে আমাদের মা।" এই বলিয়া উত্তরের কোন অপেক্ষা

না রাখিয়া, স্বামিজী তাঁহাকে হাত ধরিয়া মঠে লইয়া চলিলেন। অন্যান্য সকলে তাঁহার আনীত দ্রব্যসম্ভার বহিয়া চলিলেন।

মঠে প্রবেশ করিয়াই গৌরীমা দেখিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটা লোহার কড়া মাজিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন।—এই সেই রাখাল, ঠাকুর যাঁহাকে কত কোলে-কাঁধে করিয়া রাখিতেন, যাঁহার সঙ্গে কত খেলা করিতেন। তাঁহাকে সরাইয়া গৌরীমা নিজেই বাসন মাজিতে বসিয়া গেলেন। অতঃপর স্নানাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করিলেন। বহুকাল পরে আবার ঠাকুরের প্রিয় সন্তানদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া তিনি সেইদিন বড়ই তৃপ্তি পাইলেন। সন্তানগণও বহুকাল পর আবার তাঁহার হাতের অমৃতোপম 'জগা-খিচুড়ি' ভোজন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

গৌরীমার সহিত অল্পদিনের জন্যও যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহার জগা-খিচুড়ি ও চাট্‌নীর কথা ভুলিতে পারিবেন না। এই জগা-খিচুড়ির রন্ধনপ্রণালী বড়ই অদ্ভুত।* চালডাল হাঁড়িতে চাপাইয়া রান্নাঘর ছাড়িয়া তিনি কখনও-বা কার্য্যান্তরে

* জগা-খিচুড়ি সম্বন্ধে গৌরীমা এক গল্প বলিতেন,—

জগা নামে এক পাগল ছিল। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের একপাশে সে থাকিত। সারাদিন পাগলামি করিয়া বেড়াইত, রাত্রিতে সাধনভজন করিত। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইত, দিনান্তে তাহা একত্র সিদ্ধ করিত। চাল, ডাল, তরকারী, ঘি, তেল, লবণ, লঙ্কা সবই একসঙ্গে সিদ্ধ হইত। রান্না করিয়া মন্দিরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া





চলিয়া যাইতেন। কতক্ষণ পরে আসিয়া আলুর কুচি, মূলার ডাঁটা, কপির ফুল, নারিকেল, কিশমিশ, মিছরি প্রভৃতি হাতের কাছে যাহা-কিছু পাইতেন সকলই হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহার রন্ধনপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিলে মনে হইত না যে, খিচুড়ির স্বাদ উৎকৃষ্ট হইবে। কিন্তু ঠাকুরের নিকট ভোগ নিবেদিত হইয়া গেলে, তাহার এমনই এক অপূর্ব্ব আস্বাদ হইত যে আকণ্ঠ ভোজন করিলেও রসনার আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। রন্ধনপাত্রটি দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও অফুরন্ত ভাণ্ডার বলিয়া মনে হইত। অনেককে প্রসাদ বিতরণ করিলেও তাহা যেন নিঃশেষ হইতে চাহিত না।

ঠাকুরের স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গোত্রীর জল লইয়া যখন গৌরীমা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গৌরীমার প্রাণ ব্যাকুল হয়। তিনি জয়রামবাটীতে মায়ের চরণপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইলেন।

জয়রামবাটীর জমিদার শম্ভুনাথ রায়ের বাটীতে পদ্মফুল

মায়ের উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিত। তারপর রাস্তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া সকলে পরম আনন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিত।

একদিন সকালবেলা জগা সৈনিকের বেশ ধারণ করিয়া পাড়ার ছেলেদের জড় করিল। তারপর গলায় একটা টিন বাঁধিয়া বাজাইতে লাগিল, আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "যম জিন্‌তে যায় রে জগা, যম জিন্‌তে যায়।" সেই দিনই মায়ের সমক্ষে জগা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিল। বৃদ্ধেরা বলিতেন, জগা-পাগলা ছদ্মবেশে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহার সহিত গৌরীমার প্রথম পরিচয় হয়। শম্ভুনাথ ছিলেন অতিসদাশয় ব্যক্তি। গৌরীমা একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তোমার মত ভাগ্যবান কে? তোমার খাস-তালুকে মা ব্রহ্মময়ী প্রজা হ'য়ে ব'সে আছেন!" তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা শ্রবণ করিয়া শম্ভুনাথ মুগ্ধ হইলেন। গৌরীমা তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া আসিলেন। তদবধি শম্ভুনাথ মায়ের ভক্ত। গৌরীমার আমন্ত্রণে একদিন তিনি মায়ের বাটীতে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুদিন পর বলরাম বসুর বাড়ীতে বাসকালে গৌরীমা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার জননী, সহোদর এবং কনিষ্ঠা সহোদরা তাঁহাকে দেখিতে আসেন। রোগের গুরুত্ব বুঝিয়া কনিষ্ঠা ব্রজবালা ভগিনীর সেবার উদ্দেশ্যে এক পুত্রসহ সেখানে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ এবং বলরাম বসুর সহধর্ম্মিণীও একান্তভাবে গৌরীমার সেবা করিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বভাব চিরকাল বালকের মত সরল ছিল। তিনি গৌরীমার ঘরের দরজার কাছে যাইয়া এক-একবার তাঁহাকে দেখিতেন, আবার বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেন। গৌরীমা তাঁহাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেহ দেখা করিতে আসিলে তিনি কাতরস্বরে বলিতেন, "আমাদের একটা গৌরমা ছিল, তাও বুঝি বাঁচে না রে!"

চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার গুণে গৌরীমা বাঁচিয়া উঠিলেন। একটু সুস্থ হইলেই গিরিবালা দেবী কন্যাকে ভবানীপুরে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত গৌরীমা সেখানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিতে তিনি বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেন।

কলিকাতায় আর একবার তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। সহোদর অবিনাশচন্দ্র তাঁহার সেবাশুশ্রূষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। অন্যে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবে, ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইত। সেবাকে তিনি পরম পুণ্য মনে করিতেন, কিন্তু সেবাগ্রহণ করাকে অপরাধ মনে করিতেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থাতেই তিনি ভাবিতেন, ঠাকুর, কবে এদের হাত থেকে নিস্তার পাবো?

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া গৌরীমা সহোদরের অল্পবয়স্ক এক পুত্রের সহিত ভাব করিয়া পলায়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বালক প্রথমে এই কার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষমতা জানাইয়া বলিল, "আরে বাপ্‌রে, বাপন্‌ জানতে পারলে, মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবে।" গৌরীমা তাহাকে দামোদরের ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ জানাইলেন, বালক তাহাতেও সম্মত হইল না। অবশেষে পাঁচ টাকা পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন, ইহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইল। সহোদরের অনুপস্থিতিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্যে বাড়ীর অদূরে একখানা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই, বাড়ীর অন্য সকলের অজ্ঞাতে, গৌরীমা কলিকাতা ত্যাগ

করিলেন। কিন্তু বালককে তখনই টাকা দিতে পারিলেন না, টাকা বাকি রহিল।

পাঁচ টাকা পুরস্কার তখনই না পাইয়া বালক অসন্তুষ্ট হইল এবং পিতা আসিলে সকল কথা বলিয়া দিল। কিন্তু এই পুরস্কারের কথা সরল বালক অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। গৌরীমা যখন মহারাষ্ট্র দেশে ছিলেন, তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিয়া এক চিঠি লিখিয়া জানাইল, "যোগিনী মা, তুমি পাঁচ টাকা দিবে বলিয়াই আমি তোমাকে গাড়ী আনিয়া দিয়াছিলাম। বাপনেরও গালমন্দ খাইলাম, অথচ টাকাও পাইলাম না। সেই টাকা পাঁচটা আমাকে না দিলে আর কখনও তোমার কথা আমি শুনিব না।"

পরে অবশ্য গৌরীমা বালকের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণাপথে

কলিকাতায় কিছুকাল অবস্থান করিবার পর গঙ্গোত্রীর পুণ্যবারি লইয়া গৌরীমা রামেশ্বরধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহের সহিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত থাকায়, এইবারের তীর্থপর্য্যটন গৌরীমার হৃদয়ে বৃন্দাবন পরিক্রমার অনুরূপ আনন্দ এবং উৎসাহের সঞ্চার করিল।

প্রথমে তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া, তথা হইতে ওয়ালটায়ারের নিকটবর্ত্তী সীমাচলম্ নামক পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত নৃসিংহদেবের মন্দির এবং প্রহ্লাদপুরী দর্শন করিলেন। দৈত্যশিশু প্রহ্লাদের অবিচলিত বিষ্ণুভক্তি এবং তাঁহার প্রতি নৃসিংহদেবের অপার করুণার কথা বর্ণনা করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন।

দাক্ষিণাত্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বিস্তীর্ণ সমতল ধান্যক্ষেত্র, আবার মধ্যে মধ্যে ধূম্রবর্ণ পর্ব্বতসমূহ, অনতিদূরে কোথাও সমুদ্র, এইসকল দর্শনে ভ্রমণকারীমাত্রেরই হৃদয় মুগ্ধ হয়। মন্দিরের সংখ্যা অগণিত, তন্মধ্যে কতকগুলি সমতলভূমিতে, কতকগুলি পর্ব্বতের পাদদেশে, আবার কোনটি শিখরদেশে অবস্থিত। এইরূপ এক পর্ব্বতশিখরস্থিত মন্দিরে গৌরীমা 'পানা-নরসিংহজী'র দর্শন লাভ করেন। বিগ্রহের এইরূপ নাম-করণের হেতু ইহাই যে, ইনি সর্ব্বদা পানানন্দে বিভোর থাকেন।

গোদাবরী জিলার প্রধান নগর রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। ভক্তকুলচূড়ামণি রায় রামানন্দের বাসস্থান ছিল ইহারই সন্নিকটে বিদ্যানগরে। তাঁহার মুখে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, রায় তাঁহাকে তথায় দশ দিন অবস্থান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে, মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,

"দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব,
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব।"

গৌরীমা বলিতেন, যখনই তিনি ভগবানের বিশেষ কোন লীলাস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন, তখনই সেই লীলা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইত এবং এক অপূর্ব্ব ভাবে তাঁহার হৃদয় স্বতঃ-পরিপূরিত হইত। রাজমহেন্দ্রীতে গমন করিয়া গৌরীমা যেন দেখিতে পাইলেন, গোদাবরীর তীরে রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব আলোচনায় মগ্ন। তিনি স্থির করিলেন, এইস্থানে কিছুকাল থাকিবেন। তিনি বলিতেন, বিদ্যানগরের প্রতি মহা-প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহ। ব্রাহ্মণচণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে সকলেই ভক্ত, এরূপ আমি আর কোথাও দেখি নাই।

তথাকার অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই ভগবানের গুণগানে মগ্ন; সুতরাং ভগবৎপ্রেমে উন্মাদিনী এই সন্ন্যাসিনী যখন গৌরাঙ্গ-গুণ গাহিতে গাহিতে বিদ্যানগরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া তাঁহারাও নামকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইলেন।

মাদুরা অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত নগরী। ইহার অপর নাম

দক্ষিণ-মথুরাপুরী। এই তীর্থের দেবী মীনাক্ষীকে দর্শন করিয়া গৌরীমা কালীঘাটের কালীদর্শনের আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে। মাদুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌরীমা শুনিতে পাইলেন, কে যেন অতি মধুর স্বরে তাঁহাকে বারংবার আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "আমি এখানে আছি, তুই আমায় দেখে যা।" তিনি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, কে তাঁহাকে এইরূপ আহ্বান করিয়া তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন। কাহাকে দেখিতে হইবে এবং কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই তিনি জানেন না। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং বার মাইল পথ কি-এক অজানা আকর্ষণে অতিক্রম করিয়া তিনি আলগর-কয়েল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে সৌম্যদর্শন বিরাটকায় আলগরজীকে দর্শন করিয়া তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং বুঝিলেন, ইনিই তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে লুচিমালপোয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আলগরজীকে ভোগ দিলেন।

রঙ্গনাথজীর মন্দির দক্ষিণ-ভারতের মহাতীর্থগুলির অন্যতম। সপ্তপ্রাকারে বেষ্টিত এই মন্দির বিরাটত্বে অদ্বিতীয়। মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন। তখন প্রতিদিন কাবেরীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথজীর দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ-কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন; ইহাই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। গৌরীমা তথায় অবস্থানকালে মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে যখনই তিনি সেই চৌদ্দহাত ঠাকুরের কথা বলিতেন,

তখনই তাঁহার শান্ত সৌম্যভাবের কথা উল্লেখ করিয়া—প্রলয়ান্তে ভগবান কিরূপে অবস্থান করেন তাহা বুঝাইয়া দিতেন।

পক্ষিতীর্থ দক্ষিণ-ভারতের এক অত্যাশ্চর্য্য স্থান। অনুচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে এক ক্ষুদ্র মন্দির, মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই, কিন্তু পূজা সমাপনান্তে ভোগ নিবেদন করিবার অব্যবহিত পরেই কোন অদৃশ্য স্থান হইতে দিব্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দুইটি শ্বেত-পক্ষী আসিয়া সেই ভোগ গ্রহণ করে। ভক্তগণের বিশ্বাস, পক্ষিদ্বয় স্বয়ং হর-গৌরী; প্রতিদিন কৈলাস হইতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজা ও ভোগ গ্রহণ করেন। গৌরীমার নিবেদিত ভোজ্যসামগ্রী পক্ষিদ্বয় আসিয়া গ্রহণ করাতে তিনি আনন্দিত হইলেন এবং হর-গৌরীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

উত্তর-ভারতে যেরূপ বারাণসীধাম, দক্ষিণ-ভারতে তদ্রূপ তীর্থ শিবকাঞ্চী। ইহা অতিপ্রাচীন স্থান। মন্দিরমধ্যে মহাদেবের বালুকাময় লিঙ্গমূর্ত্তি। শিবকাঞ্চী হইতে গৌরীমা বিষ্ণুকাঞ্চী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিষ্ণুকাঞ্চীতে নারায়ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধারিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুমূর্ত্তির ব্যাখ্যাকালে তিনি প্রায়ই বলিতেন, ষড়্ভুজ, অষ্টভুজ প্রভৃতি মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের প্রতীক। ঐসকল বিষ্ণুমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহার মন পরিতৃপ্তি লাভ করিত না। দ্বিভুজ মুরলীধারী মূর্ত্তিই প্রেমের প্রতীক, এই মূর্ত্তি ভক্তের মনে যে রসাবেশ—যে আনন্দের সঞ্চার করে তাহা অপর কোন মূর্ত্তিদর্শনে লাভ হয় না।

পথে বহু তীর্থ পরিক্রম করিয়া গৌরীমা রামেশ্বরধামে উপস্থিত হইলেন। যে-দেবতার তৃপ্ত্যর্থে তিনি অতিশয় ক্লেশস্বীকারপূর্ব্বক গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাবারি বহন করিয়া আনিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব আজ তাঁহার নয়নসমক্ষে বিরাজমান। সেই পবিত্র বারিদ্বারা আজ দেবতাকে স্নান করাইতে পারিলে তবেই তাঁহার সকল ক্লেশ সার্থক হইবে। কিন্তু মন্দিরে যাত্রীদিগের প্রবেশাধিকারের যে ব্যবস্থা দেখিলেন, তাহাতে তিনি নিরাশ হইলেন। যে-প্রকোষ্ঠে রামেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহার মধ্যে পূজারী ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দর্শনার্থিগণ দেবালয়ের সম্মুখভাগে অবস্থিত নাটমন্দির হইতেই রামেশ্বরজীকে দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক করেন।

গৌরীমা কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই সহস্রস্তম্ভশোভিত নাটমন্দিরে দামোদরকে স্থাপন করিয়া প্রথমে তাঁহার পূজা শেষ করিলেন; পরে তন্ময় হইয়া শিবস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। মনে আশা, আশুতোষ শিব অবশ্যই কন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ পূজার্চ্চনা, মধুরকণ্ঠে শিবগুণগান এবং সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী সহজেই পূজারী ও নাটমন্দিরস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সন্ন্যাসিনী মাতার ভক্তিনিষ্ঠাদর্শনে প্রীত পূজারীগণ তাঁহাকে বিশেষ অনুমতি দিলেন যে, তিনি স্বহস্তে দেবতার স্নানপূজা করিতে পারেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি পরমানন্দে ভক্তিসহকারে স্বহস্তে গঙ্গোত্রীর পুণ্যবারিদ্বারা রামেশ্বরজীকে স্নান করাইলেন।

বস্তুতঃ তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ এতই বিশুদ্ধ ছিল যে, যিনি একবার উহা শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই বিস্মিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, একবার শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত কয়েকজন ভক্তের সম্মুখে তিনি ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় তত্রত্য সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর জনৈক প্রবীণ মৈথিল পণ্ডিত সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি গৌরীমার সংস্কৃত উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তথায় উপবিষ্ট এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছিলেন, কোন স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, অনেক পণ্ডিতের মুখেও ঈদৃশ বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ সাধারণতঃ শুনা যায় না।

ভারতের শেষ প্রান্তে, মহাসাগরের তীরে, নগরের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থিত কন্যাকুমারীর মন্দির বিশেষরূপে খ্যাত। দেবীর মাহাত্ম্য এবং স্থানের নির্জ্জনতায় আকৃষ্ট হইয়া গৌরীমা তথায় কিছুকাল রহিলেন। মন্দিরে তিনি নিত্য চণ্ডীপাঠ করিতেন এবং মায়ের নামে বিভোর থাকিতেন।

বালাজী গোবিন্দের মন্দির পাহাড়ের উপরে দুর্গম স্থানে অবস্থিত। ছয়টি পাহাড় অতিক্রম করিয়া সপ্তম পাহাড়ের শিখরে উঠিতে পারিলে তবেই দেবতার দর্শন পাওয়া যায়। পুণ্যশ্লোকা রাণী অহল্যাবাঈ বহু অর্থব্যয়ে পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শিখর-স্থিত মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত প্রশস্ত সোপানাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া যাত্রীদিগের পরিশ্রম লঘু করিয়া দিয়াছেন। তথাপি এই মন্দির যে দুরারোহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানেও পূজারীর সৌজন্যে

গৌরীমা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া বালাজী গোবিন্দকে ভোগ দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে তিনি আরও যে-সকল দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ত্রিবান্দ্রমের পদ্মনাভ এবং ভরকালার জনার্দ্দন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিবান্দ্রম ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী। অনন্তশয্যার উপর পদ্মনাভের বিশাল বিগ্রহ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিরাজিত। তাঁহার চরণমূলে লক্ষ্মীদেবীর সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি অবস্থিত এবং নাভিকমল হইতে উদগত মৃণালের উপর পদ্মাসনে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উপবিষ্ট।

জনার্দ্দন দর্শন করিতে যাইয়া গৌরীমা কয়েকদিন ভরকালায় বাস করিয়াছিলেন। জনার্দ্দনের মন্দির সমুদ্রকূলে পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। সেখানে সমুদ্রের বিরাট তরঙ্গভঙ্গ নাই, পবনদেবও যেন স্থানটির নির্জ্জনতা রক্ষার্থ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জনার্দ্দনের বিগ্রহ কন্যাকুমারীরই মত নাতিদীর্ঘ। গৌরীমা বলিতেন, এই দুই মূর্ত্তিকে যেন পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার দক্ষিণাপথ পর্য্যটনকালে স্বামী বিবেকানন্দও দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে তাঁহাদের কদাচিৎ সাক্ষাৎও হইয়াছে। কোথাও যাইয়া গৌরীমা শুনিতে পাইতেন, "এই দুই-চারি দিন পূর্ব্বে রাজপুত্রের মত এক বাঙ্গালী সাধু এখানে আসিয়াছিলেন,—ভারী পণ্ডিত, খুব বাগ্মী।" আবার কোথাও স্বামিজী যাইয়া শুনিতে পাইতেন, "এক বাঙ্গালী

সাধুমায়ী আসিয়াছিলেন,—খুব ভক্তিমতী, ভারী তেজস্বিনী।” উভয়েই বুঝিতে পারিতেন, অপর ব্যক্তিটি কে। উভয়েই স্থানে স্থানে ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ এবং অনুপম জীবনচরিত প্রচার করিতে করিতে যাইতেন। নরনারী এই অপূর্ব্ব কথামৃত শুনিয়া মুগ্ধ হইত।

দক্ষিণাপথে একস্থানে যাইয়া গৌরীমা শুনিতে পাইলেন যে, তথাকার মন্দিরের মোহন্ত জনৈকা দুঃস্থা গোপবালাকে নিজগৃহে অসদভিপ্রায়ে আবদ্ধ করিয়াছে। গৌরীমা স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ দুষ্কার্য্যের প্রতিকার চাহিলেন। তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনী বারংবার প্রতিকার দাবী করায় কর্ম্মচারিগণ অগত্যা ঐ ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া সেই বিপন্ন বালিকাকে উদ্ধার ও দুর্ব্বৃত্ত মোহন্তকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন।

দক্ষিণাপথ পর্য্যটনকালে এই কাহিনী কোন সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের কর্ণগোচর হয়। ‘বাঙ্গালী মাতাজী’র নাম তখন সঠিক জানিতে না পারিলেও, বর্ণনা হইতেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, কে ঐ মাতাজী। পরে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, “খবর শুনে আমি তখনই বুঝেছিলুম, ইনি আমাদের সর্ব্বজয়া ঠাকুরাণী ছাড়া আর কেউ নন!”

এই সময়েই আরও এক গৃহস্থবধূর দুর্দ্দশা দেখিয়া গৌরীমা বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। বধূটিকে তাঁহার স্বামী উৎপীড়ন করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। গৌরীমা তাঁহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ সাধ্বী পত্নীর ধর্ম্মরক্ষা ও

ভরণপোষণের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাহা ফলপ্রদ না হওয়াতে, পরে আইন-আদালতের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্তোষজনক আপোষনিষ্পত্তি করিয়া দিয়া আসিলেন।

এই যাত্রায় মধ্যভারতেও কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়া গৌরীমা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।



স্থানটি তরুলতাসমাচ্ছন্ন, সম্মুখে পূতসলিলা ভাগীরথী,—তপোবনের ন্যায় মনোরম। ভূমির মধ্যভাগে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ মিলিত হইয়া পঞ্চবটী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। পঞ্চবটীর তলে এক পঞ্চানন শিব পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্থানটি দেখিয়া গৌরীমা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল, ইহা পূর্ব্বে কোন সিদ্ধপুরুষের সাধনভূমি ছিল। তিনি বলিতেন, ওখানে জপধ্যান করিয়া অল্পকালের মধ্যেই পরম আনন্দ উপলব্ধি করা যায়।

ঐ স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয় এবং এইসম্পর্কে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ সফল হইতে চলিল বুঝিয়া গৌরীমাকে প্রভূত আশীর্ব্বাদ এবং উৎসাহ দান করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "আরম্ভ কর মা, আশ্রমের অশেষ কল্যাণ হবে।"

ক্রমে মুচিরাম, মহানন্দ, শুকদেব, প্রহ্লাদ, পূর্ণচন্দ্র, নিমাই প্রভৃতি অনেক স্থানীয় লোক গৌরীমার ভক্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সেখানেই স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং আশ্রম-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে নানাভাবে সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার দুইজন মহাপ্রাণা মহিলার অর্থসাহায্যে প্রায় আড়াই বিঘা জমি ক্রয় করা হয়।

উক্ত স্থানে ১৩০১ সালে এক শুভদিনে গুরুপত্নীর পবিত্র নামে গৌরীমা "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্ববর্ত্তী

গ্রামসমূহ এবং কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। পূজার্চ্চনা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কুমারীভোজন, ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা,—সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করিল। নিমন্ত্রিত এবং অনাহূত ব্রাহ্মণকন্যারা দলে দলে আসিয়া পূজা এবং রন্ধনাদি কার্য্যে সহায়তা করিলেন। উপস্থিত সকলেই প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এইরূপে দিবসব্যাপী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া মাতৃজাতি-সেবার উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় আদর্শে এক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইল।

নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমের আরম্ভ। একখানি মাত্র কুটীর,—গোলপাতার চালা, ছ্যাঁচা বেতার প্রাচীর, সানের মেঝে। ক্রমশঃ ভক্তসন্তানগণের চেষ্টায় উহার শ্রী বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গ্রামের অতিসাধারণ লোকও নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী গৌরীমার নবপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেন। কলিকাতার কয়েকজন সন্তানও আশ্রমের সেবায় অগ্রসর হইলেন।

একে একে প্রায় পঁচিশ জন কুমারী, সধবা এবং বিধবা আসিয়া আশ্রমবাসিনী হইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া জপধ্যান করিতেন, তাহার পর পাঠাভ্যাস এবং গৃহকর্ম্মে রত হইতেন। ঘরের বারান্দায় এবং গাছতলায় পাঠাভ্যাস চলিত। দ্বিপ্রহরে পল্লীর বালিকারা আসিতেন। আশ্রমে বাস, আহার এবং শিক্ষার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা হইত না। গৌরীমা নিজেই সকলকে সস্নেহে শিক্ষা দিতেন, পরিণত-বয়স্কদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, ছোট ছোট বালিকাদিগের সহিত খেলা করিতেন।

"কিছুকাল পর গৌরীমার আমন্ত্রণে মাতাঠাকুরাণী একদিন ব্যারাকপুর-আশ্রমে শুভপদার্পণ করেন। দীন কুটীর হইলেও মঙ্গলঘট, পত্রপুষ্প, আলিপনা, ভোগারতি ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। গৌরীমা পরম ভক্তিসহকারে মাতৃ-পূজা করিলেন, স্বরচিত একখানি কীর্ত্তন শুনাইলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী আশ্রমের আবেষ্টন দর্শনে মাতা সারদেশ্বরী প্রসন্না হইলেন।"

আশ্রম ব্যারাকপুরে অবস্থিত হইলেও আশ্রমসম্পর্কে কোন-প্রকার সমস্যা উদিত হইলে অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইলে, গৌরীমা মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমকন্যাদের লইয়াও আসিতেন।

একদিন নৌকাযোগে কয়েকজন আশ্রমবাসিনীকে লইয়া গৌরীমা মায়ের দর্শনে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মায়ের মতামত জানিতে চাহিলেন। দুইজন সধবাকে লক্ষ্য করিয়া মা বলেন,—এরাও বেশ সতী সাধ্বী। বিমলানাম্নী জনৈকা বালবিধবার সম্বন্ধে বলেন,—এর যে যোগিনীর লক্ষণ রয়েছে গো! এ সন্নিসী হবে।

মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অভিমতে গৌরীমা এই কন্যাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

গৌরীমার এক পাঞ্জাবী-শিষ্যের দুই কন্যা আশ্রমে থাকিতেন। একদিন মায়ের দর্শনে আসিলে তিনি কন্যাদ্বয়কে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—ও গৌরমণি, এদের কোত্থেকে পেলে তুমি? এ-যে জয়া-বিজয়া! ক'জন্ম এদের সংসার হয়নি, এমনি ক্ষেত্র।

মায়ের উক্তি এই পাঞ্জাবী কন্যাদ্বয়ের জীবনেও সার্থক হইয়াছিল। তাঁহারাও সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

প্রথম কয়েকবৎসর নিতান্ত অর্থাভাবের মধ্যে আশ্রমের কার্য্য চলিয়াছে এবং আশ্রমবাসিনীদিগকে অসচ্ছলতার মধ্যে থাকিতে হইয়াছে। অনেকদিন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে চাল ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিলে তবে রন্ধন আরম্ভ হইত। আশ্রমের জমিতে বেল ও তেঁতুল প্রচুর পরিমাণে ফলিত, ফড়িয়াদের নিকট হইতে ঐ সমুদয়ের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় তরিতরকারী লওয়া হইত। কিন্তু অভাব-অনটনের মধ্যেও আশ্রমজীবনে এক অনাবিল শান্তি এবং আনন্দ বিরাজ করিত। এই কারণেই অসচ্ছলতার কষ্টকে কেহ কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না।

এই সময়ের জনৈকা আশ্রমবাসিনী পরবর্ত্তিকালে স্বামীর সংসারে সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াও বলিয়াছেন, "দেখ ভাই, সেই-যে বারাকপুর-আশ্রমের জীবনযাত্রা, তার তুলনায় আজকের জীবনের ভোগপ্রাচুর্য্য কত অকিঞ্চিৎকর। আমরা বারাকপুর-আশ্রমে কতদিন একবেলা পাতলা ডাল আর তেঁতুলের অম্বল দিয়ে ভাত খেয়ে, আর একবেলা শুধু মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি। কত স্থানাভাব ছিল তখন আমাদের, তাতেও সে-যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, মায়ের কত স্নেহযত্ন, আজও তা' ভুলতে পারি নি।"

বহু সহৃদয় নরনারীর আন্তরিক সাহায্য আশ্রমের অভাবের গুরুভারকে অনেকসময় লঘু করিয়া দিয়াছে। একদিন একটা জীর্ণ

চালার নীচে গৌরীমা রন্ধন করিতেছিলেন, এমন সময় বেলুড় মঠ হইতে স্বামী প্রেমানন্দ আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে দুইটি বিধবা মহিলা। বিশিষ্ট পরিবারের কুলবধূ হইলেও সংসারের অত্যাচারে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহারা স্বামিজীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে গৌরীমার আশ্রয়ে রাখিয়া গেলেন।

রান্নাঘরের দুরবস্থা দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ বলেন, "গৌরমা, অমন ভাঙ্গা চালার তলায় ব'সে যে রাঁধ, কোন্‌দিন চাপা প'ড়ে ম'রে যাবে।" উহার সংস্কারের জন্য তিনি শীঘ্রই পঁচিশ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এমনই অভাবের দিনে জনৈক সৌম্যকান্তি সদাশয় ব্যক্তি একদিন আশ্রমে আসিয়া ডাকিলেন, "মা কোথায়?" গৌরীমা বাহিরে আসিলে ভদ্রলোক তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে একটি টাকার তোড়া মাটীতে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইনি রায় মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী কেশবমোহিনী দেবী গৌরীমাকে খুবই ভক্তি করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আশ্রমজীবন যাপন করিতেন। তখন আশ্রমের চারিদিকে প্রাচীর তুলিবার সঙ্গতি ছিল না, তাহাতে আশ্রমবাসিনীদিগের অসুবিধা হইত বুঝিতে পারিয়া কেশবমোহিনী দেবী নিজব্যয়ে প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সময়ে চব্বিশপরগণার এক ধনী পরিবারের গৃহিণী আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণকল্পে কয়েকশত টাকা দান করেন। মুঙ্গেরের 'সিভিল সার্জ্জন' রায় উপেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী

সরোজিনী দেবী এবং গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীও নানাভাবে আশ্রমকে সাহায্য করিতেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথমারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সহানুভূতি, সেবা এবং অর্থসামর্থ্যের দ্বারা নারীগণই ইহাকে সমধিক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন এবং প্রধানতঃ তাঁহাদের সহানুভূতি ও আন্তরিক চেষ্টাতেই মায়েদের এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য পুরুষ সন্তানগণের সাহায্যও নগণ্য নহে।

যাঁহারা বারাকপুরে আশ্রমের পরিচালনাকার্য্যে গৌরীমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তত্রত্য মুচিরাম দাস, গগন জেলে, পূর্ণবাবু দারোগা, চন্দ্রনাথ নিয়োগী, মোহিত মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী এবং কলিকাতার সিদ্ধেশ্বরী দেবী, নলিনচন্দ্র মিত্র, বিপিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর নামে আশ্রমের নামকরণ হইলেও ভক্তগণ এবং চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসিগণ আশ্রমকে কেহ 'দামোদর জীউর মন্দির' এবং কেহ-বা 'যোগিনী-মার কুটীর' বলিয়াই অভিহিত করিতেন। বহু ধর্ম্মপিপাসু নরনারী আসিয়া মাতাজীর নিকট সাধনভজন বিষয়ে উপদেশ পাইতেন। আশ্রমে দোল, দুর্গোৎসব, ঠাকুরের জন্মতিথি ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হইত এবং তদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে কীর্ত্তনের দল আসিত। অপ্রত্যাশিত-ভাবে এইসকল উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাইত। অর্থ এবং সেবাদ্বারা গৌরীমার তুষ্টিবিধান করিয়া ভক্তসন্তানগণ নিজেদেরই

কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। দামোদরজী এবং যোগিনী-মার আশীর্ব্বাদে সকলের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ মধ্যে মধ্যে গৌরীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। ভারতের প্রাচীন আদর্শে বালিকাদিগকে এইপ্রকার শিক্ষাদান তাঁহারা প্রশংসনীয় মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ-প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণও বারাকপুর-আশ্রমে গমন করিয়াছেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে গৌরীমার একবার 'টাইফয়েড' জ্বর হয়। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে মুঙ্গের হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন দার্জ্জিলিং যাইবার পথে বারাকপুরে আসেন এবং মায়ের অসুস্থতা দেখিয়া তাঁহার সেবার জন্য তিনি যাওয়া স্থগিত রাখেন। গৌরীমা একটু সুস্থ হইলে এবং ভক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য* আসিয়া তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিলে, সুরেন্দ্রনাথ দার্জ্জিলিং গমন করেন।

এইসময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সারদাচরণ মিত্র এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাশয়দ্বয়ের সহিত হিন্দুনারীর আদর্শ এবং আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গৌরীমার আলোচনা হয়। তাঁহারা মাতাজীর আদর্শ এবং প্রচেষ্টার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

---

* পরবর্ত্তিকালে নবদ্বীপ-নিবাসী সখীভাবের উপাসক 'ললিতা সখী' নামে খ্যাত।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৩০৬ সালে কলিকাতায় একটি 'মাতৃসভা'র অধিবেশন হয়। অনেক মহিলা ঐ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। গৌরীমা তাঁহাদিগের সমক্ষে হিন্দুনারীর আদর্শ, আশ্রমের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ন্যাসিনী মাতাজীর তেজোদৃপ্ত বাক্য, শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য শুনিয়া মহিলাগণ মুগ্ধ হইলেন।

এই মাতৃসভার প্রসঙ্গে বসিরহাটের উকিল দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী ভক্তিমতী শৈলবালা দেবী লিখিয়াছেন,—"যখন মাতৃসভা হইল একটি বড় ঘরে অনেক স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। এমন সময় গৌরীমা সেই ঘরে আসিলেন,...গৌরীমা মাতৃসভায় সেই কথাসকল বলিতে লাগিলেন, আমি শুনিলাম মাত্র। আমার মাতৃভাব তত ভাল লাগিল না, কারণ আমি তখন কৃষ্ণগতপ্রাণ, তখন ভাবিতাম শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম। কাজেই মাতৃভাবটি আমার ভাল লাগিল না। এমনকি ভাল করিয়াও শুনি নাই।... একটু পরে পুনরায় গৌরীমা আসিলেন, তখন তিনি গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগটি বলিতে লাগিলেন। তখন আমি একবার তাঁহার দিকে আমার ঘোমটার কাপড় খুলিয়া ভাল করে দেখিলাম। যখন বাঙ্গলায় ব্যাখ্যা করে বলিতেছেন, অবাক হয়ে তাঁহার সেই মূর্ত্তিটি দেখিতে লাগিলাম। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, একখানি লালপেড়ে গেরুয়া কাপড়পরা, কপালে একটি সিন্দূরের ফোঁটা, দুহাতে শাঁখা, চুলগুলি এলো রহিয়াছে, যেন একটি দেবী অপূর্ব্ব

শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! অসীম শক্তির বিকাশ পাইতেছে, ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন,—যিনি অনির্দ্দেশ্য যাঁহার নির্দ্দেশ করা যায় না, যিনি অব্যক্ত যাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না, ভাবে মধ্যে মধ্যে চোখের যেন এক এক ফোঁটা জল দেখা যাইতেছে। এইরূপ ভাবে অনেক কথা হইল কিন্তু তখন আমি আর সে আমি নাই। আমি যেন তাঁহার সেই ভাব দেখে অবাক, কি তেজ কি শক্তি কি ভাব এই ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন গায়ের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব্ব তেজ বাহির হইতেছে। সে ভাব আমার পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব, যে দেখেছে সেই সেই ভাবের মর্ম্ম বুঝেছে।...

"পরে মাতৃসভা ভঙ্গ হইল, অনেকে উঠিয়া গেলেন কেহ কেহ বা সেই ঘরেও বসিয়াছিলেন। সেই সভায় শ্রীশ্রীগৌরীমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী এসেছিলেন, তাঁহাকেও দর্শন হইল। গানও ২।১টী হইয়াছিল।...তখন হইতেই আমার মনে কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব হইতে লাগিল এবং পূজনীয়া শ্রীশ্রীগৌরীমাকে ছাড়িয়া আর আসিতে ইচ্ছা হইতেছে না, এবং মনে মনে হইতেছে একবার তাঁহাকে বলি আমাদের বাটী একবার যাবেন।...

"আমি প্রসাদ খাইয়া তাঁহাকে একবার বলিলাম আমাদের বাটী একবার যাইবেন। এই কথা শুনিয়াই শ্রীশ্রীগৌরীমা আমায় আশ্বাসবচনে বলিলেন, যাব মা তোমার বাটী যাব। আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, যেন কতদিনের চেনা, কি স্নেহ ভালবাসা, দেখে তো আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।"

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পর গৌরীমা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন কয়েকজন বালিকা গঠন করিতে হইবে, যাঁহারা মাতৃজাতির কল্যাণে এবং আশ্রমের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভোগ এবং সংসারের আকর্ষণ হইতে মুক্ত কুমারীগণ এই সেবাব্রতে যেমন একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন, সংসারকর্ম্মে বহুধা ব্যস্ত মায়েদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

গৌরীমা কুমারীদিগকে যে কেবল লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন তাহা নহে, তিনি সত্যই তাঁহাদিগকে 'জ্যান্ত জগদম্বা' বলিয়া মনে করিতেন। সরলমতি কুমারীদিগকে তিনি ভগবতীজ্ঞানে পূজা করিতেন। কেবল কুমারীদিগকেই নহে, সমগ্র মাতৃজাতিকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পুরুষসন্তানদিগকে তিনি উপদেশ দিতেন,—মাতৃজাতিকে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা করবে, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, সমগ্র জাতির কল্যাণ হবে। তাঁদের মেয়েমানুষ ভেবো না, ভাববে মা-মানুষ। যে মনু মহারাজ নারীর সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধ রচনা করেছেন, তিনিই এদের অনেক সম্মান দিয়ে বলেছেন,—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ *

---

* মনুসংহিতা, ৩।৫৬,—

যেখানে নারীজাতি পূজা পান, সেই সংসারের প্রতি দেবতাগণ প্রসন্ন থাকেন; যেখানে তাঁহারা পূজা পান না, সেখানে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল।

মাতৃজাতি যে কত সম্মানার্হ এবং তাঁহাদের স্থান যে কত উচ্চে, তাহার নির্দ্দেশক আরও দুইটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে গৌরীমা প্রায়ই উল্লেখ করিতেন,—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ, কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥[১]

যা দেবি সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥[২]

কুমারীপূজার জন্য এবং আশ্রমে অন্তেবাসিনীরূপে যাঁহাদিগকে তিনি গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ বালিকা ত্যাগের পথে থাকিয়া ভবিষ্যতে আশ্রম-সেবার ব্রত গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এইরূপ যে তিন-চারিটি বালিকাকে তিনি উত্তম

(১) শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৬,—

হে দেবি, বেদাদি (মীমাংসা, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি) সমস্ত বিদ্যা এবং (গীত, বাদ্য, নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি কলা, পাতিব্রত্যাদি) গুণযুক্তা সকল নারী আপনারই অংশ (বা প্রতিমূর্ত্তি); মাতৃরূপে আপনি একাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর এবং বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; আপনি স্বয়ং স্তবস্তুতিপারগতা, আপনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ স্তুতি আর কি হইতে পারে?

(২) শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।৭০,—

যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতে মাতৃরূপে (পালয়িত্রীরূপে) বিরাজমানা রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

আধারের বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটিকে বিশেষ-ভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই বালিকার কয়েকটি সহোদর অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইহেতু সন্তানগণের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহার পিতামহী দেবতার নিকট মানসিক করিতেন। একদিন এক সাধু উপদেশচ্ছলে বৃদ্ধাকে বলেন, "ভগবানকে যা' দান করা যায়, তা'র আর ক্ষয় হয় না। এরপর যে সন্তান হবে তা'কে ভগবানে সমর্পণ করো, তবেই সে বাঁচবে।" বালিকার জননী ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া বলেন, "তাই হবে, সন্তান বেঁচে থাকবে ত।"

ইহার কিছুকাল পরেই শারদীয়া নবমীপূজা-দিবসে পূর্ব্বোক্ত বালিকার জন্ম হয়। গৌরীমা এই সময় পুরুলিয়াতে তথাকার হিন্দু জনসাধারণের অনুরোধে দুর্গাপূজা করিতেছিলেন।

প্রায় তিন বৎসর বয়স হইতেই বালিকা বারাকপুর-আশ্রমে যাতায়াত আরম্ভ করে; মধ্যে মধ্যে সে আশ্রমেও বাস করিত, আবার পিতামহীর নিকট চলিয়া যাইত।

বালিকার বয়স যখন প্রায় পাঁচ বৎসর, গৌরীমা একদিন তাহার আত্মীয়বর্গকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "এইবার মেয়েকে দেবতার নিকট সমর্পণ কর। সাধুর কাছে দেবতার নামে কথা দিয়েছিলে।" বালিকার জননী ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকগমন করেন। তাহার পিতা এবং পিতামহী পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। গৌরীমার কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব লঘু প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। গৌরীমা গর্জ্জন

করিয়া উঠিলেন, "তবে কি দেবতাকে ফাঁকি দিতে চাও? তা'তে কল্যাণ হবে না, তার চেয়ে পুরীতীর্থে গিয়ে জগন্নাথদেবকে মেয়ে সম্প্রদান কর। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তোমাদের জামাই হবেন, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি চাও?" গৌরীমাকে তাঁহারা সকলে যেমন ভক্তি করিতেন, তেমনই ভয়ও করিতেন। 'যোগিনী-মা' রুষ্ট হইলে সংসারের অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া কেহ অধিক বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না।

গৌরীমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। বালিকাকে লইয়া তিনি পুরীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে চলিলেন বালিকার মাতামহী, মাতুল, কেশবমোহিনী দেবী, জগৎমোহিনী দেবী এবং নলিনচন্দ্র রায় প্রভৃতি। গৌরীমা তাঁহার পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারীর নিকট পুরী-আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পাণ্ডারা গিয়া পুরীর রাজাকে জানাইলেন, পঞ্চমবর্ষীয়া এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কুমারীকে পুরুষোত্তমের সহিত বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। রাজা ত শুনিয়া অবাক,—পুরুষোত্তমের সহিত মানবীর বিবাহ!

মন্দিরের অভ্যন্তরে দেববিগ্রহের সহিত মানুষের বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত কি-না, এই বিষয়ে মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইল। অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্য এক বিচারসভা আহূত হয়। পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুকূল সিদ্ধান্ত পাইয়া রাজা এই বিবাহে সম্মতি দিলেন। শ্রীমন্দিরের মণিকোঠায় রত্নবেদীর উপর বালিকাকে তুলিয়া জগন্নাথদেবের সহিত তাহার সম্প্রদানকার্য্য বিধিমত সম্পন্ন হইয়া গেল।

পিতার অনুমতিক্রমে বালিকার মাতামহী কন্যাকে সম্প্রদান করেন। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারী এবং তাঁহার পুত্র বৃন্দাবন চন্দ্র এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। অতঃপর বালিকাকে লইয়া গৌরীমা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ অনুসারে তিনি এই বালিকাকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। ১৩১১ সালে শ্রীশ্রীমা তাহাকে দীক্ষা দান করেন এবং ইহারও পাঁচ বৎসর পর তাহাকে সন্ন্যাস* দেন। সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষাদানের দিন, গৌরীমার কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

ইতোমধ্যে এক নূতন সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বালিকার আত্মীয়গণ কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, সে যখন যোগিনী-মার সহিত রহিয়াছে, তখন সেও একদিন যোগিনী হইয়া যাইবে। সুতরাং জগন্নাথদেবকে সম্প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁহারা বালিকাকে গৃহস্থাশ্রমে ব্রতী করাইতে আগ্রহান্বিত হইলেন।

দামোদর এবং আশ্রমের সেবার উপযুক্ত আধার মনে করিয়া গৌরীমা বালিকাকে তাহার আত্মীয়পরিজনের নিকট ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ইদানীং তাঁহাদিগের নানাপ্রকার উদ্যোগ চেষ্টা দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং রামকৃষ্ণ-মিশনের বিচক্ষণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

* স্বামী সারদানন্দ এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দেন।

উক্ত বালিকা কুমারী থাকিয়া এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মেয়েদের সেবা করিবে, স্বামী বিবেকানন্দের এইরূপ অভিপ্রায় স্বামী সারদানন্দ অবগত ছিলেন। তিনি গৌরীমাকে পরামর্শ দিলেন, "গৌরমা, খুকীকে যদি এই পথে রাখতে চাও, তবে শীগ্‌গির বাংলাদেশ ছেড়ে দূরে চ'লে যাও।" তিনি পাথেয়-স্বরূপ গৌরীমাকে কিছু টাকাও দিলেন এবং পশ্চিম-ভারতে পরিচিত একজন ভক্তের ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

স্বামী সারদানন্দের পরামর্শমত গৌরীমা ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বালিকাকে সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজ হইয়া বোম্বাই প্রদেশস্থ শোলাপুরে গিয়া তথাকার 'ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসার' হরিপদ মিত্র এবং তদীয়া পত্নী (স্বামী বিবেকানন্দের প্রথমা শিষ্যা) ভক্তিমতী ইন্দুমতী দেবীর অতিথি হইলেন।

ইন্দুমতী দেবী লিখিয়াছেন,—

"আমার পিতা ৺রাজনারায়ণ ঘোষ মুঙ্গেরে কর্ম্ম করিতেন, আমি সেখানে শুনিয়াছিলাম, মাতাজী মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী গঙ্গার ঘাটে কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু গৌরীমা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা এবং সঙ্গে কাহারও চিঠি ছিল না। কাজেই প্রথম দিন তাঁহাদের পরিচয় না পাইয়া একটু সন্দিগ্ধ মনে স্থান দিয়াছিলাম। পরে তাঁহার সমস্ত পরিচয় পাইয়া, তাঁর নিকট ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা এবং গুরুদেব স্বামীজীর কথা শুনিয়া পরম তৃপ্তি পাইতাম। মান্দ্রাজ হইতে শশী মহারাজ * মাতাজী সম্বন্ধে যে পত্র দিলেন

* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ এবং রামকৃষ্ণ-মিশনের মাদ্রাজ শাখার

তাহাতে আমাদের মনে আর কিছুই সন্দেহ রহিল না। এই পূজনীয়া গৌরীমার পুণ্যদর্শন ও তৎপর ভগিনী নিবেদিতার সেবা করিবার সুযোগ আমরা বোম্বের নিকটবর্ত্তী ব্যাণ্ডোয়া সহরে পাইয়াছিলাম।

"মাতাজী আমাদের নিকট শোলাপুরে প্রায় চারি মাস ছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে একত্রবাসে অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তিনিও আমাদের উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের খুব আদর যত্ন করিতেন। শোলাপুরে আমার স্বামীর এবং আমার বন্ধুগণ মাতাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিতেন। তিনি গল্পচ্ছলে অনেক ধর্ম্মকথা বলিতেন, সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন।"

গৌরীমা এবং বালিকা শোলাপুর হইতে পাণ্ডারপুর, পুনা, বেলগাঁও এবং বোম্বাই গিয়াছিলেন। তাঁহারা পুনায় অধ্যাপক কার্ভের নারী-শিক্ষালয় এবং বিধবা-আশ্রম পরিদর্শন করেন। বিধবাদিগের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত গৌরীমার আলোচনা হয়। মাননীয় বিচারপতি মহাদেও গোবিন্দ রাণাড়ের পত্নী এবং বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত হিন্দুর প্রাচীন রীতিনীতি ও আদর্শ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা হয়।

এইভাবে অজ্ঞাতবাসকালে কলিকাতায় গুজব রটিয়া গেল যে, গৌরীমা দেহত্যাগ করিয়াছেন। দুর্গাপূজার সময় তিনি সাধারণতঃ কলিকাতায় কালীঘাটে উপস্থিত থাকিয়া মায়ের পূজা

অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শোলাপুর যাইবার পথে গৌরীমা কিছুদিন তাঁহার অতিথি হইয়া মাদ্রাজে অবস্থান করিয়াছিলেন।

এবং চণ্ডীপাঠ করিতেন। ঐ বৎসরও দুর্গাপূজার সময় কালীঘাটে উপস্থিত থাকিবেন স্থির করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া শ্যামনগরে এক ভক্তের বাড়ীতে উঠিলেন এবং তথা হইতে একদিন বেলুড় মঠে গমন করেন।

মঠের একতলার বারান্দায় বসিয়া স্বামী শিবানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ ভক্তগণ তখন গল্প করিতেছিলেন। দূর হইতে গৌরীমাকে দেখিতে পাইবামাত্র গিরিশচন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, "ও মা, তবে কি আপনি বেঁচে আছেন!" গৌরীমা জীবিত আছেন দেখিয়া সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতবাসের গল্প শুনিতে বসিয়া গেলেন।

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুদিন পর পূর্ব্বোক্ত বালিকার আত্মীয়পরিজনের সহিত একটা মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে লইয়া গৌরীমা একদিন তাহার পিতা বিপিন-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা নিজের মনের অবস্থা সরলভাবে খুলিয়া বলিলেন। কন্যাকে যোগিনী-মার হাতে সমর্পণ করিতে পত্নী ব্রজবালার অন্তিম ইচ্ছা, জগন্নাথদেবে সম্প্রদান এবং আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা,—এইসকল বিবেচনা করিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। উভয় পক্ষে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে পিতা স্বীকৃত হইলেন যে, অন্যে যাহাই করুক, তিনি নিজে যোগিনী-মা এবং কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না।

বারাকপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরও গৌরীমা মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে অথবা ভক্তগণের আহ্বানে এবং ধর্ম্মপ্রচারে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আশ্রম-বাসিনীদিগকে তাঁহাদের নিজেদের অথবা গৌরীমার পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ভক্ত মুচিরাম তখন আশ্রম-বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

গৌরীমা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেকসময় নানাকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন, ছুটাছুটি করিতেন; কিন্তু তাঁহার চিত্ত প্রিয়তম দামোদরের প্রেমসাগরেই নিমগ্ন থাকিত। পরবর্ত্তী কালে অধিকতর কর্ম্মকোলাহলের মধ্যেও, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দামোদরের সঙ্গে এই মধুর ভাব পরিপূর্ণরূপে অব্যাহত ছিল। কর্ম্মের অবকাশে তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে লইয়া নিভৃতে বসিতেন। উভয়ের মধ্যে আবদার-নিবেদন, মান-অভিমান, আদান-প্রদান কত-কি চলিত, তাহা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির উর্দ্ধে। তাঁহার প্রেম ও নিষ্ঠার কথায় শ্রীশ্রীমা কোন কোন ভক্তের নিকট বলিতেন, "পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে গৌরদাসী কি-ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিলে!"

দামোদরের সঙ্গে গৌরীমার কিরূপ মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহার প্রসঙ্গে শৈলবালা দেবী লিখিয়াছেন, "একদিন মা সকল কাজ সারিয়া দুপুর বেলায় আসিয়া শুইয়াছেন, কিন্তু মা যেন স্থির হইতে পারিতেছেন না, কেন যে তাহা হইল, মাও ঠিক করিতে পারেন

নাই। একটু পরে মা বলিলেন, 'ও মা, কত্তার যে দুধ খাওয়া অভ্যেস, দুধ খাওয়া ত আজ হয় নি। তাই কত্তার ঘুম আসছে না। মা তখন ঠাকুর ঘরে গিয়া দামোদরকে দুধ দিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, 'এই দুধটুকু খেয়ে ঘুম এলো।'

"আর একদিন রাত্রিতে গৌরীমার শরীর ভাল ছিল না। দামোদরের জন্য আর সেই রাত্রিতে প্রত্যেক দিনকার মত রান্না হইল না, কিছু ফলমিষ্টি ভোগ দিয়া গৌরীমা শুইয়া পড়িলেন। দুপুর রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, তাঁহার রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছে। গৌরীমা অতো রাত্রিতে উনুন জ্বালিয়া লুচি ভাজিতেছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এক ঘুমের পর কত্তা বললেন, তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে। তাই এ ব্যবস্থা।"

বারাকপুরের কথায় নবদ্বীপধামের ললিতা সখী লিখিয়াছেন, "একদিন রাত্রে দামুকে ভোগ দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া মা একটি নিবেদন-পদ ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছেন,—

'মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥

ধীরে কপাট খুলিয়া দেখি, মা আত্মহারা, বুকে দামোদরকে ধরিয়াছেন, দুটি চোখের জলে দামোদরের স্নান হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিব্যাপ্ত। সে যে কত আর্ত্তি, কত আত্মনিবেদন, কত অভিমান তাহা দেখিবার ভাগ্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু বুঝাইবার ভাষা নাই।"

আর একদিন সন্ধ্যাকালে পঞ্চবটীর তলায় একটা গাছের ডাল ধরিয়া গৌরীমা স্বরচিত একটি গান গাহিতেছিলেন,—

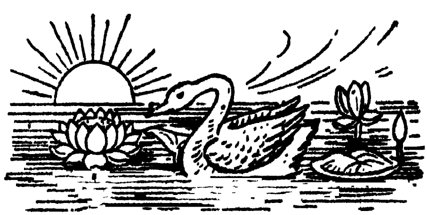
অভয় পরমানন্দ পেয়েছি মা, তোমার পদকমলে।
আনন্দে আনন্দময়ী আমি ভ্রমিতেছি ভূমণ্ডলে॥
তোমার কোল শীতল পেয়েছি,
মাই-মুখে মুখ দেখিতেছি,
কালেরে ফাঁকি দিয়েছি, ঢাকা আছি তোর আঁচলে॥

গাহিতে গাহিতে চক্ষে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল, ক্রমে রাত্রিও গভীর হইল। ঊর্দ্ধে তারকা-শোভিত অসীম নভোমণ্ডল, সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথী, সিদ্ধভূমি পঞ্চবটীর মূলে দাঁড়াইয়া আনন্দময়ীর কন্যা সমাধিস্থা।

আশ্রমবাসিনীগণ এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই; তজ্জন্য তাঁহারা গৌরীমাকে ডাকিতে অথবা স্পর্শ করিতে সাহস পাইলেন না। এইভাবেই অতিবাহিত হইল দীর্ঘ রজনী, তারপর ঊষার আলোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল, আনন্দময়ীর কন্যা তখনও ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দণ্ডায়মানা।

প্রাতঃকালে গ্রামের মহিলাগণ গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া পঞ্চবটীমূলে পঞ্চানন শিবকে জল দিতে আসিয়া দেখেন,—বাহ্যজ্ঞানশূন্যা যোগিনী-মা দেবী-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছেন, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ। এই দিব্যাবস্থার কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল, গ্রামান্তর হইতেও বহুলোক তাঁহাকে

দর্শন করিতে আসিলেন। ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাগত জনমণ্ডলী তাঁহার চতুর্দ্দিকে মাতৃনাম করিতে লাগিলেন। সেই পবিত্র মাতৃধ্বনিতে শান্ত তপোবন মুখরিত হইয়া উঠিল। গৌরীমা ধীরে ধীরে ভাবের রাজ্য হইতে বাহ্যজগতে ফিরিয়া আসিলেন।



স্বামিজী-প্রসঙ্গে

গৌরীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহাদিগের জননীদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব বর্ত্তমান ছিল। স্বামিজী অপেক্ষা গৌরীমা বয়সে কয়েকবৎসরের বড় ছিলেন এবং তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। গৌরীমাকে স্বামিজী কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন সে সম্বন্ধে তদীয় সহোদর মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন,—

"গৌরীমার সহিত ধীরে ধীরে যখন মেশামেশি হইল অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে জানা হইল তখন সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ, শরত ও আমি তাঁহাকে প্রথম জানাশুনা হইতেই অতীব শ্রদ্ধা করিতাম। নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি থাকায় গৌরীমার ভিতর যে অদ্ভুত শক্তি আছে, তেজোরাশি আছে এবং ভবিষ্যতে তাহা বিকশিত হইবে, ইহা তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইজন্য গৌরীমাকে নরেন্দ্রনাথ ভিন্নস্তরে ফেলিতেন।*

* গৌরীমার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সংগঠন শক্তির বিষয় সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদিগের নিকট লিখিত স্বামিজীর বিভিন্ন পত্রে উল্লেখ দেখা যায়; স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

আমেরিকা হইতে লিখিত—

(১) গৌর মা কোথায়? ঐরূপ মহতী এবং চৈতন্যসঞ্চারিণী শক্তিতে দীপ্ত হাজার মা আমাদের প্রয়োজন।

(২) দুহাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ—

"নরেন্দ্রনাথ তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন ও প্রচেষ্টা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; গৌরীমার ভিতরটা পুরুষ ও বাহিরটা স্ত্রীলোক···যেমন গম্ভীর, রাশভারী, প্রত্যক্ষ রুদ্রানীর মূর্ত্তি, আবার অপরদিকে তেমনি স্নেহময়ী মাতা। নরেন্দ্রনাথ প্রথম হইতে এই বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য গৌরীমাকে অতীব উচ্চস্থান দিতেন।"

গৌরীমা ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সহিত স্বামিজীর আচরণ ছিল বালসুলভ সরলতায় পূর্ণ। স্বামিজী নিজেও বলিতেন, "ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি।" এই অধ্যায়ে তাঁহাদিগের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইল।

গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবীকে স্বামিজী 'দিদিমা'

বুঝলে? গৌর মা, যোগেন মা, গোলাপ মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো।

(৩) গোলাপ মা বা গৌর মা তাদের মন্ত্র দিয়ে দিক না কেন?··· একবার জায়গা হলে মাঠাকুরাণীকে centre করে গৌর মা, গোলাপ মা একটা বেড়োল হুজ্জুক মাচিয়ে দিক।

ইংলণ্ড হইতে লিখিত—

(৪) গৌর মা, যোগীন মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা (মঠ) মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর মাকে এক বৎসর মহান্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও সমস্ত খরচপত্র আমি পাঠিয়ে দেব।

বলিয়া ডাকিতেন। দিদিমার বহুমুখীন প্রতিভার জন্য স্বামিজী তাঁহার খুব সুখ্যাতি করিতেন। উভয়ের মধ্যে বহুবিধ আলোচনা এবং পরিহাসও চলিত। সন্ন্যাস-আশ্রমের প্রসঙ্গে গিরিবালা রহস্যচ্ছলে বলিতেন, "ভারী ত আমার সাধু! খিড়কি দোর দিয়ে পালিয়েছ, তোমাদের আবার বাহাদুরি কি? আমাদের মত সংসারের জ্বালা সয়ে যদি ভগবানকে ডাকতে পারতে, বুঝতুম, হাঁ, মরদ।" স্বামিজীও পরাজয় স্বীকার করিতেন না, "দিদিমা, সংসারের মোহ এখনো কাটাতে পাচ্ছ না, তোমাদের কি উপায় হবে!" দিদিমার প্রসঙ্গে স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, "এত বড় দুনিয়াটা ঘুরে এলুম, কোথাও ত কথা কইতে ভাবতে হয় নি, কিন্তু দিদিমার কথার জবাব দিতে হিসেব ক'রে কথা কইতে হয়!"

একবার গৌরীমা, তাঁহার মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং স্বামিজী হরিদ্বারে এক বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। একদিন গৌরীমা বাহিরে গিয়াছেন, এমন সময় এক ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। গিরিবালা তাহাকে দান করিবার মত ঘরে কিছুই পাইলেন না। কতকগুলি আম গৌরীমা পৃথক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন দামোদরের ভোগের জন্য। ঠাকুরদেবতার উদ্দেশে রক্ষিত কোন দ্রব্যের অগ্রভাগ ভোগের পূর্ব্বে তিনি কাহাকে কখনও দিতেন না। গিরিবালাও তাহা জানিতেন। স্বামিজী সেই আমগুলি দেখাইয়া বলিলেন, "দিদিমা, আঁব ত রয়েছে কতকগুলো, দুটো ওকে দাওনা।" দিদিমা কন্যাকে ভালরূপে চিনিতেন, বলিলেন, "আরে বাপ্‌রে, এক্ষুণি এসে প্রলয় ঘটাবে।"

গৌরীমার আচারনিষ্ঠার বিষয় স্বামিজীও জানিতেন, তথাপি সরলপ্রকৃতি দিদিমাকে লইয়া একটু রঙ্গ করিবার জন্য বলিলেন, "তা ব'লে গরীব ভিকিরীকে শুধুহাতে ফিরিয়ে দেবে, দিদিমা ?" তাঁহার কথায় বৃদ্ধা দুই-তিনটি আম আনিয়া ভিখারীকে দিলেন।

এদিকে গৌরীমা আসিবামাত্র, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত তাঁহার নিকট স্বামিজী অভিযোগ করিলেন, "ও গৌরমা, দেখেছ কাণ্ডটা! দিদিমা তোমার দামুর ভোগের ঐ আঁব ভিকিরীকে দিয়ে দিয়েছেন। দামুর ভোগ ত ওতে আর হবে না।" ইহা শুনিয়া গৌরীমা গর্ভধারিণীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

তাঁহার দোষে দামোদরের ভোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা সেই জন্য কন্যার কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু স্বামিজীর আচরণে তিনি অবাক হইলেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বামিজী মনে মনে খুব কৌতুক বোধ করিতেছিলেন, এবং একসময় তাঁহাকে নিরালায় পাইয়া খুব সহানুভূতির সুরে বলেন, "দেখলে ত দিদিমা, তোমার মেয়ের কাণ্ডটা! সামান্য দুটো আঁবের জন্যে কি বকাটাই না ব'কলে।" দুঃখের মধ্যেও দিদিমা তখন হাসিয়া বলিলেন, "তা দাদা, তুমিও ত ঠাকুরটি কম নও! চোরকে বল চুরি করতে, গেরস্তকে বল সজাগ থাকতে!"

এইবার দুইজনই খুব হাসিতে লাগিলেন।

হরিদ্বার হইতে গৌরীমা পুনরায় কেদারনাথ এবং বদরী-নারায়ণজী দর্শনে গমন করেন। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়াও স্বামিজী, গিরিবালা দেবী এবং তাঁহার



স্বামী বিবেকানন্দ



দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীমূলে

পুত্র অবিনাশচন্দ্র তথা হইতে ফিরিয়া আসেন। এইসময়ে গৌরীমার ভ্রমণোপযোগী কতকগুলি বস্ত্র স্বামিজী ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

গৌরীমার কাছে স্বামিজী একবার মা-কালীর প্রসাদ খাইতে চাহিলেন। গৌরীমা সেইদিনই ভোগের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামিজী এবং ঠাকুরের আরও কয়েকজন ভক্তসন্তানসহ কালীঘাটে গেলেন। কালীঘাটে মায়ের সেবায় গিরিবালা দেবীর এক অংশ ছিল। দেবীর ভোগরন্ধনের জন্য মন্দিরে তাঁহাদের একখানি পৃথক ঘরও ছিল। গৌরীমা সময় সময় ঐ ঘরে ভোগ রন্ধন করিয়া মা-কালীকে নিবেদন করিতেন। ঐ দিনও মা-কালীকে ভোগ নিবেদন করিয়া তিনি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

তাঁহার হাতের রান্না প্রসাদ খুবই সুস্বাদু হইত বলিয়া স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, "গৌরমা, তুমি ম'রে গেলে তোমার ডান হাতখানা কেটে রেখে দেবো ; আমাদের যখন পেসাদ খেতে ইচ্ছে হবে, তোমার ঐ হাত আমাদের রেঁধে দেবে!"

একবার গৌরীমা ও স্বামিজী তারকেশ্বর গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী অদ্বৈতানন্দ (বুড়ো গোপাল)। তাঁহারা পদব্রজে গমন করেন। পথিমধ্যে একটি পুকুরের সিঁড়িতে বসিয়া গৌরীমা দামোদরের পূজা এবং ভোগ সম্পন্ন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পল্লীর কয়েকটি মহিলা আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপপরিচয় করিতে লাগিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তাঁহারা গৌরীমাকে প্রশ্ন করেন, "ওরা আপনার কে হন?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ওরা আমার ছেলে।"

স্বামী অদ্বৈতানন্দের বয়স ছিল বেশী। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা, ঐ বুড়ো সাধুটিও আপনার ছেলে ?"

গৌরীমা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওটি আমার সতীন-পো।"

রাস্তায় চলিতে চলিতে স্বামী অদ্বৈতানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামিজী কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, "ভাগ্যিস্ বুড়ো হই নি, তা হ'লে আমাকেও আজ সতীন-পো হ'তে হতো।"

একবার বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থানকালে অকস্মাৎ স্থানান্তর হইতে স্বামিজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন, "গৌরমা, শীগ্‌গির খেতে দাও আমায়, ভারী ক্ষিদে পেয়েছে।" তখন রাত্রিকাল, গৌরীমার কাছে সেদিন কোনপ্রকার খাদ্যসামগ্রী ছিল না। তিনি ভাবনায় পড়িলেন, এত রাত্রে কোথায় কি পাওয়া যায়; অথচ কিছু না হইলেও নরেন সারা-রাত্রি উপবাসী থাকে। গৌরীমা তখন একজন পরিচিত দোকান-দারের বাড়ী গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। দোকানদার বাহিরে আসিলে বলিলেন, "তোমার দোকান খুলে কিছু খাবার না দিলে সাধু উপবাসী থাকেন।" দোকানদার কিছু খাবার দিলে তদ্দ্বারা স্বামিজীর ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলেন। এইবার স্বামিজীও মধ্যে মধ্যে আসিয়া কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করিতেন।*

---

* এইসময়ে স্বামিজীকে বৃন্দাবনের ঠিকানায় লিখিত দুইখানি পত্র—
(১) বরাহনগর হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ-লিখিত (২৫শে আগষ্ট, ১৮৮৮),—
"ভাই নরেন। গতকল্য তোমার দুখানি পত্র পাইয়া আমরা সকলে

পূর্ব্বোক্ত রাত্রিতে গৌরীমার পূজিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটোখানি লইয়া স্বামিজী হাতরাস চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেই ফটোর সমক্ষে তিনি হাতরাসের তৎকালীন 'ষ্টেশনমাষ্টার' শরৎচন্দ্র গুপ্তকে দীক্ষা দান করেন। ইনিই স্বামী সদানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য।

স্বামিজী প্রথমবার বিদেশ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গৌরীমা তাঁহার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া গেলেন। ঠাকুরের বীর সন্তান পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে গৌরীমা গৌরব অনুভব করিতেন। বহুদিন পর উভয়ের সাক্ষাৎ। কুশলপ্রশ্নাদির পর স্বামিজী বিদেশের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথাচ্ছলে তিনি বলেন, "আমি কিন্তু ওদের কাছে তোমার কথা ব'লে এসেছি। তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাব—আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায়।"

অত্যন্ত আহ্লাদীত হইয়াছি।…শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভাই যেন একেবারে ভুলে যেও না—এই ভিক্ষা তোমার নিকট রহিল। আমাদের সকলকার প্রণাম জানিবে এবং G. Motherকে প্রণাম জানাইবে।"

(২) বেলুড় হইতে স্বামী যোগানন্দ-লিখিত (আগষ্ট, ১৮৮৮),—

"মাতাঠাকুরাণি ও আর ২ সকলে ভাল আছেন মাতাঠাকুরাণির আশীর্ব্বাদ ও আর সকলের প্রণাম জানিবে গৌরমাকে মাতাঠাকুরাণির আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও আর সকলের প্রণাম জানাইবে। আমার প্রণাম তুমি জানিবে ও গৌরমাকে জানাইবে।"

গৌরীমার আশ্রম-প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া স্বামিজী সন্তোষ প্রকাশ করেন। বারাকপুর-আশ্রমে স্বামিজী দুইবার গিয়াছিলেন; —প্রথমবার পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে সম্বর্দ্ধনার নিকটবর্ত্তী কোন সময়, দ্বিতীয়বার দার্জিলিং হইতে প্রত্যাগমনের পর।* আশ্রমের স্থানটি দেখিয়া স্বামিজী প্রীত হন। আশ্রমের ভবিষ্যৎ কার্য্য-পরিচালনা বিষয়ে গৌরীমার সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হয়।

একবার আশ্রমের প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ সেনকে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "হুড় হুড় ক'রে টাকা আসা উচিত ছিল। তখন বল্‌লুম গৌরমাকে, চল আমার সঙ্গে আমেরিকায়। ওরাও বুঝতো আমাদের দেশেও কেমন মেয়ে জন্মায়। একবার ঘুরে এলে টাকার কত সুবিধে হতো। তা উনি গেলেন না, জাত যাবে ব'লে।"

ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও দুইটি বিদেশীয়া মহিলাকে স্বামিজী যেদিন গৌরীমার সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দেন, সেইদিনের কথা বলিয়া স্বামিজী বড়ই আমোদ অনুভব করিতেন,

---

* স্বামী শিবানন্দজীর লিখিত পত্র,—

"পূজনীয়া গৌরীমা

নরেন্দ্রনাথের শরীর অত্যন্ত কাতর···তিনি আপনার ওখানে যাইতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছেন···এজন্য আমরা আশা করি আপনি কিছু মনে করিবেন না সোমবার তার দার্জিলিং যাওয়া স্থির হইয়াছে সেখান হইতে আসিয়া পুনরায় আপনার ওখানে সাক্ষাৎ হইবে···

আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। প্রণত—

তারক (শিবানন্দ)"

"নিবেদিতা তখন বাংলা কিছুই জানে না, গৌরমাও ওদের ইংরিজি কথা সব বোঝেন না; উভয়ে উভয়কে মনের কথা বোঝাতে উৎসুক। তখন ইসারায় আলাপ চললো। মুখ নড়ে, হাত নড়ে, মাথাও নড়ে, কিন্তু কেউ কারুর ভাষা বোঝে না। সে এক মজার দৃশ্য!"

১৩০৮ সালের শীতকালে একদিন গিরিবালা দেবী, তাঁহার এক দৌহিত্রী এবং গৌরীমা বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী একতলায় তাঁহাদিগের নিকট আসিলেন। গিরিবালা এবং তাঁহার দৌহিত্রীর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে স্বামিজী বলেন, "দিদিমা, খুকী উচ্চশিক্ষা পেয়ে মেয়েদের সেবা করবে। ওকে আমি বিলেত পাঠাব। সব খরচা আমি দেবো। তোমরা কিন্তু আপত্তি তুলো না।" গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন, "দাদা, দেশে থেকেও তা হ'তে পারে।"

তাহার পর গৌরীমার সঙ্গে আশ্রমের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। স্বামিজী বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হ'য়ে এলো এবার। মেয়েদের কাজ রইলো, আর তুমি রইলে—"

গৌরীমা বাধা দিয়া বলেন, "ষাট্ ষাট্, ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।"

কিয়ৎকাল গম্ভীর থাকিয়া স্বামিজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঠাকুরের কথা কি নড়চড় হবার যো আছে, গৌরমা!" আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা মায়েরা চাও আমাকে ষেটের বাছা ক'রে চিরকাল ধ'রে রাখতে। তা কি হয়?"

১৩০৯ সালের আষাঢ় মাস। বারাকপুর-আশ্রমে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছিল, অনেক ভক্তসন্তান সেইদিন সমবেত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পর গৌরীমা ঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "মঠে কি সর্ব্বনাশ হলো রে! নরেন বুঝি ফাঁকি দিলে।"

উপস্থিত সকলের বুক আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সেইদিনই অপরাহ্ণে যাঁহারা স্বচক্ষে স্বামিজীকে মঠে দর্শন করিয়াছেন, বাহিরে বেড়াইতে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা গৌরীমার আশঙ্কা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। মায়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া ভক্ত মুচিরাম বলিলেন, "মা, তুমি অমন কথা বলো না, আমি এক্ষুণি বেলুড় থেকে খবর নিয়ে আসছি।"

বেলুড় হইতে সংবাদ আসিল, স্বামিজী মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। গৌরীমা বর্ত্তমান আশ্রম-সম্পাদিকাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে বেলুড় অভিমুখে রওনা হইলেন।

কলিকাতায় আশ্রম

আশ্রম বারাকপুরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আর্থিক সাহায্যের জন্য অধিকাংশ সময় কলিকাতার ভক্তগণের উপর নির্ভর করিতে হইত। কোন অভাব-অভিযোগ উপস্থিত হইলে সাহায্যের জন্য গৌরীমা কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন। 'এই টাউনে ব'সে কাজ করতে হবে',—ঠাকুরের এই নির্দ্দেশও তিনি বিস্মৃত হন নাই। অধিকন্তু তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ ছিল যে, শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করেন। এতদ্ব্যতীত, অনেকেই কলিকাতা মহানগরীতে একটি আদর্শ হিন্দু নারীপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। তদনুযায়ী ১৩১৮ সালের প্রথম ভাগে ১০নং গোয়াবাগান লেনে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কলিকাতায় আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হয়।

ইহাতে শ্রীশ্রীমা এবং গৌরীমা উভয়েই খুব আনন্দিত হইলেন। গৌরীমা প্রায়ই 'উদ্বোধন'-ভবনে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ লইয়া গিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেন। আশ্রম-বাসিনীগণও মধ্যে মধ্যে গৌরীমার সহিত শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহাদের কণ্ঠে স্তোত্র এবং সঙ্গীতাদি, বিশেষ করিয়া "জয় সারদাবল্লভ" কীর্ত্তনটি শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীমা প্রীত হইতেন।

কিন্তু বারাকপুরের গঙ্গাতীরে মনোরম শান্তরসাস্পদ আশ্রম,

পঞ্চবটীতলার পবিত্র আবেষ্টনী গৌরীমাকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্য অবকাশ সময়ে তিনি আশ্রমবাসিনীদিগকে লইয়া বারাকপুরে যাইয়াও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহারা সাধনভজন করিতেন, মনের আনন্দে থাকিতেন; কয়েকদিন পর আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন। কিছুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট জলকলের জন্য ঐসকল জমি অধিকার করেন।*

আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পর আশ্রমের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণের মধ্যে একদিন আলোচনা হইতেছিল। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের জনৈক অন্তরঙ্গসন্তানকে গৌরীমার আশ্রমের সাহায্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "সাহায্য করতে ত ইচ্ছে হয়, কিন্তু গৌরমার কি কিছু ঠিক আছে? আজ এখানে, কাল বৃন্দাবনে, পরশু হরিদ্বারে গিয়ে তপস্যায় বসবেন। মেয়েদের কাজ, এসব সামলাবে কে?" এই কথা শুনিয়া গিরিশচন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি বলছো ভাই, সিংহীকে ঠাকুর খাঁচায় পুরেছেন! এখন কি দু'চারটে মেয়ে তৈরী না ক'রেই ওঁর কোথাও পালাবার সাধ্যি আছে? আমি তা মনে করি না। এ কাজ হবেই হবে।"

এইসময় কলিকাতায় এক প্রকাশ্য সভায় গৌরীমা আশ্রমের

---

* পলতা জলকলের অফিসের উত্তরদিকে এখনও আশ্রমের সেই স্থানটি দেখা যায়। ভক্ত মুচিরামের নির্ম্মিত ইট-বাঁধান ঘাট এবং তুলসীমঞ্চ এখনও রহিয়াছে।

উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশদভাবে বিবৃত করেন। সভায় উপস্থিত সকলকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন, "কে আছ এখানে মাতৃপূজার পূজারী, মায়ের দুঃখে যাদের প্রাণে ব্যথা লাগে, এসো মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে জীবন সার্থক কর।" অনেক সহৃদয় নরনারী গৌরীমার আহ্বানে তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করিতে অগ্রসর হইলেন।

১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাস হইতে আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়া আসিতেছে। এইসময়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, অধ্যাপক অনন্তকুমার রায় (তৎকালীন আশ্রম-সম্পাদক), কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী, বর্ত্তমান সম্পাদিকা প্রভৃতিকে লইয়া আশ্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মাতাজী একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করেন। আশ্রমের 'মাতৃসঙ্ঘে'র সূচনাও এই সময়েই হয়।

গোয়াবাগানে থাকাকালে আশ্রমে দশ-বার জন কুমারী ও বিধবা বাস করিতেন, এবং প্রায় ষাট জন বালিকা বাহির হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ে পড়িয়া যাইতেন। ক্রমে মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানীর অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী ও ঘোড়া ক্রয় করা হইল। টাকাপয়সা, অন্নবস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম্ম গৌরীমা নিজেই করিতেন। তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন সহকারিণী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন।

এইসময় একদিন গৌরীমা আশ্রমের বালিকাদিগকে লইয়া

যাত্নঘরে গিয়াছিলেন, এমনসময় সংবাদ পাইলেন, গিরিবালা দেবী অতিশয় অসুস্থ এবং তাঁহার তপঃসিদ্ধা কন্যাকে অন্তিমকালে একবার দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌরীমা ভবানীপুরে যাইয়া দেখেন, তাঁহার জননী অন্তিমশয়নে শায়িতা। ইহলোকের সকল কর্ম্ম শেষ করিয়া পুত্র, কন্যাদ্বয় এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধা সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করিলেন। গিরিবালা গঙ্গাগর্ভে নীত হইলে সন্ন্যাসিনী কন্যা এবং পুত্রপরিজন সকলে নাম করিতে লাগিলেন। 'মা-কালীর মেয়ে' গিরিবালা পূতসলিলা ভাগীরথীর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ডাকিলেন, "মা গঙ্গে, মা কালিকে, মা দুর্গে।" এইভাবে নাম শ্রবণ এবং জপ করিতে করিতে ১৩২০ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, পূর্ণিমাতিথিতে মহাসাধিকা গিরিবালা দেবী সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন।

গিরিবালার বহুবিধ গুণের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সহিত যাঁহারা ধর্ম্মালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ এবং উপকৃত হইতেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি হস্তরেখা এবং দৈহিক লক্ষণদৃষ্টে মানুষের ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে পারিতেন। ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যখন স্বামী সারদানন্দের পাশ্চাত্ত্যদেশে যাইবার কথা আলোচনা হইতেছিল, তিনি একদিন তাঁহাদের 'দিদিমা'—গিরিবালা দেবীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার

বিদেশ যাওয়া হইবে কি-না। গিরিবালা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ দাদা, তোমার সমুদ্রযাত্রা সুনিশ্চিত, আর তোমার যশোলাভও আছে। গিরিবালার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। এই ঘটনা সারদানন্দজী আমাদিগকে বলিয়াছেন।

গিরিবালা মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিতেন এবং আশ্রমকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। আশ্রমবাসিনী বালিকাদিগকে তিনি ধর্ম্মবিষয়ক গল্প বলিতেন, দুই-একটি ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া এবং গান গাহিয়া শুনাইতেন বলিয়া তাঁহারা বৃদ্ধাকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তখন অনেকেই জানিতেন না। এমন-কি, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন গৌরীমা আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানাইলেন, 'সেই বৃদ্ধা স্বর্গে চলে গেছেন,' গৌরীমার সহজ নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া তখনও তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যাঁহাকে তাঁহারা এতদিন 'ঠাকুমা' বলিয়া ডাকিতেন সেই স্নেহময়ী বৃদ্ধা গৌরীমারই গর্ভধারিণী।

কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পরও প্রথম কয়েকবৎসর আশ্রমের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হয় নাই। একদিন আশ্রমবাসিনী কুমারীদিগকে খাইতে দিবার জন্য সামান্য কিছুও ঘরে না পাইয়া গৌরীমা অগত্যা ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এইভাবে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত।

সেইদিন অপরিচিত এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া তিনি

উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রয়োজনে তিনি আসিয়াছেন। গৌরীমা উত্তরে বলিলেন, "আমি ভিকিরী, মা, তোমরা কিছু ভিক্ষে দাও।"

তাঁহার মাথায় সিন্দূর, হাতে শাঁখা, পরিধানে গৈরিক বসন এবং জ্যোতিঃপূর্ণ বদনমণ্ডল দর্শনে কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা বাছা, স্বামী কি করেন?"

গৌরীমা বলিলেন, "স্বামী সন্ন্যিসী * হয়ে গেছেন, তাই মা, দেখছো না, আমিও সন্ন্যিসী। তবে অনেকগুলি মেয়েকে খেতে দিতে হয়। আজ আমার ঘরে খাবার কিছুই নেই, তাই তোমার কাছে ভিক্ষে করতে এসেছি।"

কর্ত্রীর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগিল, তিনি কিছু চালডাল এবং তরিতরকারী তাঁহাকে দিলেন। গৌরীমা সেইগুলি চাদরে বাঁধিয়া যখন বাহিরে আসিলেন, বাড়ীর কর্ত্রী কৌতূহলবশতঃ তাঁহার এক পুত্রকে গোপনে এই সন্ন্যাসিনীর ঠিকানা ও পরিচয় জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

গৌরীমা সেই পুঁটুলিটি বহন করিয়া যখন পদব্রজে আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন সেই পথে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। গৌরীমাকে রাস্তায় পদব্রজে যাইতে দেখিয়া তিনি গাড়ী

* মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই গৌরীমার কথার তাৎপর্য্য।

হইতে নামিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করেন এবং গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

পূর্ব্বোক্ত সন্তানটিও গাড়ীর পশ্চাৎ ভাগে উঠিয়া আশ্রম পর্য্যন্ত আসিল এবং গৌরীমার পরিচয় পাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া সকল কথা গৃহকর্ত্রীকে জানাইল। তাহা শুনিয়া মহিলা এতই লজ্জিত হইয়াছিলেন যে, অবিলম্বে একদিন নিজে আশ্রমে আসিয়া গৌরীমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি আপনাকে সেদিন চিনতে পারি নি। সেজন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি, আমায় ক্ষমা করুন।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি সেদিন আমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিলে, এতে তোমার ক্ষমা চাইবার কি আছে!" সেই হইতে এই মহিলা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ নানাপ্রকারে আশ্রমের সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল লিখিয়াছেন, "এই সময়ের কাহিনী বড় করুণ, বড়ই শিক্ষাপ্রদ। বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ, আশ্রমে বাস করার উদ্দেশ্যে যে সকল মেয়ে আসত, তাদের পরিচয় গ্রহণ, তাদের বেছে নেওয়া, নানারকমের মানুষের আগমন ও কোলাহল, সর্ব্বোপরি আয়ব্যয়ের চিন্তা,—মার মত বড় আধারই সে সকলের ভিতর দিয়ে চলতে পারে। অশেষ বাধা বিপত্তি, অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীগৌরীমা মাথা উঁচু করেই অগ্রসর হয়েছেন। একদিনের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি, এক মুহূর্ত্তের জন্য কাতর হন নি,—আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র শক্তি কতদিন অবসন্ন হয়ে

পড়েছে। * * কত নৈরাশ্য আমাদিগকে বিদ্ধ করেছে, কিন্তু মাকে কখনো নিন্দা করতে শুনি নি, কখনো পিছন ফিরে চাইতে দেখি নি। এক মহান্ উদ্দেশ্য ও তদপেক্ষা মহতী সিদ্ধি-শক্তি সর্ব্বদা তাঁহাতে প্রকাশিত দেখা যেত।"

এইসময় একদিন শ্রীশ্রীমা গৌরীমাকে বলেন,—তুমি ঠাকুরের কাছে টাকার কথা বল-না কেন? তুমি চাইলেই তিনি সব অভাব দূর ক'রে দেবেন।

গৌরীমা নীরব রহিলেন।

মা পুনরায় ঐ কথা বলিলে গৌরীমা উত্তর করিলেন,—আমি যে ঠাকুরের পায়ে লিখে দিয়েছি মা, টাকাপয়সা কিছু চাইব না।

না চাইলে চলবে কেন গো? ঠাকুর যখন তোমায় জ্যান্তজগদম্বার সেবায় নাবিয়েছেন, তুমি চাইলেই তিনি দেবেন।

—কিন্তু মা, আমি যে তাঁর পায়ে লিখে দিয়েছি, শুদ্ধাভক্তি ছাড়া আর কিছুই আমি চাইবো না। তোমাদের ইচ্ছে হ'লে তোমরাই আশ্রমকে দেবে, আমি চাইবো কেন?

ঈষৎ হাসিয়া শ্রীশ্রীমা জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—গৌরদাসী যখন চাইবে না, আমিই তোমাদের ভোজ্য পাঠাবো, সকলকে ভাগ ক'রে দিও। কাল খাবে, পরশু খাবে, ব'লে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় ক'রে রেখো না।

আশ্রমকার্য্যের প্রসার এবং গোয়াবাগানের বাড়ীতে স্থানাভাবহেতু ১৩২০ সালের শেষভাগে ৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে

এক প্রশস্ততর বাড়ীতে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। তথা হইতে যথাক্রমে ৫৩।১, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ৫বি, রাধাকান্ত জীউ ষ্ট্রীট এবং সর্ব্বশেষে ৭।২, বিডন রো-তে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে ১৩১৮ হইতে ১৩৩১ সাল পর্য্যন্ত ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই আশ্রমের কার্য্য চলিয়াছে। এইসময়ের মধ্যে আশ্রমবাসিনী ও ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী স্থান সঙ্কুলন হইত না।

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষাদান ব্যতীত কুমারীদিগকে সংস্কৃত এবং উচ্চ ইংরাজি শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বারাকপুর-আশ্রমেই গৌরীমা তাঁতের প্রবর্ত্তন করেন, কলিকাতায় আসিয়া আশ্রমবাসিনীদিগের জন্য আরও নানাবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীমা আশ্রমকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং অনেকবার আশ্রমে পদার্পণ করিয়া "আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তিনি অনেককে বলিয়াছেন, "গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্য্যন্ত সে উস্‌কে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।" আশ্রম গোয়াবাগানে থাকাকালে তিনি তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি আশ্রমে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আশ্রমে সেই প্রতিকৃতির নিয়মিত পূজার্চ্চনা হইতেছে।

তিনি যেদিন আশ্রমে পদার্পণ করিতেন, সেদিন আশ্রম অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমবাসিনীগণের

হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠিত। তাঁহারা স্তবসঙ্গীতাদিদ্বারা তাঁহাকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতেন এবং তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ ও অপার স্নেহাশিস লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। গৌরীমা ভোগ রন্ধন করিতেন, পূজাকার্য্য এবং ভোগ নিবেদন করিতেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। কদাচিৎ তিনি স্বহস্তে রন্ধনও করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগেন-মা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ-প্রমুখ সন্তানগণও অনেকবার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চট্টোপাধ্যায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি দেবীও বহুবার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন।

আশ্রমবাসিনীদিগের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকিত না, যেদিন মা কোন স্থানে যাতায়াতের পথে অকস্মাৎ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। গৌরীমার অনুপস্থিতিতেও তাঁহার এইরূপ শুভাগমন ঘটিয়াছে। কন্যাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে মায়ের বন্দনা করিতেন। তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া মা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, যাহাতে ধর্ম্মপথে তাঁহাদের জীবন সার্থক হয়।

আশ্রম যখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল, তখন কোন কোন সময় আশ্রমে আসিয়া মা দুই-তিন দিবস বাসও করিয়াছেন। যে-কয়েকদিন তিনি আশ্রমে থাকিতেন, যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা বহিত। অল্পবয়স্কা কন্যাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া মা

তাহাদের মাথায় তেল মাখাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, কত আদরযত্ন করিতেন। কন্যারাও মা, মা, করিয়া কয়েকদিন মায়ের স্নেহে মগ্ন হইয়া থাকিত।

আশ্রমের অন্তেবাসিনীদিগকে মা নানাবিষয়ে উপদেশ দিতেন। পাঠাভ্যাসে উত্তম ছাত্রীদিগকে তিনি উৎসাহ দিতেন, প্রশংসা করিতেন। সময় সময় কোন কোন কন্যাকে পারিতোষিকও দান করিয়াছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গে মা বলিতেন,—মেয়েরা পড়াশুনো করবে, বিদ্যালাভ করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের ছুঁচের মত বুদ্ধি ভাল নয়। তা'রা ঠকে সেও ভাল, জিতে দরকার নেই। তা'রা সরল হবে, পবিত্র থাকবে। আশ্রমের ব্রতধারিণী কন্যাদিগের সাধনভজন প্রসঙ্গে বলিতেন,—তোমরা মালাও জপবে। এতে সহজে চিত্ত স্থির হয়।

আশ্রমে মায়ের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া নানাস্থান হইতে পরিচিত অপরিচিত বহু মহিলা আসিয়া তথায় সমবেত হইতেন। অসীমের মা, কৃষ্ণভাবিনী, নগেন্দ্রবালা-প্রমুখ মায়েরা আসিতেন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা হইত। পুরুষভক্তগণও মাকে দর্শন করিতে আসিতেন।

একদিন একটি আশ্রমবাসিনী বালিকাকে মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—এই মেয়েটি নিষ্কাম। নিজেও পীড়া পাবে না, অপরকেও পীড়া দেবে না। মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল এই কন্যা আশ্রমে রহিয়াছেন, স্বভাব এখনও সরল বালিকার ন্যায়।

মাতাঠাকুরাণী যে-সকল কুমারীকে স্নেহাশিসদানে কৃতার্থ করিয়াছেন, ত্যাগ ও সেবার পথ বরণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ মায়ের আশীর্ব্বাদে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া এবং কেহ কেহ সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি আশ্রমের সেবায় নিরত রহিয়াছেন। মা তাঁহার অনেক শিষ্যশিষ্যাকে তাঁহাদিগের কন্যাদিগকে এই আশ্রমে রাখিয়া সৎশিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন।* তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সন্ন্যাসিনী হইয়া আশ্রম সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আশ্রম কলিকাতায় আসিবার পর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ী রাখা হইয়াছিল। গৌরীমা এই গাড়ীতে করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানে এবং বিভিন্ন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। গৌরীমা ঘোড়াটির নাম রাখিয়াছিলেন 'সারদেশ্বরীদাস'। ঘোড়াটি ছিল দুরন্ত, একদিন গাড়ী উল্টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। তাহা

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র—

পোঃ বাগবাজার, ১৯ জানুয়ারী, ১৯১২

তোমার পত্র হস্তগত হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম।...তোমার কন্যাকে শ্রীমতি গৌরদাসীর নিকট রাখিয়াছ, জানিয়া সুখী হইলাম, তাহার মঙ্গল হইবে। অধিক আর কি লিখিব, আমার শুভাশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—

শ্রী৺সন্নিধানে সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষীণি তোমার মা

শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী ঐ ঘোড়াটিকে বিদায় করিয়া একটি ভাল ঘোড়া ক্রয়ের পরামর্শ দিলেন। গৌরীমা অবিলম্বে ইহাকে বিদায় দিলেন। আশ্রমের তখন অর্থাভাব, ঘোড়াটিকে বিক্রয় করিলে বিনিময়ে কিছু অর্থলাভ হইত। কিন্তু 'সারদেশ্বরীদাস'কে তিনি বিক্রয় করিলেন না, পিঁজরাপোলে পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে কাঁটাপুকুর সেন-পরিবারের দানে আর একটি ঘোড়া ক্রয় করা হইল। নূতন ঘোড়ার গাড়ীটি সর্ব্বপ্রথম মাতাঠাকুরাণীর ব্যবহারের জন্য লইয়া যাওয়া হইল। গাড়ীতে আরোহণকালে মা ঘোড়াটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন 'রামদাস'। এই ঘোড়াটি ছিল শান্ত এবং সে দীর্ঘকাল আশ্রমের সেবা করিয়াছিল।

শ্যামবাজারে অবস্থানকালে আশ্রমের হিতৈষিগণ আশ্রমের স্থায়ী ভবনের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিবার সঙ্কল্প করেন। উদ্দেশ্য —তাহার উপর যে-কোন উপায়ে অতিসাধারণ রকমের একটি বাড়ী তুলিতে পারিলে বাড়ী-ভাড়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়া মাতাজীও জমি-ক্রয়ে সম্মত হইলেন।

ভাড়া-বাড়ীর নানাপ্রকার অসুবিধার কথায় গৌরীমা একটি হিন্দি দোঁহা বলিতেন,—

"ঐসা ঠাম ন বৈঠনা জো কোই বোলে উঠ্।
ঐসী বাত ন বোলনা জো কোই বোলে ঝুট॥"

মাতাঠাকুরাণীও আশ্রমের জন্য একখানি বাড়ী অথবা কিছু জমি ক্রয় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গৌরীমাকে উৎসাহ দিতেন।

তিনি প্রত্যুত্তরে বলিতেন, "মা ব্রহ্মময়ী যখন আশ্রমের জন্য ভাবছেন, তখন আর ভাবনা কি ?"

জমির জন্য গৌরীমা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থের সংস্থান না থাকিলেও একমাত্র ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। টালা, উল্টাডাঙ্গা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মাণিকতলা প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে জমির সংবাদ আসিতে লাগিল এবং জমি দেখাও হইল। কিন্তু কোনটাই মাতাজীর মনোমত হইল না। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, মাতাঠাকুরাণীর বাসভবন এবং গঙ্গার সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে আশ্রমের একটু ভূমি হয়। কিন্তু সেরূপ কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে একদিন পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ আসিয়া শ্যামবাজারে একটি জমির সন্ধান দিলেন এবং নিজেই একদিন আগ্রহ করিয়া গৌরীমাকে তাহা দেখাইয়া আনিলেন। স্থানটি দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল এবং শ্রীশ্রীমাও অনুমোদন করিলেন। জমির পরিমাণ প্রায় চারি কাঠা।

জমি ক্রীত হইলে গৌরীমা তাহা দেখাইতে মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া আসিলেন। তিনি জমিতে পদার্পণ করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "খাসা জমি, বেশ বাড়ী হবে। মেয়েরা সুখে থাকবে।" তাঁহার এইরূপ আশীর্ব্বাদে গৌরীমার মনে উৎসাহ বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। সেইদিবস পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্যসহ একটি রৌপ্যাধার স্বহস্তে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া মাতাঠাকুরাণী আপনিই আপনার পূজামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরীমা তাঁহাকে সেইস্থানেই

মিষ্টিমুখ করাইয়া বলিলেন, "এই তো আশ্রমের বাস্তুপূজা আর দেবীর অধিবাস হ'য়ে গেল।"

তিনি অনেক চেষ্টায় এবং নিজের দায়িত্বে কয়েকজন মহাপ্রাণ সন্তানের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ২৬ নং মহারাণী হেমন্ত-কুমারী ষ্ট্রীট-স্থিত (তৎকালীন ২২।৬ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট) ঐ জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। ক্রমে দুই দিকে প্রশস্ত রাস্তা বাহির হওয়ায় জমির অবস্থিতি খুবই সুন্দর হইয়া গেল।

১৩১৮ সালে একদিন সন্ধ্যাকালে সৌম্যদর্শনা এক মহিলা গোয়াবাগানের আশ্রমে আগমন করেন। বেশভূষায় কোনই আড়ম্বর নাই,—পরিধানে সাধারণ একখানি শাড়ী, হাতে দুইগাছি শাঁখা, সীমন্তে সিন্দূররেখা। তিনি আসিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীমা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার এক মেয়ে আছে, নাম গৌরীপুরী। গোয়াবাগানে তাঁর আশ্রম, তুমি সেখানে যেও মা। তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে প্রাণে শান্তি পাবে।"

প্রথমদিনই মহিলা সরল ব্যবহারে সকলকে আপন করিয়া লইলেন। বিদায়কালে একজন আশ্রমবাসিনী বলিলেন, "ভারী আনন্দ হলো, দিদি, মাঝে মাঝে চিঠি লিখবেন ত?"

মহিলা বলিলেন, "লিখবো বৈ কি, দিদি, নিশ্চয়ই লিখবো। সে যে আমারই সৌভাগ্য।"

"আপনার ঠিকানা কি?"

"সরোজবালা দেবী, গৌরীপুর, আসাম' লিখলেই আর কোন

গোল হবে না," বলিতে বলিতে দীনতার মাধুর্য্যে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশ্রমবাসিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি রাণী?" নিতান্ত লজ্জা ও কুণ্ঠার সহিত তিনি উত্তর করিলেন, "দিদি, আমি কেউ নই, সামান্য নারী মাত্র। আপনাদের পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হ'তে এসেছি।"

ইনি আসাম-গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী।

রাণী সরোজবালা অতিশয় উন্নত চরিত্রের নারী ছিলেন। দয়া এবং ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বিলাসিতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা এমনই প্রবল ছিল যে, সাধারণ গৃহস্থবধূরাও তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাজসজ্জা করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে রাণীমা প্রায়ই আশ্রমে আসিয়া গৌরীমার নিকট সাধনভজন বিষয়ে উপদেশ লাভ করিতেন।

এই মহাপ্রাণা মহিলার প্রদত্ত অর্থকে ভিত্তি করিয়াই আশ্রমের বর্ত্তমান নিজভবনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখা যায়, এই শুভ আরম্ভের মূলেও ছিল সিদ্ধিদায়িনী মাতাঠাকুরাণীরই প্রেরণা। আজ সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল আশ্রমের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীই নিত্য অন্নপূর্ণারূপে অন্ন বিতরণ করিতেছেন, সারদারূপে জ্ঞান দান করিতেছেন, আর জগদ্ধাত্রীরূপে সর্ব্ববিঘ্ন হইতে আশ্রমকে সতত রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেদিন দক্ষিণেশ্বরে গৌরীমাকে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গিনী করিয়া দেন, সেদিন হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাতা এবং কন্যার মধ্যে নিবিড় আপন-ভাব ক্রমশঃ নিবিড়তর হইয়াছে। গৌরীমা গভীর শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ভগবতীজ্ঞানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করিতেন, বিবিধ উপচার তাঁহাকে নিবেদন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। কখনও একখানি উত্তম বস্ত্র, কখনও একটি সুস্বাদু ফল, কখনও-বা কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন পাইলে তিনি অতি আগ্রহের সহিত তাহা লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাকে অর্পণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। মাতা এবং কন্যা মিলিত হইলে ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিত, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উভয়ে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সময় কিরূপে অতিবাহিত হইত তাহা কেহই বুঝিতেও পারিতেন না।

কোনও প্রকার সমস্যা মনে উদিত হইলে, নূতন কোন অনুষ্ঠেয় বিষয় উপস্থিত হইলে, গৌরীমা সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীমায়ের নিকটে তাহা নিবেদন করিয়া তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য গৌরীমা বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন, নিঃসংশয়চিত্তে তাহা পালন করিতেন এবং তাহাতেই শুভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মাতা এবং কন্যার মধ্যে নিঃসঙ্কোচভাব সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাদিগের মধ্যে যে কি-এক মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা

ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কন্যার নিষ্ঠাভক্তি এবং কর্ম্মশক্তির সুখ্যাতি করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃহৃদয় গৌরব বোধ করিত। যে-সকল ভক্তিমতী মহিলা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহাদিগের অনেককে গৌরীমার নিকটে যাইতেও বলিয়া দিতেন।

গৌরীমার বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।" আরও বলিতেন "গৌরদাসী কি মেয়ে? ও ত পুরুষ। ওর মত কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ী, ঘোড়া সব করে ফেললে। ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়'—সেই ত পুরুষ। গৌরদাসীকে বলতেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।" *

দক্ষিণভারতে ভ্রমণকালে তথাকার মহিলাগণ শ্রীশ্রীমাকে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলে সেখানেও গৌরীমার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি লেকচার দিতে জানি না, যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।"* আবার তাঁহার তেজস্বিতা এবং স্পষ্টবাদিতার কথায় শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিতেন, "তোমার ভয়ে সব ঠিক থাকে, মা।"

ঠাকুরের তিরোধানের পর ভক্তসন্তানগণের আগ্রহে শ্রীশ্রীমা কলিকাতা নগরী এবং ইহার উপকণ্ঠে মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন;

* শ্রীশ্রীমায়ের কথা

আবার সময় সময় জন্মভূমি—বাঁকুড়া জিলায় জয়রামবাটীর শান্তস্নিগ্ধ পল্লীতে গিয়াও থাকিতেন। সুযোগ পাইলেই গৌরীমা তাঁহার নিকট যাইয়া কিছুদিন থাকিতেন। কলিকাতা, বৃন্দাবন, জয়রামবাটী, পুরী, কোঠার প্রভৃতি স্থানে এইরূপে তিনি দীর্ঘকাল মায়ের সঙ্গে বাস করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনমানসে একবার যোগেন-মা ও তাঁহার গর্ভধারিণী, গোলাপ-মা এবং নিকুঞ্জবালা দেবী গৌরীমার সহিত কলিকাতা হইতে তারকেশ্বর হইয়া পদব্রজে জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। আর একবার গৌরীমা তারকেশ্বর হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগর হইয়া লেখিকাকে সঙ্গে লইয়া মাতৃদর্শনে গিয়াছিলেন।

গৌরীমার প্রতি মায়ের স্নেহের কথায় বেলুড়ের এক ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিকুঞ্জবালা দেবী বলিয়াছেন,—বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জ্জির বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে অবস্থানকালে একদিন গৌরীমাকে একটি বৃশ্চিক দংশন করে। সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের কি ব্যাকুলতা! সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই, গৌরীমার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন।

উদ্বোধন-ভবনে গৌরীমার পায়ে একবার অস্ত্রোপচার হয়। তাঁহার বাম পায়ের গাঁটে কঠিন কড়া পড়িয়াছিল। তাহারই পার্শ্বে একটি আব হয়, ক্রমে তাহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিলে সারদানন্দজী চিকিৎসক ডাকাইলেন। পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হইল যে, অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা ইহা সারিবে না।

মাতাঠাকুরাণীর সম্মতিতে তারিখ স্থির হইল। একতলায়

গৌরীমার পশ্চাদ্দিকে বসিয়া মা তাঁহার মস্তকে জপ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল অস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তখন মা এবং গৌরীমা উভয়েরই নয়ন মুদ্রিত। গৌরীমা যন্ত্রণায় শিশুর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলে মা নয়ন মুদ্রিত অবস্থাতেই তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে পুরীধামের একটি ঘটনা বলিয়া গৌরীমা খুবই আনন্দ অনুভব করিতেন।— একদিন মন্দিরে ঠাকুরদর্শনের পর শ্রীশ্রীমা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, অক্ষয়বটের মূলে সন্তানগণকে লইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া গৌরীমা এবং গোলাপ-মা তৎক্ষণাৎ 'আনন্দবাজার' হইতে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি স্বহস্তে স্তরে স্তরে প্রসাদ সাজাইয়া রাখিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহার পর সকল সন্তানকে প্রসাদের চতুর্দ্দিকে বসিতে বলিয়া শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "তোমরা এখন সকলে একটু একটু মহাপ্রসাদ আমার মুখে দাও।" সন্তানগণ একে একে মায়ের মুখে প্রসাদ দিলেন। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী মাতাঠাকুরাণীও তাঁহাদের মুখে প্রসাদ দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সন্তানগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

একবার দুর্গাপূজার সময় বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আকাঙ্ক্ষা

করিয়াছিলেন, মাঠাকরুণ যদি পূজার দিনে তাঁহার বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলা দেন তবেই তাঁহার পূজা সার্থক হইবে। শ্রীশ্রীমা ঐ সময় বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। অসুস্থতা-নিবন্ধন গিরিশচন্দ্রের পূজামণ্ডপে মা উপস্থিত হইতে পারিবেন না, সকলের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। গিরিশের প্রাণ তথাপি 'মা, মা,' করিয়া কাঁদিতেছিল। মহাষ্টমী পূজার দিন সন্ধ্যার পর গৌরীমাকে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "আমার মন টানছে, গিরিশ যে আমায় বড্ড ডাকছে।" গৌরীমা সোৎসাহে বলিলেন, "ভক্তের প্রাণের টান, চল-না মা একবার।"

তখন শ্রীশ্রীমাকে লইয়া গৌরীমা এবং কয়েকজন মহিলা পায়ে হাঁটিয়াই গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমাকে সেদিন এভাবে নিজের গৃহে পাইয়া গিরিশচন্দ্র আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে জবাপদ্ম-বিল্বপত্র অঞ্জলি দিয়া বলিলেন, "আজ গিরিশের পূজা সার্থক, গিরিশের জীবন ধন্য!"

১৩১৬ সালে কলিকাতার অন্তর্গত শান্তিনাথতলায় বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ীতে গৌরীমা কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছিলেন। একদিন দুপুর বেলা ঐ বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তিনি একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখেন, শ্রীশ্রীমা আসিয়াছেন। আজ তাঁহার পরিধানে একখানি গেরুয়া বসন, মাথার কেশ আলুলায়িত, চলন অতি দ্রুত,—সবই অস্বাভাবিক রকমের! ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "ও মা গৌরি,

তুমি এখানে থাক ? আমি তোমার কাছেই এলুম।" তাঁহাকে এমন অসময়ে একা এই বেশে আসিতে দেখিয়া গৌরীমা বিস্মিত-চিত্তে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন, "ওমা, কি ভাগ্যি, তুমি এসেছ! এখানে বসো মা।" তাহার পর ডাকিতে লাগিলেন, "ও আশু![১] ও কেনা![২] তোরা কোথা গেলি সব শীগ্‌গির আয়। মা ঠাকরুণ যে এসেছেন।"

শ্রীশ্রীমা বাধা দিয়া বলিলেন, "কারুকে ডেকো না, ঘরে চল।" এই বলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, গৌরীমাও নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। ঘরে আসিয়াই তিনি গৌরীমাকে মাটীতে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুই-হাতে ঝাড়িতে লাগিলেন। গৌরীমা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় একদৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঝাড়া শেষ করিয়া মা তাঁহাকে বলিলেন, "মা, তুমি ভেবো না, আমিও চারটিখানি নিয়ে চললুম।" তিনি ফিরিয়া চলিলেন। গৌরীমা তাঁহার পশ্চাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে জনৈকা বালিকা লেখাপড়া করিতেছিল। সে গৌরীমার যাওয়া এবং আসা দেখিল, কিন্তু ইতোমধ্যে কি-যে ঘটিল, তাহার কিছুই বুঝিল না। গৌরীমা সেদিন একটা আবেশের মধ্যে রহিলেন, কাহারও সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারিলেন না।

(১) আশুতোষ চৌধুরী (২) নীরদমোহিনী দেবী

সেইদিনই তাঁহার প্রবল জ্বর হইল এবং পরের দিন সারাদেহে বসন্তের গুটিকা প্রকাশ পাইল।

ওদিকে উদ্বোধন-ভবনে শ্রীশ্রীমায়েরও ঐ সময় বসন্ত হইল। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গৌরীমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "মায়ে ঝিয়ে ভাগাভাগি ক'রে রোগভোগ নিয়েছেন, আমরা তার কি করব!"

শ্রীশ্রীমা রোগশয্যা হইতে তাঁহার বালিকা-শিষ্যার জন্য চিন্তিত হইয়া স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা শরৎ, গৌরদাসীর ত ঐ অবস্থা, ওখানে জায়গাও কম, খুকীকে এখানে এনে রাখ!" এদিকে গৌরীমাও রোগযন্ত্রণার মধ্যেই বালিকাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, "ছাখ্, আমি মরে গেলে তুই কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাবি নি; মাঠাকরুণের কাছে গিয়ে থাক্‌বি।" রোগের অবস্থা দেখিয়া বালিকা সেইস্থানে থাকিয়াই দামোদরের পূজা করিত এবং গৌরীমার পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিত।

গৌরীমার রোগ এমন ভীষণ অবস্থা ধারণ করে যে, চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে রোগের ভীষণতা অনেকটা উপলব্ধি হইবে,—

"বসন্তের দানা এত বড় বড় এবং এত বেশী হইয়াছিল যে, কোথাও আর ফাঁক ছিল না। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের ধারের ফোস্কাগুলি গলিয়া এমন এক অবস্থা হইল যে, আঙ্গুলগুলি সব বুঝি জুড়িয়া এক হইয়া যায়। মা ডাক্তারী চিকিৎসা করাইবেন

না। গেলাম ডাক্তার শশী ঘোষের কাছে। তাঁহার নির্দ্দেশমত কচি কলাপাতায় জলপাই তেল মাখিয়া হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে দিয়া রাখিতাম। অসুবিধার জন্য মাঝে মাঝে মা বকাবকি করিতেন, অনুনয় বিনয় করিয়া মাকে ঠাণ্ডা করিতাম।

"আমি সব সময় মায়ের নিকট থাকিতাম, আমি কখনও অনুপস্থিত থাকিলে আশু সেবায় থাকিত। মা এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, উঠিতে পারিতেন না। অতি ধীরে তাঁহাকে বসাইতাম। আমার গায়ে পুঁজরস লাগিয়া যাইত। মা বলিতেন, তোর কিছু হবে না, ভয় করিস নি।"

"একদিন দেখি, বলছেন, ও কে, কে ? বললাম, কাকে ডাকছ মা ? তিনি বলিলেন, লক্ষ্মীদিদি এসেছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, তবে আর ভয় নাই মা, এবার তুমি শীগ্‌গিরি সেরে উঠবে।"

আশুতোষ চৌধুরীর গর্ভধারিণীও গৌরীমার রোগে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া দিবারাত্র এমন অক্লান্তভাবে সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীমা এইজন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার মেয়ের যা সেবা করলে মা, এ জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাবে।" গৌরীমাকে এইভাবে সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দও তদীয় শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ সেনকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। গৌরীমার আরও কয়েকজন ভক্তসন্তান এবং আত্মীয় এইসময় তাঁহার সেবায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

মঙ্গলময় ঠাকুরের ইচ্ছায় গৌরীমার জীবন রক্ষা পাইল।

আরোগ্যলাভের পর শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রায় আড়াই মাস উদ্বোধন-ভবনে বাস করেন।

"গৌরীমা স্বভাবতঃ আনন্দময়ী এবং কৌতুকপ্রিয়া ছিলেন। একদিন বালিকাসুলভ কৌতূহলবশতঃ মা তাঁহাকে বলেন,—সময় সময় তুমি যেমন পুরুষবেশে ঘুরে বেড়াতে, সে-রকম বেশ একদিন করো, যা'তে আমরা কেউ না চিনতে পারি।

"কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। অকস্মাৎ গৌরীমা একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। সেইদিনই অপরাহ্নে পশ্চিমদেশীয় এক সাধু মাতৃভবনে উপস্থিত হইলেন, পরিধানে আলখাল্লা ও পাগড়ি। সেবকগণ এই আগন্তুককে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার একটি লাঠির প্রয়োজন ছিল; একজন সেবককে তিনি বলিলেন,—Where is my stick? Where is my stick? কণ্ঠস্বর হইতে সেবক বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুক কে। লাঠি আনিবার ছলে তিনি দ্রুতপদে গিয়া মাকে বলিয়া দিলেন, গৌরমা পুরুষসাধুর বেশে এসেছেন। মায়ের নিকট ঐ বেশে উপস্থিত হইলে মা বলিয়া উঠিলেন,—চমৎকার, চমৎকার হয়েছে! উপস্থিত সকলেই আনন্দকোলাহল করিতে লাগিলেন।

"এত শীঘ্র এবং সহজেই সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহাতে সেই সেবকের উপর গৌরীমার সন্দেহ হইল, বলিলেন,—এই ছোঁড়া, তোরই এ কম্ম! তুই কেন এসে আগে থেকেই সব বলে দিলি? তৎপর মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, আর একদিন হবে'খন।"

এইসময়ে গৌরীমা এক ব্রত উদ্‌যাপন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নিয়মিতরূপে চণ্ডীপাঠ করিতেন এবং প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার সময় নবম্যাদি কল্পারম্ভের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ দিবস বিধিমত চণ্ডীপাঠ এবং হোম করিতেন। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন কোন দিন সমগ্র চণ্ডীপাঠ করা সম্ভব না হইলে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া তিনি নিয়ম রক্ষা করিতেন। চণ্ডীপাঠের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "কলিকালে চণ্ডীপাঠ মহাযজ্ঞ।"

উদ্বোধন-ভবনে থাকাকালে এই বৎসর শারদীয়া পূজায় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর সমক্ষে তিনি প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ করেন। মহানবমী তিথিতে দক্ষিণান্তে হোম সমাপনকরতঃ শ্রীশ্রীমায়ের চরণযুগলে অষ্টোত্তরশত রক্তকমল অঞ্জলি প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, "মা, আজ আমার চণ্ডীপাঠের ব্রত উদ্‌যাপন হলো, সর্ব্বার্থসাধিকা চণ্ডীর সামনে চণ্ডীপাঠ ক'রে। এর পরও পাঠ করবো, তুমি যখন যেমন করাবে।"

ইহার কিছুদিন পর শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন। গৌরীমাও বসিরহাটের ভক্তগণের আহ্বানে তথায় গমন করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যোপলক্ষে।*

* গৌরীমার প্রতিষ্ঠিত বসিরহাটের সেই বালিকা বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া বর্ত্তমানে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহিবৃন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে।

জয়রামবাটী হইতে মাতাঠাকুরাণীর ফিরিতে অতিশয় বিলম্ব দেখিয়া কলিকাতায় ভক্তগণ অধীর হইয়া উঠিলেন। মাতৃগতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মা আসিলেন না। অতঃপর সারদানন্দজী গৌরীমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে স্বামিজী তাঁহাকে বলেন, "মাঠাকরুণের জন্যে নতুন বাড়ী তৈরী হলো, কিন্তু তিনি যে জয়রামবাটী থেকে আর আসতে চাইছেন না। তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তেরা সকলে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। তুমি নিজে গিয়ে যেমন ক'রে হোক মাঠাকরুণকে নিয়ে এসো, গৌরমা ; এ আর কারুর কর্ম নয়।"

সারদানন্দজী এবং ভক্তগণের ব্যাকুলতা বুঝিয়া গৌরীমা জয়রামবাটী গমন করেন, সঙ্গে ছিলেন লেখিকা। * বিষ্ণুপুর হইতে তাঁহারা গরুর গাড়ীতে কোতুলপুর গিয়াছিলেন। সেখানে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি সাধুসজ্জন দেখিলেই পরম শ্রদ্ধাসহকারে নিজগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সেবাযত্ন করিতেন। গৌরীমার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় দামোদরের পূজা এবং ভোগ সম্পন্ন

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ আন্দুড়, ১৩ জুন, ১৯১০

এখানে গৌরমাতা ও দুর্গা পংছিয়াছেন * * * আমাকে উহারা লইয়া জাইব বলিয়া বসিয়া আছেন বোধ হয় ১০ রোজ আগামি মাহার কলিকাতায় জাইব।

করিয়া গৌরীমা জয়রামবাটী রওনা হইলেন। সেখানে মাতা এবং কন্যার সাক্ষাতের বিবরণ বড়ই কৌতুকপ্রদ।—

সেইদিন জয়রামবাটীতে এক সাধুর আবির্ভাব হইল,—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে এক লাঠি। সঙ্গে তাঁহার অনুরূপ এক চেলা। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সহোদর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইয়া দিদিকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "দেখ গো, তোমার এক মাদ্রাজী ভক্ত এসেছে।"

এদিকে সাধুও বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃ-জায়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সাধু তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। একে অপরিচিত পুরুষমানুষ, তাহাতে অন্তঃপুরের মধ্যে, তাহার উপর অসময়ে ভিক্ষা চাওয়া,—ভ্রাতৃজায়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাধুকে গালমন্দ আরম্ভ করিলেন, "আ মরণ, ভিক্ষের আর জায়গা পেলে না? এ ভর সন্ধ্যেয় গেরস্তের বাড়ীর মধ্যে এসেছ ভিক্ষে চাইতে!"

সাধু তাহা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া এক-পা দুই পা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহিলাও ভয়ে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিলেন, পশ্চাৎ দিকে সরিতে সরিতে একস্থানে ঠেকিয়া পড়িলেন। তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো ঠাকুরঝি, শীগ্‌গির এসো, একটা বেটাছেলে অন্দরে ঢুকেছে।"

চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত



লেখিকা ও গৌরীমা



গৌরীমা লেখিকা রাধারাণী শ্রীশ্রীমা সুশীলা কুসুম বির মা

হইলেন। শ্রীশ্রীমাও আসিলেন এবং সাধুকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সাধু অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমা আরও বিস্মিত হইলেন। সাধু তখন মাথার পাগড়িটা একটানে খুলিয়া ফেলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীমা বিস্ফারিতনেত্রে গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা গৌরদাসী! আমি যে সত্যি চিন্‌তে পারি নি। খুকীকেও চিন্‌লুম না! ধন্যি মেয়ে বাপু তোমরা!" বাড়ীতে হাসির রোল পড়িয়া গেল। গৌরীমা ছোটমামীকে বলিলেন, "ভর-সন্ধ্যে বেলা কি এমনি ক'রেই পরদেশী সাধুকে গেরস্তের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়, ছোটমামী!"

এই সময়ে জয়রামবাটীতে পঞ্চানন ব্রহ্মচারী, শৌর্য্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পীতাম্বর নাথ, লীলাবতী দেবী, শতদলবাসিনী দেবী-প্রমুখ ভক্তের সমাগম হয়। তাঁহারা নিত্য মায়ের দর্শন ও উপদেশ লাভ এবং মায়ের সেবা করিয়া পরম আনন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে গৌরীমা লক্ষ্য করিতেন, মাতাঠাকুরাণীর পরিশ্রমের অন্ত নাই। গৃহকর্ম্ম এবং ভক্তদের জন্য রন্ধনাদিও অনেকসময় তাঁহাকেই করিতে হয়। কোনদিন অধিক রাত্রিতে ভক্তসমাগম হইলে, তাঁহাদিগের জন্য মাকেই আহার্য্যাদি প্রস্তুত করিতে হয়। গৌরীমা ভাবিলেন যে, মামীদের মধ্যে কেহ মায়ের নিকট দীক্ষা লইলে ঠাকুরসেবার সুবিধা হইবে,

মায়ের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। প্রসন্নমামার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী সুবাসিনী দেবীর নিকট গৌরীমা দীক্ষার প্রস্তাব করিলেন।

প্রসন্নমামার পুত্র শ্রীমান গণপতি মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছে,—"আমার গর্ভধারিণীর মুখে শুনেছি,—তিনি এবং আমার বড়মা এবং আমাদের পরিবারের সকলেরই গৌরীমার উপর অতিশয় ভক্তি বিশ্বাস ছিল। আমাদের পিসিমাও গৌরীমার কথা মানতেন। গৌরীমা একদিন আমার মাকে বলেন, আমাদের মা-ঠাকরুণকে তুমি ঠাকুরঝি মনে করো না। তিনি সাক্ষাৎ মা সীতা, ভগবতী। তাঁর কৃপা হলে তোমার ইহকাল পরকালের কল্যাণ হবে। মা-ঠাকরুণের কাছে তুমি দীক্ষা নাও। তাঁর সেবা যত্ন কর। মাকে যেন রান্নাভাঁড়ার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে না হয়, তুমি এসবের ভার নাও। এতেই তোমার ছেলেপুলেরও কল্যাণ হবে।

"আমাদের পরিবারে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কারণে পিসিমা নিজের বংশে কা'কেও দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু গৌরীমার কথায় পিসিমা আমার মাকে দীক্ষা দিলেন।"

বড়মামী যখন নিকটে থাকিতেন, মাতাঠাকুরাণীর যথাসাধ্য সেবাযত্ন করিতেন। তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মা একদিন বলিয়াছিলেন, "এটিকে গৌরদাসী জুটিয়ে দিয়েছে।"

"জয়রামবাটী অঞ্চলের কয়েকটি সন্তান সাধুব্রহ্মচারী হইয়া যাওয়ায় কাহারও কাহারও মনে আশঙ্কার উদয় হয় যে,

মাতাঠাকুরাণীর প্রভাবে দেশের ছেলেরা সাধু হইয়া যাইবে। দীক্ষিত সন্তানদের পত্নীরা যে মাতাঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া প্রণাম দণ্ডবৎ করিবে, ধর্ম্মকথা শুনিবে, ইহাতেও অভিভাবকগণ কেহ কেহ আপত্তি করিত, এমন-কি সামাজিক শাসনের ভয়ও দেখাইত। কিন্তু মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিছু বলিবার মত সাহস তাহাদের ছিল না। কারণ তিনি জগজ্জননীরূপে সকলকে স্নেহাশিস বিতরণ করেন, অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে সকলকে অসময়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি পল্লীবাসীদের পূজনীয়া পিসিমা।

মাতাঠাকুরাণী একদিন কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমাকে জানাইলেন, দেখ মা, এখানকার কেউ কেউ বলে কি-না, ছেলেদের আমি সব সাধুসন্ন্যিসী ক'রে দিচ্ছি, অজাতকে মন্তর দিচ্ছি। আমার কাছে এলে না-কি লোকেদের জাত যাবে!

তাঁহার এই কথা শুনিয়া গৌরীমা বলিলেন,—তোমার কাছে সন্ন্যাস পাওয়া তো মহাভাগ্যের কথা মা। ক'টা লোক সাধু-সন্ন্যিসী হ'তে পারে? আর জাতপাতের যিনি মালিক, তাঁর কাছে এলে জাত যাবে, কে বলে এমন কথা? আচ্ছা, দেখছি আমি। এই বলিয়া মাকে দণ্ডবৎ করিয়া সেইদিনই গৌরীমা তাঁহার দামোদরশিলাকে কণ্ঠে ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সমাজপতিদের সঙ্গে অবিলম্বে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পথেই র— এবং ক—এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। র— গৌরীমাকে বলেন,—মা, আমি শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা পেয়েছি,

অথচ আপনার বৌমাকে কিছুতেই একবার শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন করাতে আনতে পারছি না। আমার শ্বশুর শাসাচ্ছেন আমাকে, ভয়ে আমি ছুটোছুটি করছি।

ক—ও তাঁহার নিজের অবস্থার বর্ণনা দিয়া বলেন, গৌরমা, বাড়ী ছেড়ে যেতে দিচ্ছে না, গ্রামের প্রধানরা আমায় ভয় দেখাচ্ছে। আপনার আশ্রমে আমার স্ত্রীকে কি আশ্রয় দিতে পারেন?

গৌরীমা আশ্বাস দিয়া বলেন,—তোমরা কেন ভাবছো? এক্ষুণি আমি যাচ্ছি মোড়লদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, চলো আমার সঙ্গে।

ঐ অঞ্চলে কোয়ালপাড়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গৌরীমা তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ অঞ্চলের প্রধানদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিনী মাতার আহ্বানে অনেকেই আসিলেন। গৌরীমা তাঁহাদের নিকট ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর মহিমা ব্যাখ্যান করিলেন। দীক্ষিতদিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত, তাহাদের পক্ষে যে সস্ত্রীক যাইয়া গুরুমাতার চরণ-বন্দনা অবশ্য কর্ত্তব্য, একথাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন।

গৌরীমা আরও বলিলেন,—তোমাদের মধ্যে কা'রা এমন কথা প্রচার করছ যে, মা-ঠাকরুণের কাছে গেলে জাত যাবে? এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা ব'লে তোমরাই ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হ'চ্ছ। নিজের দেশের লোক ব'লে যাঁর স্বরূপ চিনতে পারছ না, তিনি সামান্য নারী নন, তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, জগতের কল্যাণে নারীদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যা' করছেন, তোমাদের সমাজের কল্যাণের জন্যেই করছেন। যে তাঁকে বুঝবে, সে উদ্ধার পাবে।

তেজোময়ী সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিয়া শ্রোতারা সকলে নির্ব্বাক। র-এর শ্বশুর এবং আরও একজন অগ্রসর হইয়া গৌরীমাকে বলিলেন,—মা, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা মা-ঠাকরুণকে সত্যি বুঝতে পারিনি। কাল সকালে তাঁর চরণে উপস্থিত হ'য়ে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

পরদিবস বিরুদ্ধ সমালোচকগণ মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

কোয়ালপাড়ার ভক্তগণের আহ্বানে গৌরীমা আর একদিন তথায় গিয়া ঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া আসিলেন। তাঁহার উৎসাহবাণীতে চারিদিকে নব উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। ইহার পর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে অধিক সংখ্যায় নরনারী মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে আসিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, "গৌরী যে ঠাকুরের কথায় এদেশ ভাসিয়ে দিলে!"

জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া গৌরীমার কলিকাতায় ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং তিনি এইসময় গৌরীমাকে দুইখানি পত্র লেখেন। স্বামিজীর ব্যাকুলতাপূর্ণ দ্বিতীয় পত্রখানি পাইয়া গৌরীমা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

* "সারদা-রামকৃষ্ণ"

পথে কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া আহারাদি এবং বিশ্রাম করা হইল। সেখান হইতে বিষ্ণুপুর উপস্থিত হইলে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া যৎপরোনাস্তি বিনয়-সহকারে বলিলেন, "মা, তোমার অপেক্ষায় আমি কতকাল ব'সে আছি। একবার গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তোমার পায়ের ধূলো দিতে হবে।" কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অন্যপ্রকার ব্যবস্থা থাকায় তখন ব্রাহ্মণের গৃহে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। বিষ্ণুপুরে অন্য এক পরিচিত ভক্তের বাড়ীতে গিয়া তাঁহারা উঠিলেন। সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকলে রেল-ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পুনরায় আসিয়া তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। জনৈক সন্তান ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, "এখন আর কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না, সময়ে কুলোবে না।" ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে পরবর্ত্তী রেলগাড়ী ধরা যাইবে না, অনেকেরই এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনের দিকেই চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বিফলমনোরথ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে করুণাময়ী মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ ব্যথিত হইল; অথচ এতগুলি লোক যাইয়া রেলগাড়ী ধরিতে না পারিলে অনেকরকম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি কোন কথা বলিলেন না।

ব্রাহ্মণ এইবার অভিমানে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় শেপো না, ওদের বল।" তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরীমা

বলিলেন, "মা, তোমার যদি যাবার ইচ্ছা থাকে, তবে তা' বল। ব্রাহ্মণের বাড়ী হয়েই যাওয়া হোক, ভক্তের চোখের জল পড়ছে।" শ্রীশ্রীমায়ের ইঙ্গিত পাইয়া গৌরীমা গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন, "গাড়ী ফেরাও।" পূর্ব্বোক্ত সন্তান পুনরায় সতর্ক করিয়া দিলেন, "কাজটা কিন্তু ভাল হলো না, গৌরমা, শেষে গাড়ী ফেল হবে।" গৌরীমা গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "গাড়ী কিছুতেই ফেল হবে না, তুমি দেখে নিও।"

ভক্ত ব্রাহ্মণের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। তাঁহার পূজিতা 'মৃন্ময়ী' দেবীর দর্শনে সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্তি-সহকারে কতকগুলি ফল আনিয়া শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। তিনিও পরম আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন, এবং এই সৌভাগ্যের জন্য গৌরীমার নিকট বারংবার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইস্থান হইতে ফিরিবার সময় শ্রীশ্রীমা কহিলেন, "গৌরমণি, এই দেবীকে দর্শন করতে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন। কিন্তু কত বছর কেটে গেল দর্শন করা হয় নি। এবার মা, তোমার জন্যে সেটি হলো।"

ইহারই কয়েকদিনমাত্র পূর্ব্বে জয়রামবাটীতে ঠাকুরের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হ'য়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গিয়ে দেখি, তিনি ঘুমুচ্ছেন। ভাবলুম, ঘুম ভাঙ্গাবো না; আবার মনে হলো, কিন্তু খেতে যে দেরী হয়ে যাবে। পরক্ষণেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগে উঠে বললেন, 'দেখ গা, এক দূরদেশে গিছলুম। সেখানকার লোক সব

সাদা সাদা। তা'রা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা পাবে না, তোমায় তা'রা দেখতে আসবে।”

সেই দিনই ঠাকুর বলেছিলেন, “বিষ্টুপুরের মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন করো, আমি দেখেছি, ভারী জাগ্রত।”

মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ষ্টেশনে যাইয়া শুনিলেন, গৌরীমার কথাই সত্য, গাড়ী তখনও আসে নাই। শ্রীশ্রীমা এবং ভক্তগণ ইহাতে খুবই আনন্দিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে পাইয়া দীনদুঃখী কুলীমজুর অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গৌরীমা তাহাদিগকে বলিলেন, “জানকীমায়ীকে প্রণাম কর।” শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া সেই সরলপ্রাণ ভক্তগণ কেহ কেহ ভাবাবেগে কাঁদিতে লাগিল। করুণাময়ী তাহাদিগকে নাম-দানে কৃতার্থ করিলেন। নিকটেই ছিল একটা ফুলের গাছ, গৌরীমা কতকগুলি ফুল আনিয়া তাহাদিগের হাতে দিয়া তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে বলিলেন। তাহারা ভক্তিভরে তাহাই করিল। শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় সকলে সম্মিলিতকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন “জানকীমায়ীকী জয়!”

গৌরীমার নিকট যাঁহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে অথবা দীক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়া আসিতেন, তিনি তাঁহাদের অনেককে মাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া যাইতেন।

“শ্রীশ্রীমায়ের কথা”য় শৈলবালা দেবী লিখিয়াছেন, “শ্রীশ্রীমার

বাটীতে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথমে গৌরী মা দোতলায় যান; আমরা তাঁহার পরে যাই। উপরে গিয়া দেখিলাম, গৌরী মা আস্তে আস্তে মার সহিত কি বলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কি কথা হইল জানি না, শ্রীশ্রীমা গৌরী মাকে বলিলেন, 'তুমি সেদিন সুরেনের বৌকে নিয়ে এসেছিলে, আজ এই বৌমাকে এনেছ, তোমার এই কাজ।' এই কথা শুনিয়া গৌরী মা জোরে বলিলেন, 'দেবে না ত কি? এসেছ কিসের জন্যে?' তাহা শুনিয়া মা আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তবে এস মা, এখন সময় ভাল আছে।"

"মা আমাকে পূজার আসনে বসাইলেন এবং আমাকে দিয়া ঠাকুরের পূজা করাইলেন। পরে ঘরের ভিতর হইতে গৌরী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌরদাসি, কোন্ ঠাকুর দেব?' গৌরী মার কথামত আমার দীক্ষা হইল। আমি পূর্ব্ব হইতেই জপ করিতাম। মা আমাকে জপ করিতে বলিলেন; কিন্তু তখন আমার শরীর ও মনের অবস্থা এমন হইল যে, জপ করিতে পারিলাম না। মা নিজে আমার কর ধরিয়া জপ করাইলেন। তারপর ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইল। গৌরী মা ভিতরে আসিলেন ও আমাকে মার পায়ে ফুল দিতে বলিলেন। আমিও তাহাই করিলাম।"

শ্রীমতী রাধারাণী হালদার তাঁহার গর্ভধারিণী নগেন্দ্রবালা দেবীর দীক্ষাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করেছিলেন এবং

তাঁদের খুব ভক্তি করতেন। * * * আমার মায়ের অনেক রকম গুণ ছিল, ধর্ম্মজ্ঞানও ছিল। মাঠাকুরাণীর কাছে মধ্যে মধ্যে যেতেন ও তাঁর উপদেশ শুনতেন, কিন্তু দীক্ষা নেবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। এজন্য বাবা দুঃখু করতেন।

"গৌরীমাকে মধ্যে মধ্যে বাবা অনুরোধ করেন, তিনি যাতে এ বিষয়ে আমার মাকে কিছু উপদেশ দেন। গৌরীমা মাকে বলেন, 'বৌমা, তোমার এত গুণ, এত ভক্তি, তুমি মাঠাকুরাণীর কাছে দীক্ষা নাও, তোমার ভাল হবে।' মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'দীক্ষা নিলে কি আর বেশী হবে, মা? গুরুকে যদি সাধারণ মানুষের ওপরে ভাবতে না পারি, তবে শুধু শুধু একটা মন্তর নিয়ে কি হবে? বলুন আপনি।' গৌরীমা বলেন,—'মাঠাকুরাণীর মন্ত্রের কত শক্তি তুমি তা জান না। সে মন্ত্র জপ করলে তোমার মনের সব সন্দ সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।' মা একথার কোন প্রতিবাদ করলেন না, স্বীকারও করলেন না।

"এরপর একদিন গৌরীমা আমার মাকে নিয়ে গঙ্গাস্নান শেষ করে মাঠাকুরাণীর বাড়ী গেলেন। মাঠাকুরাণী তখন পূজো করছিলেন। দুজনেই বসে তাঁর পূজো দেখতে লাগলেন। মা আরও কতদিন মাঠাকুরাণীর কাছে গেছেন, কিন্তু আজ তাঁর কাছে বসে, তাঁকে দেখে মায়ের মনে কেমন নতুন ভাব হতে লাগলো। দীক্ষা সম্বন্ধে নিজস্ব ভাব যেন বদলে যাচ্ছে, পুরোনো জগৎ পেছনে ফেলে এক নতুন জগতে তিনি প্রবেশ করছেন।

"পূজো শেষ হলে গৌরীমা মাঠাকুরাণীকে ইসারায় কি

বললেন। মাঠাকুরাণী আমার মাকে সেদিনই দীক্ষা দিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে প্রথম দিনই মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। প্রাণের আবেগে গৌরীমাকে বলেছিলেন, 'আপনি যে আমার কি করলেন, আমি বলতে পাচ্ছি না।' প্রণাম শেষ করে বিদায় নেবার সময় মাঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, 'মা, তুমি সংসারে থাকবে বটে, তবে খড়ুলী নারকেলের মত থাকবে, আসক্তি হবে না।'

"কিছুদিনের মধ্যেই খুব খুসী হয়ে বাবা একদিন গৌরীমাকে বলেছিলেন, 'গৌরমা, আপনি যে কি যাদু করে দিলেন, এখন দেখছি ইনি আমাকে পেছনে ফেলে দিনকে দিন এগিয়েই যাচ্ছেন।' গৌরীমা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বাবা, কার কেমন আধার, আমরা দেখলেই বুঝতে পারি। মাঠাকরুণ তো সেদিনই বলে দিয়েছেন,—সংসারে থেকেও বৌমা যোগিনী হবে।"*

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কালীপদকে একদিন গৌরীমা বলেন, "চল কালী, আসল কালীর কাছে তোকে নিয়ে যাবো আজ।" কালীপদ তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই আসল কালী কোথায়?

গৌরীমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মা, তোমার এই ছেলেকে এনেছি, একে কৃপা কর।"

* "সারদা-রামকৃষ্ণ"

দর্শনমাত্রই মা বুঝিলেন, কালীপদ ধর্ম্মলক্ষণযুক্ত সন্তান। গৌরীমার প্রদর্শিত আসল কালীর স্নেহস্পর্শ লাভ করিয়া কালীপদের হৃদয়ও এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সেইদিনই তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল।

গড়পার অঞ্চলে শীতলামাতার এক পূজারী ব্রাহ্মণ গৌরীমাকে অতিশয় ভক্তিবিশ্বাস করিতেন। মায়ের পূজারী হইলেও তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। একদিন গৌরীমার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—মাগো, বৃন্দাবনধামে গিয়ে ব্রজেশ্বরী রাধারাণীকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তোমার সঙ্গে একবার যেয়ে দেখবো।

গৌরীমা একদিন ব্রাহ্মণকে লইয়া মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাকে দেখাইয়া বলিলেন,—এঁকে ভাল ক'রে দেখ, স্বাভীষ্ট দেখতে পাবে।

ইনি তো মানুষ! সংশয়ে দোদুল্যমান-চিত্ত ব্রাহ্মণ মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন মাতার মুখারবিন্দ। দর্শন আর শেষ হয় না। অবশেষে, পুনরায় মায়ের চরণবন্দনা করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "বন্দে রাধাং আনন্দরূপিণীং, রাধাং আনন্দরূপিণীং, রাধাং আনন্দরূপিণীম্।"

ভক্তিমতী মায়েরা একদিন মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখ হইতে ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন,—ঠাকুর বলতেন, "দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, কালীঘাটের কালী, আর

খড়দার শ্যামসুন্দর,—এঁরা জ্যান্ত। হেঁটে চ'লে বেড়ান, কথা কন, ভক্তের কাছে খেতে চান।" সকলে আবেদন জানাইলেন, মায়ের সঙ্গে তাঁহারা কালীঘাটে মা-কালী দর্শনে যাইবেন। মা তাহাতে সম্মত হইয়া গৌরীমাকে একদিন কালী দর্শনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। গৌরীমা সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রামলালদাদা, শিবরামদাদা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সপত্নীক মাষ্টার মহাশয়-প্রমুখ অনেক ভক্ত কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিত হইলেন এবং মা-কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

গৌরীমা স্বয়ং ভোগরন্ধন করিয়া মা-কালীকে নিবেদন করেন। প্রসাদ পাইতে অপরাহ্ণ হইল। ভোগের জন্য নিরামিষ ব্যবস্থাই তিনি করিতেন। একে মা-কালীর প্রসাদ, তদুপরি বহুবিধ প্রসাদের সমাবেশ এবং গৌরীমার পরিবেশন,—মাতাঠাকুরাণী এবং সাঙ্গোপাঙ্গগণ পরিতোষসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আর একদিন খড়দহে শ্যামসুন্দর-দর্শনে যাওয়া হইল। মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে গেলেন স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং আরও কয়েকজন সন্তান।

শ্যামসুন্দরের ভোগরাগের পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। গৌরীমা পরিবেশন করিতেছেন, এমনসময় লক্ষ্মীদিদি একখানি সুমধুর কীর্ত্তন করিলেন। পরম আনন্দে অতিবাহিত হইল দিনটি।

একবার জন্মাষ্টমী তিথিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যে-পুষ্করিণীতে ঠাকুর পাদ-

প্রক্ষালন করেন, গৌরীমা তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'রামকৃষ্ণকুণ্ড'। সেইদিন তথায় ঠাকুরকে লইয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদবধি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মহাতীর্থে পরিণত হয়। অদ্যাপি প্রতিবৎসর সেই উৎসব প্রতিপালিত হইতেছে।

একদিন মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের দুই কন্যা—বিষ্ণুবিলাসিনী ও বিষ্ণুমানিনী আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে যোগোদ্যানে পদার্পণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। কাঁকুড়গাছি উদ্যানে মা যাইতেছেন, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নির্দ্ধারিত দিবসে অনেক ভক্ত নরনারী ও সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইল। লক্ষ্মীদিদি এবং চপলা-নাম্নী এক ভক্তিমতীর সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হইলেন। পূজা ভোগরাগের পর মাতাঠাকুরাণী এবং সমবেত মহিলাবৃন্দের মধ্যে গৌরীমা প্রসাদ পরিবেশন করেন। রামচন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের ভক্তি ও আন্তরিকতায় আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন হইল এই মাতৃবন্দনা উৎসবটি। কন্যাদ্বয়কে মা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইভাবে আরও কয়েকবৎসর আনন্দে অতিবাহিত হইল। শ্রীশ্রীমা ১৩২৩ সালের জন্মতিথির পর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পল্লীভবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইল না। বাতের কষ্ট তো ছিলই, তদুপরি মধ্যে মধ্যে জ্বরেও আক্রান্ত হইতেন। তথাপি পরবর্ত্তী জগদ্ধাত্রীপূজা মায়ের নূতন বাটীতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। তদুপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ভক্ত মাতৃদর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে থাকে। নিজের দেহসম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন, ইদানীং আরও উদাসীন হইয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া এইসময় গৌরীমা জয়রামবাটী গমন করেন। স্থানীয় চিকিৎসায় মায়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইতেছে না এবং দেহসম্বন্ধে তাঁহার উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া গৌরীমা কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী সারদানন্দকে সকল অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। চিকিৎসকগণসহ সারদানন্দজী অবিলম্বে জয়রামবাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সারদানন্দজী তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। কিন্তু মা কলিকাতায় ফিরিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ মায়ের দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পুনরায় সারদানন্দজী জনৈক চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া মায়ের দেশে গমন করেন। তাঁহার এবং ভক্তগণের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিয়া ১৩২৫ সালের প্রথম ভাগে মা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১৩২৬ সালে শ্রীশ্রীমায়ের দেহ আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। চিকিৎসায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং স্থূলদেহে লীলাসম্বরণ করিবার ইঙ্গিতও তিনি প্রকাশ করেন।

একদিন গৌরীমাকে মা বলেন, "আমার ত যাবার সময় হ'য়ে

এলো, * * দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে রেখো। পাঁচখানা বাতাসা নিত্য ভোগ দিলেই হবে।”

গৌরীমার আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই লীলাসম্বরণ করিবেন। তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরসেবা এবং আশ্রমের নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত অধিকাংশ সময় তিনি লেখিকা এবং কোন কোন আশ্রমকুমারীসহ শ্রীশ্রীমায়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

আহারে অরুচি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, যে-খাদ্য মায়ের নিকট রুচিকর বলিয়া মনে হইত, চিকিৎসকগণ তাহার অনেক কিছুতেই আপত্তি করিতেন। মহাপ্রয়াণের চারি-পাঁচ দিন পূর্ব্বে গৌরীমার নিকট তিনি আনারস খাইতে চাহিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহাতেও আপত্তি করিলেন। মায়ের অভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারায় গৌরীমা প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন।

লোককল্যাণে শ্রীশ্রীমায়ের দেহ যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইল। স্বামী সারদানন্দ পূজা এবং শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন। গৌরীমা কালীঘাটে কালীপূজা এবং আশ্রমে চণ্ডীপাঠ ও নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন। শ্রীশ্রীমা বলিলেন, “তোমরা দুঃখু করো না, আমায় যেতে হবে।”

ধীরে ধীরে অজগরগতিতে কালরাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার মহানিশায় পরমা প্রকৃতি মহেশ্বরী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী মহাসমাধিযোগে তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত নিত্যধামে মিলিত হইলেন।

গৌরীমা শোকবিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। শত শত মাতৃহারা সন্তানের বুকফাটা আর্ত্তনাদে মাতৃভবন যেন মথিত হইতে লাগিল।

পরদিবস অগণিত নরনারী বেলুড়মঠ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দিব্য দেহের অনুগমন করেন। স্বামী সারদানন্দের নির্দ্দেশানুযায়ী লেখিকা মায়ের অভিষেক করেন। পুণ্যপ্রবাহিণী ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে মাতাঠাকুরাণীর ঘৃতচন্দনানুলিপ্ত পুষ্পমাল্যশোভিত শ্রীঅঙ্গখানি দেখিতে দেখিতে হোমশিখায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সন্তানের কল্যাণে, জগতের কল্যাণে এতকাল যিনি করুণাপরবশ হইয়া নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, আজ সেই করুণাময়ী মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহেন, আজ তিনি ধ্যানগম্যা।

তাঁহার পরম পবিত্র অস্থিভস্মের কিয়দংশ বহন করিয়া গৌরীমা শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

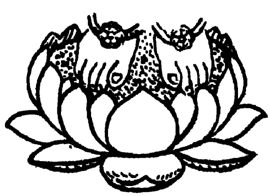
এতদুপলক্ষে আশ্রমে কয়েকদিবসব্যাপী মহোৎসব হয় এবং শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর অস্থিপ্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণ ও অন্যান্য ভক্তগণ যোগদান করেন, এবং বেদপাঠ, হোম, কালীকীর্ত্তন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সম্বর্দ্ধনা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

যে মহাশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গৌরীমা মাতৃজাতিসেবার ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যাঁহার পবিত্র নামে এই আশ্রম উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহার অশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া

আশ্রম সর্ব্বতোভাবে ধন্য হইয়াছে, সেই শক্তিরূপিণী কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমাতৃদেবী আজ স্থূলদৃষ্টির অন্তরাল হইয়াছেন। নিদারুণ এই মাতৃবিয়োগ-ব্যথা কত গভীরভাবে মাতৃগতপ্রাণা কন্যাকে আঘাত করিয়াছিল তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। গৌরীমার নিজের লেখনীমুখে তাঁহার অন্তঃস্তলের যে বেদনা প্রকাশ পাইয়াছিল, সাধারণ সাহিত্যের বিচারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও, ভক্তিসাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা সমুজ্জল হইয়া থাকিবে। এই শোকগাথার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—

ওরে রে দারুণ প্রাণ, কেন দেহে রৈলে।
পাছু গোঙারিয়া মার সঙ্গে নাহি গেলে॥
আজ শূন্য ভুবনে শূন্য পরাণে, কেন-বা আছি জানি না।
মণিহারা ফণী, বিনে সেই মণি, বাঁচে কি অমনি শুনি না॥
জগতে ভারতে মোদের বরাতে সেই শ্রীপাদপদ্ম লুকাইল।
বসুন্ধরা যাঁর চিহ্নে ভূষিতা, ত্রিভুবনারাধ্য যাঁর পাদপদ্ম ছিল॥
তাঁহার আরাধ্য ও-পাদপদ্ম আর কি হৃদয়ে ধরিব।
আপন হাতে দিয়ে জবাঞ্জলি আর কি সে-পদে পূজিব॥
স্নেহ মূর্ত্তিমতী তোমার মূরতি আর কি নয়নে হেরিব।
রাধাদামোদর-চাঁদের প্রসাদ আর কি তোমারে খাওয়াব॥
আর কি তোমার আশ্রমে আসিয়া মধ্য আসনে রাজিবে।
চারিদিকে সব তোমার কিঙ্করী তোমারি গুণ গাহিবে॥
শ্রীপদ পূজন করিয়া স্তবন অন্ন ভোগ আদি সঁপিব।
সবারে লইয়া ভুঞ্জিবে জননী, হেরি' আপনা ভুলিব॥

আচমন করাইয়া পদ ধোয়াইব।
লইয়া মাথার কেশ মোছাইয়া দিব॥
(এসেছিলে যবে মাগো আশ্রমে তোমার).
পদ ধোয়াইতে দুটি আঁখে ঝরে জল।
তাহাতেই ধৌত ভেল শ্রীপদযুগল॥
আর না হেরিব স্মরি' দিয়ে নিজ জল
নয়ন ধোয়ায় বুঝি ও-পদকমল॥



আশ্রমের প্রসার ও পরিচালনা

আশ্রমের ভূমিক্রয়ের পরও কয়েকবৎসর অর্থাভাববশতঃ গৃহ-নির্ম্মাণের কোনপ্রকার আয়োজন সম্ভব হয় নাই। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্দ্ধানহেতু গৌরীমা ঐ কার্য্যে দুই বৎসরকাল মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে আশ্রমের হিতৈষিগণের আগ্রহাতিশয্যে তিনি এবং আশ্রমের বর্ত্তমান সম্পাদিকা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গৃহনির্ম্মাণের অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে আসাম-গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী তাঁহার পুত্রবধূ এবং কন্যার শিক্ষার ভার লইবার জন্য আশ্রমকে অনুরোধ করেন। আশ্রমের মাতৃসঙ্ঘের অনুরোধে সম্পাদিকা তাঁহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষাদানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিতে তিনি অস্বীকৃত হন।

কিছুদিন পর রাণীমার নির্দ্দেশক্রমে গৌরীপুর হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই গৌরীমার নামে দশ হাজার টাকা আসিয়া উপস্থিত হইল। আশ্রমের তৎকালীন অবস্থায় কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, এইভাবে এককালে এত টাকা পাওয়া যাইবে এবং ফলে গৃহনির্ম্মাণের কার্য্য এত শীঘ্র আরম্ভ হইতে পারিবে। সেই একান্ত অভাবের দিনে রাণীমাতার প্রদত্ত দশ হাজার টাকা নিতান্তই শ্রীশ্রীমায়ের দান মনে করিয়া সকলে উৎসাহিত হইলেন।

১৩৩০ সালের জগদ্ধাত্রী পূজার দিন এক শুভক্ষণে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসহকারে গৌরীমা আশ্রম-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। বৃদ্ধবয়সেও আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণকল্পে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। বহুদিন এমন ঘটিয়াছে যে, ঠাকুরের পূজা সম্পন্ন করিয়াই অর্থসংগ্রহে বাহির হইয়াছেন এবং সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন, অভুক্ত অবস্থাতেই সমস্তদিন অতিবাহিত হইয়াছে। কেহ ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, কেহ কথায় সহানুভূতি জানাইয়াছেন, কেহ-বা বিমুখ করিয়াছেন। কিন্তু গৌরীমা সেই অমৃত ও গরল হাসিমুখে পান করিয়া মাতৃজাতির সেবায় দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন।

গৃহনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবার অল্পদিনের মধ্যেই সংগৃহীত অর্থ নিঃশেষ হইয়া গেল। মালমসলার সরবরাহকারিগণ এবং মিস্ত্রীরা তাহাদের প্রাপ্যের জন্য উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। অথচ গৌরীমার নিকট সঞ্চিত অর্থ কিছুই নাই। এইরূপ অবস্থায় ঋণ করিতে হইল; অন্যথা অর্থাভাবে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় এবং মিস্ত্রীদের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। কেহ কেহ গৃহনির্ম্মাণকার্য্য বন্ধ রাখিতে পরামর্শ দিতেন। গৌরীমা এইসকল কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বলিতেন, যদি তোমরা মনে কর, একাজ তোমার আমার চেষ্টায় চলছে, তবে ভুল বুঝেছ। যাঁর কাজ তিনিই চালাচ্ছেন, আমি তাঁর যন্ত্র মাত্র।

এইরূপ অর্থাভাবের সময় একজন গৌরীমাকে বলিয়াছিলেন,

কাদা চটকাতে চটকাতে দেহটা যে ক্ষয় ক'রে ফেললেন মা, আপনার ঠাকুর এখন কোথায় ? তাঁর জল-ঢালা কি ফুরিয়ে গেছে ?

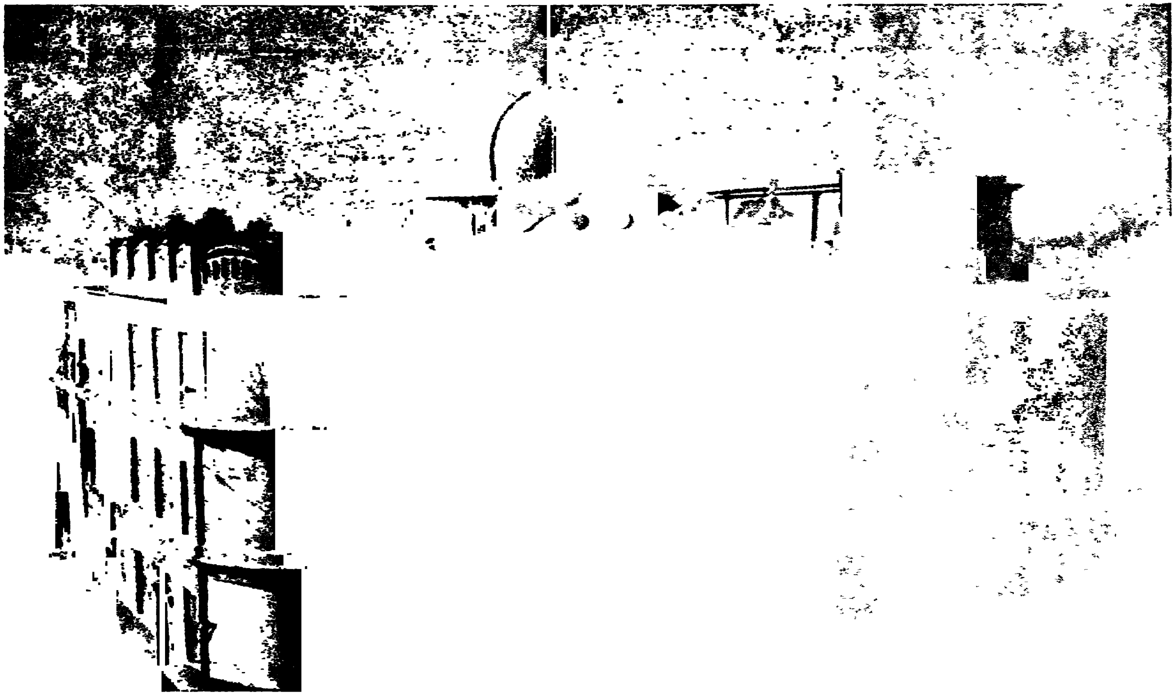
গৌরীমা ক্ষুব্ধ হইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—তোদের ভারী অবিশ্বাসী মন। আশ্রম যে চলছে এসব কি তোরা ক'রে দিলি ? না, আমি করলুম ? সবই ঠাকুর-মাঠাকরুণ করাচ্ছেন।

গৌরীমার বিশ্বাস ছিল অটল ; অভাব-অভিযোগ দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁহার মনে নৈরাশ্যের অবসাদ আসিতে পারে নাই। ঠাকুর তাঁহাকে জ্যান্ত জগদম্বার সেবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, মা-সারদা দিয়াছেন প্রেরণা, তাঁহারাই দিবেন কার্য্যে সিদ্ধি। গৌরীমা ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেন না, জানিতেন, তাঁহার ঠাকুর জল ঢালিবেনই।

ভূমিক্রয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌরীমা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার না করিয়াই নীরবে আশ্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। যদিও ইহার পূর্ব্বে আশ্রমের বিষয় স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেও প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি তখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আশ্রমের যথোচিত প্রচার ছিল না ; ইহা গৌরীমার অভিপ্রেতও ছিল না।

গৃহনির্ম্মাণ-উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় হিতৈষি-গণের পরামর্শানুসারে এইসময়ে আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী দেশবাসীর জ্ঞাতার্থ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-





শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম-ভবন, কলিকাতা

মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাবিনোদ, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার-প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ আশ্রমের সাহায্যার্থে দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান।

১৩৩০ হইতে ১৩৩৩ সালের মধ্যে আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন মাননীয় বিচারপতিদ্বয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ, এড্‌ভোকেট জেনারেল সতীশরঞ্জন দাশ, ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু-প্রমুখ মাননীয় ব্যক্তিগণ আশ্রমের সহিত পরিচিত হইলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যেদিন আশ্রমে আগমন করেন, আশ্রমবাসিনীগণের স্বহস্তপ্রস্তুত একটি খদ্দরের কোট তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের শিল্পকার্য্যে নিপুণতার প্রশংসা করেন এবং কোটটি মাথার উপর রাখিয়া সরল বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে মাতাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" স্বদেশীযুগের পূর্ব্ব হইতেই মাতাজী আশ্রমে তাঁতের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিস্মিত এবং প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এইসময়ে একদিন আশ্রমে গৌরীমার

নিকট বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। আশ্রম তখন বিডন রো-তে অবস্থিত। সেদিন তিনি ঠাকুরের পূজার উদ্দেশ্যে কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী এবং গৌরীমার জন্য কয়েকখানি কাপড় সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। আশ্রমকুমারীগণ সাংখ্যবেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন জানিয়া এবং তাঁহাদিগের প্রস্তুত কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি শিল্প-দ্রব্যাদি দেখিয়া স্বামিজী আনন্দ প্রকাশ করেন।

ঐদিন আশ্রমকুমারীগণ স্বামিজীকে স্বহস্তপ্রস্তুত একটি কোট প্রদান করেন। ঐ কোটের কাপড়ও আশ্রমের তাঁতেই প্রস্তুত। ইতঃপূর্ব্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও একটি কোট দেওয়া হইয়াছিল। কোটটি দেখাইয়া অনেকের নিকট তিনি আশ্রমকুমারীদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন। কোটের জন্য গায়ের মাপ আনিতে যে ব্যক্তি গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, চৌধুরীর মেয়েকে * বলো,—আমার কোটে যেন অনেকগুলো পকেট থাকে, শিষ্যরা প্রণামী দিলে তা'তে রাখা যাবে!

কার্য্যপরিচালনার সুবিধার জন্য দেশের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়-গণকে লইয়া এইসময় একটি পরামর্শ-সভা গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তদনুযায়ী ১৩৩১ সালে আশ্রমের প্রথম পরামর্শ-সভা গঠিত হয়। স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু (সলিসিটার), ডক্টর আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সংস্কৃত কলেজের

* স্বামী ব্রহ্মানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের এক আত্মীয়া,—শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়িকা।

তদানীন্তন অধ্যক্ষ), সতীশরঞ্জন দাশ, ডাক্তার রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর (কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব শেরিফ), স্যার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র), সুশীলচন্দ্র সেন (গভর্ণমেণ্ট সলিসিটার), রায় নগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (ডেপুটী কমিশনার, বিহার), শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি), শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত (এড্‌ভোকেট), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু (সলিসিটার), শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎ-সিংহকা (সলিসিটার)-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাতাজীর আহ্বানে আশ্রমের 'পরামর্শসভায়' যোগদান করেন।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষিতা হিন্দুমহিলাদিগকে লইয়া একটি 'মহিলা-সমিতি' গঠিত হয়। ১৩৩২ সাল হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কেবল মহিলাদিগকে লইয়া গঠিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যাগণ মহিলা-সমিতিরও সদস্যা। 'মাতৃসঙ্ঘ' অর্থাৎ ব্রতধারিণী আশ্রমসেবিকাগণও মহিলা-সমিতির সদস্যা। মাতৃসঙ্ঘের এবং আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে গৌরীমা আজীবন আশ্রমের প্রধান পরিচালিকা এবং সভানেত্রী ছিলেন।

নীরদমোহিনী বসু[১], লেডী ননীবালা দেবী[২], শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দে[৩], শ্রীযুক্তা শৈলবালা দে[৪], শ্রীযুক্তা অমিয়বালা

(১) বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ ৺গিরিশচন্দ্র বসুর পত্নী, (২) 'লেডী ব্রহ্মচারী'—ডাক্তার স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর পত্নী, (৩) পি. সি. দে, আই. সি. এস, সেসন জজের পত্নী, (৪) তদীয়া

দেবী[৫], বিভাবতী বসু[৬], শ্রীযুক্তা নন্দরাণী দেবী[৭], রাধারাণী ঘোষ[৮], সরলাবালা বসু[৯] প্রমুখ মহিলাগণ মহিলা-সমিতিতে যোগদান করেন।

আশ্রমের প্রয়োজনে উপরি উক্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ নানাভাবে সহায়তা করেন। মাতাজীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অতুলনীয় এবং আশ্রমের প্রতি আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। বিশেষ করিয়া গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে স্যার মন্মথনাথ, সতীশরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যথেষ্ট শ্রমস্বীকার-পূর্ব্বক অনেকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

এইস্থানে দাশ মহাশয়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। পরামর্শ-সভার পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ কলিকাতার এক দানশীলা মহিলার নিকট হইতে গৃহনির্ম্মাণকল্পে কয়েকসহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম যেদিন তাঁহারা ঐ মহিলার বাড়ীতে গমন করেন, মহিলার জনৈক আত্মীয় দাশ মহাশয়কে বলেন, "দাশ সাহেব, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। গৌরীমার কথা আমরা পূর্ব্বেও জানতুম। তাঁর আচারনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠোর। তাঁর কাজে আপনি কি ক'রে এসে যোগ দিলেন ?"

ভ্রাতৃবধূ, (৫) কলিকাতা ইউনিভারসিটির কণ্ট্রোলার রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের পত্নী, (৬) ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী, (৭) ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গোস্বামীর পত্নী, (৮) প্রসিদ্ধ ধনী ললিতকুমার ঘোষের পত্নী, (৯) সলিসিটার যতীন্দ্রনাথ বসুর পত্নী।

দাশ মহাশয় ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "দেখুন, জগতে এমন অনেক কাজ আছে যা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে common platform-এ (সাধারণ ভূমিতে) দাঁড়িয়ে মানুষ ক'রতে পারে। মানুষমাত্রেরই মতের এবং পথের বিভিন্নতা আছে এবং থাকবেও ; তা সত্ত্বেও আমরা মিলেমিশে অনেক কাজ করতে পারি। মাতাজীর মধ্যে এবং তাঁর কাজে এমন কিছু মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই আছে, যাতে আমার মত সাহেব এবং ব্রাহ্মকেও সনাতনপন্থী মাতাজীর জন্য আপনাদের বাড়ীতে ভিক্ষে ক'রতে টেনে এনেছে।"

একদিন এক বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে যাইবার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে স্যার মন্মথনাথ আসিয়াছিলেন। আশ্রমের কথায় বসু মহাশয় বলেন, "মাতাজী মেয়েমানুষ হ'য়ে যা করলেন, তা সত্যি আশ্চর্য্য। তিনি প্রথম যখন আমাকে জমি কেনার কথা বলেন, আমি ত বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, আশ্রম শেষটায় এত বড় হবে।" তাহাতে স্যার মন্মথনাথ বলিয়াছিলেন, "মেয়েমানুষ কি বলছেন মশায়, ক'টা পুরুষমানুষ একা অমন কাজ করতে পেরেছে ?"

স্যার কৈলাসচন্দ্র ১৩৩১ সালে আশ্রমে আসেন। স্যার মন্মথনাথ, সতীশরঞ্জন দাশ এবং রায় রসময় মিত্র বাহাদুরের অনুরোধে স্যার কৈলাস আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এবং স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা, রামদেও চৌহানী, রায় হাজারিমল দুদোয়ালা বাহাদুর-প্রমুখ দানশীল মাড়োয়ারী ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

গৌরীমার চেষ্টায় এবং দেশবাসী নরনারীর সহৃদয়তায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে আশ্রমের বর্ত্তমান প্রশস্ত ত্রিতল ভবন এবং তদুপরি দেবতার মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৩৩১ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে দেবতাসহ গৌরীমা নবনির্ম্মিত ভবনে শুভ-প্রবেশ করিয়া মন্দিরমধ্যে দেবতার আসন স্থাপন করেন।

আশ্রমভবনে প্রবেশ করিবার পরও অনেক টাকা ঋণ ছিল এবং কিছু কিছু কাজও অসম্পূর্ণ ছিল। এই অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে ১৩৩১ সালে স্যার মন্মথনাথ, চুণীলাল বসু এবং যতীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে এক সভা আহ্বান করেন। সভায় রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর বলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ধনী ব্যক্তি বহুসহস্র টাকা সৎকার্য্যে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে। গৌরীমা সেদিন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। সভাভঙ্গে চুণীলাল বসু আনন্দমনে আশ্রমে আসিয়া এই বিরাট দানের সংবাদটি মাতাজীকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া মাতাজী কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বলেন, "টাকাও অনেক, আশ্রমের অভাবও অনেক, কিন্তু বাবা, আমার মনটায় খটকা লাগছে, কিছু গোলমাল আছে। দাতার বিষয় ভাল করে জেনে দেখ ত।" কয়েকদিন পর দাতার নাম এবং অর্থোপার্জ্জনের বিবরণ জানিয়া গৌরীমা বলিয়াছিলেন, "এ রকম টাকা পঞ্চাশ লক্ষ হ'লেও আমি তা গ্রহণ করবো না।"

এইস্থানে গৌরীমার গভীর আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক আরও

একটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। আশ্রমের পরিচালনা-সমিতির তৎকালীন সদস্য কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আসিয়া জানাইলেন, তাঁহার জনৈক বন্ধু পিতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকসহস্র টাকা আশ্রমে দান করিতে ইচ্ছুক। গৌরীমা এইকথা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি লোকটির সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজখবর নাও, কালীপদ। আমার মনটা প্রসন্ন হচ্ছে না।"

কয়েকদিন পরে কালীপদ আসিয়া বলেন, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বঞ্চনা করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া গৌরীমা বলিলেন, "এই বঞ্চনার টাকা আমি নিতে পারবো না। তুমি গিয়ে তাকে বলো, আশ্রমের ভাগের টাকাটা যেন সেই বিধবাকেই ফিরিয়ে দেয়। তা'তেই আশ্রমের সেবা হবে, তারও কল্যাণ হবে।"

১৩৩২ সালে একদিন শরৎচন্দ্র বসু গৌরীমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার আসিবার সময় স্থির হইয়া গেলে আশ্রমের জনৈক সন্তান মাতাজীকে বলেন, "মা, শরৎবাবুর অন্তঃকরণ অতিশয় উদার। তিনি মাসে মাসে অনেক টাকা অভাবগ্রস্তদের দান ক'রে থাকেন। আপনি আশ্রমের জন্যে তাঁর নিকট সাহায্য চাইলে, নিশ্চয় কিছু পাবেন। ব'লতে যেন ভুলে যাবেন না, মা।"

নির্দ্দিষ্টকালে বসু মহাশয় তাঁহার জননী এবং পত্নীকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আসিলেন। সংবাদ পাইয়া গৌরীমা বাহিরের ঘরে

আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্রকে বলেন, "বাবা, তোমাদের এই বুড়ো মাকে কতকগুলি অনাথা মেয়ে পালন করতে হয়। তু'টি মেয়ের ভার তোমায় নিতে হবে।" শরৎচন্দ্র কোন প্রকার প্রশ্ন না করিয়াই পরহিতব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী মাতাজীর আদেশ তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। একবারমাত্র উপস্থিত জনৈক সন্তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুটি মেয়ের আশ্রমে থাকার খরচ কত?" তিনি বলিলেন, "মাসিক ত্রিশ টাকা।"

অতঃপর ঠাকুরের প্রসঙ্গে মাতাজীর সহিত তাঁহার অনেক কথা হইল। তিনি চলিয়া গেলে, পূর্ব্বোক্ত সন্তান মাতাজীকে বলিলেন, "আচ্ছা মা, আপনি যে প্রথমেই টাকার কথা বললেন, এতে ভদ্রলোক কি মনে করবেন?"

মাতাজী স্বভাবসুলভ সরলতার সহিত উত্তর করিলেন, "কি আর মনে করবেন; হয়ত ভাববেন, আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। আমি যদি ঠাকুরের প্রসঙ্গ বলতে বলতে পরে টাকার কথা বলতে ভুলে যেতুম, তখন তোমরাই আমায় দোষ দিতে বাপু, তার চেয়ে আগেই বলে খালাস হয়ে গেলুম।"

সদাশয় শরৎচন্দ্র তদবধি মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া দীর্ঘকাল আশ্রমে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি কেবল নিজেই সাহায্য করেন নাই, অন্যের নিকট হইতেও আশ্রমের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন। বড়লাট বাহাতুরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার আইনসদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের নিকট হইতে আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

আশ্রম-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্যে আসাম-গৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী, হেমন্তকুমারী সেন, পূর্ণশশী দাসী, চারুশীলা দাসী, নির্ম্মলাবালা দাসী, সুশীলাবালা দাসী, অনুকুলচন্দ্র সান্যাল, জ্ঞানচন্দ্র বসাক, ভূতনাথ কোলে, রঘুনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে অর্থদান করেন। এতদ্ব্যতীত নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কয়েকজন মহাপ্রাণ সন্তানও গৃহনির্ম্মাণকল্পে অনেক টাকা দান করেন।

আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পর শ্রীযুক্তা সরোজ-বাসিনী কোলে, শ্রীযুক্তা মাখননলিনী কোলে, কেশবমোহিনী দেবী, কিরণবালা সেন, বিন্ধ্যবাসিনী মিত্র, নীরদমোহিনী বসু, নীরদবালা দেবী, লেডী ব্রহ্মচারী, রাধারাণী ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা সেন, শ্রীযুক্তা তরুবালা দেবী, শ্রীযুক্তা সুশীলাবালা দেবী, অনন্ত কুমার রায়, ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রকুমার সেন এবং আরও অনেক সদাশয় ব্যক্তি কেহ অর্থদ্বারা এবং কেহ-বা নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীদ্বারা আশ্রমের দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহে সাহায্য করিয়াছেন।

গৌরীমার পরমস্নেহভাজন সন্তান নগেন্দ্রনাথ রায় নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে প্রায় দুই বিঘা পরিমিত ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি গুরুর জন্য একখানি বাড়ীও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে যাবতীয় ব্যয় নগেন্দ্রনাথ একাই বহন করেন। এই

বাড়ীর নাম 'গৌরী-নিকেতন।' মাতাজী গঙ্গাতীরের এই নির্জ্জন স্থানে যাইয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন।

বর্ত্তমান ভবনে স্থায়িভাবে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে আশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে। আশ্রমবাসিনী-দিগের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাহির হইতে প্রায় তিন শত ছাত্রী আসিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। তাঁহাদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একখানি মোটর-বাস্ ক্রয় করা হয়।

দারুণ কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও আশ্রম-পরিচালনায় গৌরীমার কার্য্যাবলী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বক্ষণে যিনি আশ্রমের কার্য্যে তন্ময়, পরক্ষণে তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে এই বিশাল কর্ম্মজগতের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঊর্দ্ধমুখী চিত্ত পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর ন্যায় সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে এই কর্ম্মকোলাহলময় সংসারে বিচরণ করিত।

আশ্রমের অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু কোনক্রমে যদি একবার সেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইলে সেই আনন্দে তিনি এমনই মগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, আশ্রমের অভাবের কথা বলিতে একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন।

একদিন স্যার কৈলাসচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছেন। স্যার কৈলাস সেদিন আশ্রমের বিষয় বলিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আশ্রমসম্বন্ধে দুই-চারি কথা

বলিবার পর ঠাকুরের কথা আরম্ভ হইল, শুনিতে শুনিতে স্যার কৈলাস এবং রসময় মিত্র মহাশয় একখানি প্রাচীন পদ গাহিলেন। প্রাচীন কবিদিগের রচিত সঙ্গীতের ভাব এবং পদলালিত্যের প্রশংসা করিতে করিতে গৌরীমা নিজেও দুইটি গান গাহিলেন।

তাহার পর স্যার কৈলাসের অনুরোধে তিনি ভাগবত হইতে তত্ত্বপূর্ণ কয়েকটি উৎকৃষ্ট শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়িজী, গীতার সারমর্ম্ম কি?" গৌরীমা তখন গীতা হইতে কয়েকটি শ্লোকের সংস্কৃত ও হিন্দী ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'সব ছেড়ে দিয়ে আমারই শরণাগত হও।' ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার এবং শেষ কথা।"

ভগবৎ-প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে গৌরীমার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার ভক্তি এবং পাণ্ডিত্যে সকলে মুগ্ধ হইলেন। মিত্র মহাশয় ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, "আহা, আজ আমাদের কি সুপ্রভাত! মা'র মুখে কি শুনলুম! ধন্য আমরা।"

আশ্রমের বহুবিধ কর্ম্মের মধ্যে গৌরীমা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতেন, এমন-কি, প্রয়োজন হইলে স্বহস্তেই তাহা সম্পন্ন করিতেন। ক্ষুদ্রবৃহৎ কোন কার্য্যই তিনি অবহেলা করিতেন না। আশ্রমের গরুঘোড়ার প্রতিও তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না।

ইহাদের দানাপানি যথাসময়ে দেওয়া হইল কি-না, ঠিকমত ডলাইমলাই হইল কি-না, এইসকল বিষয়ের প্রতি গৌরীমা নিজে লক্ষ্য রাখিতেন। সহিসের আসিতে বিলম্ব হইলে কোন কোন দিন তিনি নিজেই ঘোড়ার ছোলা এবং কুটি বহন করিয়া আস্তাবলে লইয়া যাইতেন এবং ঘোড়াকে খাওয়াইয়া আসিতেন। ইহারাও তাঁহাকে দেখিলে হ্রেষাধ্বনি করিয়া মনের আনন্দ জানাইত।

ভক্তগণ বিভিন্ন সময়ে মাতাজীকে কয়েকটি গাভী দান করেন। তিনি আদর করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে ধবলী, শ্যামলী, নন্দিনী ইত্যাদি এক-একটি নাম দিয়াছিলেন এবং ইহাদিগকে স্নেহ করিতেন। 'গাভীকে দেবীর ন্যায় সেবা করিতে হয়' বলিয়া কাহারও উচ্ছিষ্ট ফলমূল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খাইতে দিতেন না। ইহাদের কয়েকটি বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে, আশ্রমের একজন কর্ম্মী ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য মাতাজীকে পরামর্শ দিলেন। মাতাজী তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তা হ'লে অকর্ম্মণ্য বুড়ো মাকেও কি তোমরা তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে! এতদিন গরুগুলো ঠাকুরসেবার দুধ যুগিয়েছে, তোমরাও সেই দুধ অনেক খেয়েছ, এখন ওরা যতদিন বেঁচে থাকবে 'পেনসন্' পাবে।"

আশ্রমের সাধারণ কার্য্যপরিচালনা বিষয়েও, তাহা যতই জটিল এবং কষ্টদায়ক হউক না কেন, গৌরীমা কখনও চিন্তাগ্রস্ত হইতেন না, ভয় পাইতেন না ; বরং কেহ বিচলিত হইলে তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেন, "দশের কাজ কখনো নির্ঝঞ্ঝাটে চলে না,—'শ্রেয়াংসি

বহুবিঘ্নানি।' ভগবান এভাবে মানুষকে পরীক্ষা ক'রে থাকেন। এগুলি মানবজীবনের আধিব্যাধির মত অবাঞ্ছিত এবং অপ্রীতিকর হ'লেও শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পরিপোষক।"

তাঁহাকে এইরূপ নির্ব্বিকারচিত্ত দেখিয়া আশ্রম-সম্পর্কিত কোন কোন ব্যক্তির মনে কদাচিৎ প্রশ্ন উঠিত, তবে কি মা আশ্রমের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আমাদের মত আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন না? কার্য্যকালে বুঝা যাইত, এই সন্দেহ অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। আশ্রমের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে যতদূর করণীয় তাহা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রয়োজন হইলে আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু চিত্ত তাঁহার কখনও কোন কারণে বিচলিত হয় নাই।

কর্ম্মব্যপদেশে কতরকম উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হইত। কোন ছাত্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে উপরের শ্রেণীতে তুলিয়া দেওয়া না হইলে, আশ্রমে প্রবেশপ্রার্থিনী কোন বালিকাকে কোন কারণে গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইলে, অথবা কোন অভিভাবকের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিতে অস্বীকৃত হইলে, কেহ কেহ মাতাজীর নিকট আসিয়া আবদার করিয়াছেন, কেহ-বা তর্কও করিয়াছেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি আশ্রম-পরিচালনায় কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মাতাজী তাঁহাদের অবিবেচনা ও অসঙ্গত আচরণ দেখিয়া বলিতেন, নিজের মতলবে ব্যাঘাত হ'লেই মানুষ রুষ্ট হয়। বিবেকসঙ্গত কাজ ক'রে যাবে, যে যা বলে বলুক।

তিনি যাহা সত্য এবং ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন, তাঁহার মনে স্বতঃই যে-কথার উদয় হইত, স্থানকালপাত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহা সরল ভাষায় স্পষ্ট বলিয়া ফেলিতেন। আন্তরিকতাশূন্য বাহ্যিক ভদ্রতা এবং কপট আচরণ তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা, তেজস্বিতা এবং স্পষ্টবাদিতার ফলে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইতেন। তথাপি কাহারও অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। মিথ্যা এবং আদর্শহীনতার সহিত তিনি জীবনে কোনদিন আপোষরফা করিয়া চলেন নাই।

তিনি কাহারও অসঙ্গত অনুরোধে বা পরামর্শে কখনও নিজের মত এবং পথ বিসর্জ্জন দেন নাই। যাহা তিনি ভাল বুঝিতেন এবং যে-সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহার পরিবর্ত্তন কার্য্যতঃ প্রয়োজনও হইত না। তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তা আজীবন অব্যাহত রহিয়াছে এবং যথাকালে দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় এবং ভগবানে নির্ভরতাই তাঁহাকে বহুবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করাইয়া সফলতার দিকে লইয়া গিয়াছে।

বিশেষ করিয়া, মাতৃজাতির প্রতি অন্যায় এবং অবিচার দেখিলে তিনি কিছুতেই নীরব থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার বিবেক সিংহবিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিত, প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না।

একদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় গৌরীমা আশ্রমবাসিনীগণের নিকট পুরাণের গল্প বলিতেছিলেন। অদূরবর্ত্তী এক বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কেহ বিপদে

পড়িয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আশ্রমবাসিনীগণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন, অধিক রাত্রিতে পরের বাড়ীতে অযাচিত-ভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পারিবারিক কলহের মধ্যে গিয়া তিনি নিজেই বিপন্ন হইবেন। তিনি তাঁহাদের আশঙ্কায় নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, "বাইরের মেয়েদের বিপদের সময়ও আমায় গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।" আশ্রমবাসিনীগণ কতরকম যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া একটি লাঠি হাতে একাকিনী বাহির হইয়া গেলেন।

আশ্রমবাসিনীগণ দুশ্চিন্তায় পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি একটার পর দেখা গেল, গৌরীমা একটি অবগুণ্ঠিতা বধূর হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া আসিতেছেন। পশ্চাতে একজন পুরুষ মানুষ, গৌরীমা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। মাতাজীকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আশ্রমবাসিনীগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, তিনি আশ্রমে না আসিয়া সেই দুই ব্যক্তিসহ অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

গৌরীমার অনুমানই সত্য, ঘটনা বধূনির্য্যাতনের। কৌশলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষকে আইন-আদালতের ভয় দেখাইয়া তিনি সেই নিগৃহীতা বধূকে উদ্ধার করেন। সেই রাত্রিতেই পুলিশের সহায়তায় তিনি বধূকে তাঁহার

পিত্রালয়ে রাখিয়া আসেন। পরে তাঁহার মধ্যস্থতায় শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আপোষে বধূকে পিত্রালয় হইতে ফিরাইয়া লইয়া যান। গৌরীমা শ্বশুরশাশুড়ীকে সাবধান করিয়া বলেন, "পরের মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে এনেছ, তাকেও নিজের মেয়ের মতই আদরযত্ন করবে।" ইহার পরও তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ী গিয়া সংবাদ লইয়া আসিতেন, বধূটির উপর আবার অত্যাচার হইতেছে কি-না।

আশ্রমের কার্য্য-পরিচালনায় এবং সকল কার্য্যেই তিনি বলিতেন, যিনি কাজে নাবিয়েছেন তিনিই চালিয়ে নেবেন। এতে বাধাবিঘ্ন এলেও আমার কোন দুঃখু নেই, প্রশংসা পেলেও তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি নেই।

তাঁহার চিত্ত কিরূপ অহঙ্কারলেশশূন্য ছিল, যশ, সম্মান এবং প্রতিষ্ঠাকে তিনি কত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের গৌরবে নিজেকে কতটা কৃতার্থ বোধ করিতেন, তাহা আশ্রমের জনৈক অনুগত সেবক—ক—কর্ত্তৃক লিখিত নিম্নের ঘটনা দুইটি হইতে কতকটা বুঝা যাইবে।

"১৩২৭ সালে একদিন সকালবেলা আশ্রমে যাইয়া দেখি, পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাজী বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, কাছেই একখানি 'বেঙ্গলী' পত্রিকা রহিয়াছে। আশ্রমের একখানি আবেদনপত্র বিভিন্নপত্রিকায় প্রকাশার্থ আমি দিয়া আসিয়াছিলাম। 'বেঙ্গলী'তে তাহা বাহির হইয়াছে মনে করিয়া আমার ভারী আনন্দ হইল।

"কিন্তু আমাকে দেখিয়াই মা খানিকক্ষণ খুব বকিলেন। আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেন বকিলেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তখন সাহস হইল না। কেবল ইহাই বুঝিলাম, যে-কারণেই হউক মা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মাকে প্রণাম করিয়া আমি ক্ষুণ্ণমনে নলিন সরকার ষ্ট্রীটে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দুই দিন আর আশ্রমে গেলাম না।

"তৃতীয় দিনে সোদরপ্রতিম ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া জানাইলেন, মা আমায় ডাকিয়াছেন। শঙ্কিত মনেই আশ্রমে গেলাম। যাইয়া দেখি, মা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, আমাকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। প্রণাম করিতেই মা আমার মাথাটা টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, সেদিন তোমায় বকেছি, তা'তে কিছু দুঃখু করো না।'

"তাহার পর ব্যাপারটা যাহা জানিলাম তাহা এই,—বিভিন্ন পত্রিকায় আশ্রমের বিষয় প্রকাশিত হইলে আশ্রমের একজন সদস্য একখানি পত্রিকা মাকে দিয়া বলিয়া গিয়াছেন, পত্রিকায় মাতাজীর খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছে। ইহাতে মা মনে করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের নাম উল্লেখ না করিয়া পত্রিকায় তাঁহাকেই বড় করা হইয়াছে। ইহাতেই তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহাকে বলা হয় যে, পত্রিকায় ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কথাও রহিয়াছে, আশ্রমের প্রসঙ্গক্রমেই তাঁহার নামও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাতে আশ্রমের উপকারই হইবে, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

"এইরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, আশ্রমের বর্ত্তমান বাড়ীতে। গৃহপ্রবেশের দুই-চারিদিন পূর্ব্বে মা একদিন বিডন রো হইতে গৃহনির্ম্মাণের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় মায়ের নজরে পড়িল—দরজার পাশে রাস্তার দিকে একখানি সাদা পাথরে লেখা রহিয়াছে—'সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা প্রতিষ্ঠিত'। ইহা দেখিবামাত্র মা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'আমার নাম কেন বসিয়েছ এখানে?'

"আমি বলিলাম, 'তা'তে কি হয়েছে মা, বুঝতে পাচ্ছি না।'

"মা বলিলেন, 'আশ্রম মাঠাকরুণের। আমার নাম বসিয়েছ কেন?' এই বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই অপ্রসন্ন মনে তিনি গাড়ীতে ফিরিয়া চলিলেন।

"মাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া আমি গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলাম, 'মাঠাকরুণের নাম ত ওখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, মা। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রীরূপে আপনার নামও ছোট অক্ষরে লেখা হয়েছে।' তথাপি তিনি আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, 'ছোট অক্ষরেও আমার নাম দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। মা-ঠাকরুণের নাম থাকলেই যথেষ্ট।' ইতোমধ্যে মিস্ত্রীরা সেখানে উপস্থিত হইয়া কাজ সম্বন্ধে মায়ের নির্দ্দেশ চাহিল। মা রাগ ভুলিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া মিস্ত্রীদের কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন।

"তাঁহার সহিত সুদীর্ঘকালের পরিচয়ে এইরূপ আরও অনেক

ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নাম-যশ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিতে গেলেই ফল বিপরীত হইত, অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি বলিতেন, 'প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা। নিষ্কামভাবে কাজ ক'রে যাবে। যশ আর প্রতিষ্ঠাকে বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণা করবে। পরের সেবা করতে এসে যদি মনের কোণেও আত্মপ্রশংসার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তবে সাধকজীবনে তা আত্মহত্যারই তুল্য জানবে।"

গৌরীমার জন্মতিথিতে আনন্দোৎসব করিবার জন্য আশ্রম-বাসিনীগণ বহুদিন আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার জন্মতিথি বলিতে চাহিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সহিত আশ্রমবাসিনীদিগের প্রতিবৎসর মান-অভিমান চলিত। অবশেষে তাঁহাদের কাতরতাদর্শনে তিনি একদিন হাসিতে হাসিতে বলেন, "আমার জন্মোৎসব তোরা যদি নিতান্তই করবি, তবে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথিতেই করিস।" সেই অবধি নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথিতেই গৌরীমার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

কতকাল ধরিয়া আশ্রম হইতে তাঁহার একখানি জীবনী প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে তিনি আপত্তি করিয়া বলিতেন, "আমার জীবনী ছেপে কি হবে? তার চেয়ে মাঠাকরুণের একখানি জীবনচরিত লেখ। মাঠাকরুণকে লোকে এখনো চিনতে পারে নি। তাঁকে জানলে জগতের লোক উদ্ধার হ'য়ে যাবে।"

পরিচালনা-সমিতির প্রাচীন সদস্যগণ যখন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার জীবনী প্রকাশ করিলে

তাহাতে দেশের এবং আশ্রমেরও কল্যাণ হইবে, তখন তিনি আর আপত্তি করিতেন না। কিন্তু বলিয়া দিলেন যে, "আমি বেঁচে থাকতে তোমরা আমার জীবনী ছাপবে না। যদি ছাপ তা হ'লে হুজুকে লোকগুলো এসে আমাকে ভগবান ক'রে তুলবে। আমি ভগবান হ'তে চাই না, আমি তাঁর দাসীমাত্র।"

গৌরীমার জীবনের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি মনে প্রাণে জানিতেন, সকল কর্ম্মে এবং সকল সাফল্যে কেবল ভগবানের মহিমাই প্রচারিত হইবে—নিজের নাম নহে। তিনিই সব, মানুষ তাঁহার হাতের যন্ত্রমাত্র।

আশ্রম ও গৌরীমার শিক্ষা

আজ দেশের সর্ব্বত্র নারীজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, নারী-জাতির কল্যাণ ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য কত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে যখন গৌরীমা বারাকপুরের গঙ্গাতীরে মাতৃজাতির সেবাব্রতের সূচনা করেন, তখন সমাজের অবস্থা, নারীশিক্ষার ইতিহাস অন্যরূপ ছিল। আত্মবিস্মৃত ভারতের নারী ভুলিয়া গিয়াছিল যে, দৈনন্দিন গৃহকর্ম্ম ব্যতীত সংসারে তাঁহার অন্য কর্ত্তব্যও আছে, বিশাল জগতে তাঁহার মহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র আছে, তাঁহারও আত্মার জাগরণের প্রয়োজন আছে।

হিন্দুর কন্যা আকৌমার ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া, ত্যাগ ও সেবার ব্রতে দীক্ষিত হইয়া, সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবেন, তখনকার দিনে ইহা কল্পনার অতীত ছিল। যুগাবতার শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অনুপ্রাণনা একনিষ্ঠা শিষ্যার সাধনায় ধীরস্থির অপ্রতিহত গতিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম তাহারই অভিব্যক্তি। বহু দুরতিক্রম বাধা এবং প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া গৌরীমা তাঁহার তপস্যাপূত জীবন তিলে তিলে 'মাতৃসেবা-মহাযজ্ঞে' আহুতি দান করিয়াছেন।

এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে-সেবাব্রতের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, (২) এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষাব্রতধারিণীদিগের একটি সঙ্ঘগঠন,

(৩) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং বিধবাদিগকে আশ্রয় এবং
(৪) আদর্শ জীবনযাত্রার পথে নারীজাতিকে সহায়তা দান।

গৌরীমা বলিতেন, নারীর সুশিক্ষা ব্যতীত কখনও কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না, নারীই জাতির জননী। শিশুরূপে ভবিষ্যৎ জাতি জননীর ক্রোড়েই জন্মগ্রহণ করে, জননীর স্নেহধারায় সে পুষ্ট হয়, জননীর শিক্ষার উপরেই তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ নির্ভর করে। বস্তুতঃ, মাতৃজাতির মানসিক উৎকর্ষদ্বারাই যে-কোন জাতির সভ্যতা এবং শিক্ষাদীক্ষার মান নিরূপিত হইতে পারে।

কিন্তু সকল শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। প্রকৃতির অনুকূলে যে শিক্ষা, সমাজ এবং ধর্ম্মের অনুমোদনে যাহার পরিপুষ্টি, সেই শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের পথ দেখাইয়া দেয়। নারীই হউক, আর পুরুষই হউক, যে-শিক্ষা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তিনিচয়কে প্রবুদ্ধ ও সক্রিয় করে না, তাহা অর্থাগমের সহায়তা করিতে পারে, সুখ ও প্রতিষ্ঠা আনিয়া দিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিতে পারে না।

আবার, নারী-পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করিলেও শিক্ষায় ত্রুটি থাকিয়া যায়। স্নেহ, সেবা, আত্মসংযম, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি মধুর গুণাবলীর মিলনক্ষেত্র বলিয়াই হিন্দুনারী 'দেবী' আখ্যা পাইয়াছেন। তাঁহাকে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইবে। তাহা না হইলে, কুশিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।

আদর্শস্থানীয়া আচার্য্যা এবং অনুকূল পরিবেষ্টনী ব্যতীতও

শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। বাহিরের ধূলিমলিন আবহাওয়া অনেক সময় অন্তরের বিকাশকে বাধা প্রদান করে। বীজ অঙ্কুরিত হইলেও যেমন পর্য্যাপ্ত জলবায়ুতাপের অভাবে তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ সৎপ্রেরণার অভাবে মানবহৃদয়ের স্বতঃসমুদ্ভূত বৃত্তিনিচয়ও সম্যক পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর যত অধিক নির্ভর করে এমন আর কিছুতেই নহে। সেইজন্যই শিক্ষার মূলে চাই—অনুকূল আবেষ্টনী, পবিত্র মনোভাবের প্রভাব এবং সৎপ্রেরণা। এইকারণেই এমন আশ্রমজীবনের প্রয়োজন, যাহাতে শিক্ষার্থিনীগণ ধর্ম্মপরায়ণা এবং সুশিক্ষিতা আচার্য্যার সাহচর্য্যে সতত উচ্চ আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া আপনাদিগের জীবন সুগঠিত করিতে পারেন।

প্রাচীন ভারতে যে-সকল আচারনিয়ম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অনুকূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনেকাংশে গৌরীমা এই আশ্রমে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আবার, আধুনিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যাহা কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাও গ্রহণ করিয়াছেন।

বালিকাদিগকে যুগোপযোগী কল্যাণকর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি আশ্রমের মধ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেবদেবীর স্তোত্র সহযোগে প্রতিদিন বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের উপযোগী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থিনীগণ যাহাতে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ বধূ এবং সুমাতা হইয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য

রাখা হয়। শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষার্থিনীদিগের ঘনিষ্ঠ স্নেহবন্ধনের মধ্যদিয়া যাহাতে শিক্ষার আদানপ্রদান চলিতে পারে, শিক্ষা সহজ এবং মনোজ্ঞ হইয়া উঠে, তাহার প্রতি গৌরীমা লক্ষ্য রাখিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এই আশ্রমে রহিয়াছে।*

* "গৌরীমার প্রবর্ত্তিত নারীশিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থাবিধানের মধ্যে একটি অভিনব ভাবধারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা ও বিজাতীয় আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকগণ এদেশীয় নারীদিগের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিয়া মনে মনে একটা উল্লসিত গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্থানে স্থানে ইহার ভুলত্রুটি এবং অশুভ ফল প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুরুষের এবং নারীর শিক্ষা যে একই আদর্শে এবং একই পথে চলিতে পারে না, বিজাতীয় শিক্ষা যে হিন্দুর অন্তঃপুরবাসিনীদিগের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহা অনেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষা যখন হিন্দুর কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, এমনই সময় আসিলেন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, আসিলেন গৌরীমা। এই তপঃসিদ্ধা দূরদৃষ্টিসম্পন্না নারী প্রাচীন ভারতের জাতীয় আদর্শের সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাঁহার গুরুপত্নীর পবিত্র নামে ১৩০১ সালে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও জননী, আদর্শ সাধিকা ও আচার্য্যা গড়িয়া উঠিতে পারেন,—হিন্দুর সমাজকে সুশিক্ষার মধ্য দিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারেন।"

মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ("শ্রদ্ধাঞ্জলি")

অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষাকেই গৌরীমা প্রধান স্থান দিতেন। ভাষাশিক্ষার সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, এক-একটি ভাষা চরিত্রগঠনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বর্ত্তমান যুগে ইংরাজী শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা সাধারণতঃ চিত্তকে বহির্মুখী করে, আর দেবভাষা সংস্কৃত চিত্তকে অন্তর্মুখী করে। যাহারা সংযত থাকিয়া ভগবানলাভের পথে অগ্রসর হইতে চায়, তাহাদের নিয়মিত চণ্ডী এবং গীতা পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য ; তাহাতে মনের স্থিরতা জন্মে এবং শক্তির সঞ্চার হয়।

আশ্রমে সাধারণতঃ অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকেই গ্রহণ করা হয়। যে-সকল শিক্ষার্থিনী অন্তেবাসিনীরূপে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের উপরেই আশ্রমের শিক্ষার প্রভাব অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। যাঁহারা প্রতিদিন নিজ নিজ বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে আশ্রম-জীবনের সকল সুযোগ পরিপূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভবপর নহে। তথাপি কোন কোন অভিভাবক এই সুযোগ যথাসম্ভব সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে কন্যাকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রমে রাখিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে আশ্রমের নিয়ম ছিল যে, পূজা এবং গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে আশ্রমবাসিনীগণ নিজ নিজ গৃহে যাইতে পারিত। গোয়াবাগান-আশ্রমে আসিয়া মাতাঠাকুরাণী একদিন আশ্রমের বিধিনিয়মের প্রসঙ্গে বলেন, “এই-যে একবার ক’রে আমড়ার

অম্বল চাখতে বাড়ী যাওয়া, এতে আশ্রমে থাকায় যেটুকু লাভ হয়, তা' উবে যায়, এ ভাল নয়। মেয়েরা একাদিক্রমে তিন বছর বা পাঁচ বছর, আশ্রমে থেকে শিক্ষা লাভ করবে, তারপর যা'র বাড়ী যাবার ইচ্ছে সে যাবে। আর যা'রা ব্রহ্মচারী সন্নিসী হ'য়ে থাকবে, তারা ঠাকুরের চরণ ধ'রে আশ্রমেই প'ড়ে থাকবে।"

শ্রীশ্রীমা এইরূপ বিধান দিবার পর হইতে আশ্রমে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল যে, অন্তেবাসিনীদিগকে একাদিক্রমে অন্ততঃ তিন বৎসর আশ্রমবাস করিতে হইবে এবং ইতোমধ্যে আর নিজগৃহে যাওয়া চলিবে না।

আশ্রমে জীবনযাত্রার প্রণালী নানাভাবে চরিত্রগঠনের সহায়ক। বালিকাগণ সকাল এবং সন্ধ্যায় দেবদেবীর স্তোত্রাদিপাঠ ও প্রার্থনা করিয়া থাকেন; যাঁহারা দীক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার জপধ্যান করেন। বৈশাখ মাসে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকেও শিবপূজা শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমবাসিনীদিগকে গৌরীমা একপ্রকার ভজনগান শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই ভজনাবলীতে হিন্দুর দেবদেবী, মহাপুরুষ এবং তীর্থস্থানাদির বন্দনা আছে। বালিকাগণ প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় সুরসংযোগে তাহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

দুর্গা দুর্গা বল রে—

শুদ্ধভক্তিপ্রদা দুর্গা শান্তিবিধায়িনী রে
কল্যাণকারিণী দুর্গা গোবিন্দদায়িনী রে

শক্তিপ্রদায়িনী দুর্গা ভক্তিপ্রদায়িনী রে
জ্ঞানপ্রদায়িনী দুর্গা প্রেমপ্রদায়িনী রে
সুমতিদায়িনী দুর্গা দুর্ম্মতিনাশিনী রে
শিবসীমন্তিনী দুর্গা হরমনোমোহিনী রে
সুরেরে রক্ষিণী দুর্গা অসুরনাশিনী রে
সুরথে রক্ষিণী দুর্গা মেধসে রক্ষিণী রে
কমলে কামিনী দুর্গা শ্রীমন্তে রক্ষিণী রে
দ্বি-অক্ষর মহামন্ত্র সদাই জপনা রে
'গৌরী'র জননী দুর্গা দুর্গা দুর্গা বল রে
দুর্গা দুর্গা দুর্গা দুর্গা, দুর্গা দুর্গা বল রে ॥

* * * *

কালী কালী কালী কালী, কালী কালী কালিকে—
চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ড-খণ্ড-নৃমুণ্ড-মুণ্ড-মালিকে
দিগ্বসনা লোলরসনা আধ-ইন্দু-ভালিকে
শব-সুভূষণা রুধির-অশনা হিম-শৈল-বালিকে
বরাভয়-করা অসি-মুণ্ডধরা শরণাগত-পালিকে
শিবে শবাসনা হর-মনোরমা মাতৃগণ-নায়িকে
যশোদানন্দিনী উমা কাত্যায়নী বিষ্ণুভক্তি-দায়িকে।
কালী কালী কালী কালী, কালী কালী কালিকে ॥

* * * *

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রে—

ত্যাগের ঠাকুর রামকৃষ্ণ জ্ঞানদাতা বল রে
ভক্তিদাতা রামকৃষ্ণ প্রেমদাতা বল রে
সারদাজীবন রামকৃষ্ণ 'গৌরী'তাত বল রে

এস রামকৃষ্ণ বস রামকৃষ্ণ হৃদিপদ্ম-মাঝারে।
জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল রে॥

*   *   *   *

জপ গোবিন্দ তপ গোবিন্দ
ব্রত গোবিন্দ তীর্থ গোবিন্দ
প্রয়াগ গোবিন্দ পুষ্কর গোবিন্দ
পুরী দ্বারাবতী গোবিন্দ
রামেশ্বর গোবিন্দ বদরীনারায়ণ গোবিন্দ
বালাজী গোবিন্দ কুমারিকা গোবিন্দ
অবন্তিকা গোবিন্দ অযোধ্যা গোবিন্দ

*   *   *   *

দেহ গোবিন্দ গেহ গোবিন্দ
দেহের সার গোবিন্দ
সাধন গোবিন্দ ভজন গোবিন্দ
সাধনারি ধন গোবিন্দ।
পতি গোবিন্দ গতি গোবিন্দ
জীবনের সাথী গোবিন্দ
আমাদের প্রাণপতি গোবিন্দ

অন্যগতি নাইকো মোদের
আমরা যে অনন্যগতি
প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন গোবিন্দ হে ॥

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে গৌরীমার রচিত একটি পদকীর্ত্তনও এইস্থানে উদ্ধৃত হইল। বারাকপুরে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবসে এই গুরুবন্দনাটি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণী এই বন্দনাটি শুনিতে ভালবাসিতেন।

জয় সারদা-বল্লভ, দেহি পদ-পল্লব,
দীনজন-বান্ধব, দীন জনে।
অশরণ-শরণ লক্ষ্যহীন-তারণ,
কে আছে ভুবনে তোমা বিনে ॥
কিঙ্করী 'গৌরী' তনয়া তোমারি,
জানে জগজ্জনে গাথা।
সে সব স্মরিয়ে বিদরয়ে হিয়ে,
পাই হে পরাণে ব্যথা ॥
না জানি ভজন সেবন সাধন,
ভরসা কেবলি (তব) দয়া।
তাত! তাপিতায় জুড়াইতে হায়,
দেহ চরণ-ছায়া ॥
জ্বলিছে অনল বায়ুতে প্রবল,
কত-না জ্বলিবে বালা।

বাসনা-দধিতে প্রাণাপান-ঘৃতে,
হবে কি আহুতি ঢালা ॥
করিতে বাসনা না করি বাসনা,
তবু ত বাসনা বাঁধে।
(কিবা) ঘটিল বিষাদ, পরা-ভক্তি-স্বাদ
রহল জনম সাধে ॥
তুয়া ভক্ত-জন পদ-ধূলি-কণ
মস্তকে ভূষণ ধরি।
ও রাঙ্গা চরণ যাঁর প্রাণ-ধন,
সে-পদে প্রণতি করি ॥
করুণা-নিধান রামকৃষ্ণ-নাম,
বারেক জপিল যেই।
জাতি কুল তাঁর কিসের বিচার,
পরম পুণিত সেই ॥
আপনা হইতে সে জন আপন,
যে জন তোমারে ভজে।
তব পদ-প্রীতি অমিয়-বারিধি,
অগাধ কল্লোলে মজে ॥
জপ-যজ্ঞ-ধ্যান তপ-ব্রত-দান,
সর্ব্ব-তীর্থ-স্নান (সে) কৈল।
ভুলিয়ে ভুবন হারায়ে আপন,
যে জন শরণ লইল ॥

প্রেমের মূরতি, সুশান্ত প্রকৃতি,
দয়ার গঠনখানি।
জ্ঞান-ঘন-রূপ ভক্তি-রস-কূপ,
গঠিল ভাবেন্দু ছানি॥
শ্রীপদ-নলিনী কলুষ-নাশিনী
ভক্তি-প্রদায়নী জানি।
মো পুন ইছিয়া নিছিয়া লইনু
পরম সম্পদ মানি॥
সারাংশ যথায় লুকায়ে তথায়
পরাণ চিরিয়া রাখি।
মনেতে হইলে ঢাকনি খুলিয়ে
আপনা আপনি দেখি॥
দরিদ্রকো হেম, চাতককো ঘন,
ফণীয়াকো যথা মণি।
লড়ি আঁধলকো, তরী মগনকো,
পানি মীনকোহুঁ গণি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত,
অভয়-বরদ করে।
আচণ্ডালে ধরি' বলে হরি হরি
গীম-গদগদ স্বরে॥

এতদ্ব্যতীত স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র",[১]

(১) ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্॥ ইত্যাদি

স্বামী অভেদানন্দের "শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্র"[২] এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্ত্তন"ও[৩] আশ্রমের ভজনাবলীর অন্তর্গত।

আশ্রমাভ্যন্তরে মন্দিরে প্রত্যহ পূজা-পাঠ-ভোগ-আরতি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্রমবাসিনীগণই তাহা সম্পন্ন করেন। আশ্রমের আহার নিরামিষ এবং সাত্ত্বিক। আশ্রমের যাবতীয় গৃহকর্ম্ম—রন্ধনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হিসাবলিখন পর্য্যন্ত—বয়স এবং সামর্থ্যানুযায়ী, আশ্রমবাসিনী শিক্ষার্থিনী এবং শিক্ষয়িত্রী সকলকেই করিতে হয়। তাঁহাদের কাহারও পীড়া হইলে বয়স্থাগণ আপনজনের ন্যায় সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সকল অবস্থাতেই যাহাতে শিক্ষার্থিনীগণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তজ্জন্য এই-রূপ শিক্ষার সার্থকতা আছে বলিয়াই, ধনী ও দরিদ্র সকলের কন্যার পক্ষেই গৌরীমা এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন।

অবসর সময়ে বালিকাগণ খেলাধূলা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেহ ও মনের উৎকর্ষের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত উদ্যানে, কলিকাতার এবং নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন দর্শনযোগ্য স্থানে এবং দেবমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। অর্থের সংস্থান হইলে কোন কোন বৎসর তাঁহাদিগকে তীর্থক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্যকর স্থানেও লইয়া যাওয়া হয়।

---

(২) প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগত-সেবক-তোষকরীং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥ ইত্যাদি

(৩) শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম, কালাত্মক পরমেশ্বর রাম।
শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম, ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম॥ ইত্যাদি

প্রয়োজনবোধে তিনি শিক্ষার্থিনীদিগকে একদিকে যেমন শাসন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আদর করিয়া তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে পরম আদরে 'ঠাকুমা' বলিয়া ডাকিতেন এবং অতি আপনজনের ন্যায় দেখিতেন। অল্পবয়স্কা বালিকাগণ রাত্রিকালে তাঁহার পার্শ্বেই শয়ন করিত। তিনি তাঁহাদিগের সহিত খেলা করিতেন, কতরকম গল্প করিতেন, আবার কখন কখনও অভিমানও করিতেন। বালিকাদিগের সঙ্গে তিনি তখন যেন নিজেও বালিকা হইয়া যাইতেন। কোন বালিকা তাঁহার সহিত অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিলে অথবা তাঁহার কাছে না আসিলে, তিনি পয়সা অথবা সন্দেশ দিয়া তাহার অভিমান দূর করিতেন।

আশ্রমে শিক্ষাকালে শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার ভাব অঙ্কুরিত হয়, পাঠসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশুষ্ক না হইয়া তাহা পরবর্ত্তী জীবনেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাখাপল্লব বিস্তার করিয়াছে,—আশ্রমের সহিত শিক্ষার্থিনীদিগের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। গৌরীমার প্রাণস্পর্শী উপদেশ, তাঁহার পবিত্র সঙ্গ এবং তাঁহার উন্নত জীবনের প্রভাব শিক্ষার্থিনীদিগের ভবিষ্যৎ জীবনকে শান্তি এবং কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে।

সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের অনেকে নিজ নিজ পরিবারে কল্যাণ এবং শ্রী বিতরণ করিতেছেন। অনেকে নিজ নিজ দুহিতাকে এবং আত্মীয়পরিজনের কন্যাকে এইরূপ শিক্ষালাভের জন্য আশ্রমে

প্রেরণ করিতেছেন এবং অনেকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আশ্রমের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন।

আবার কোন কোন উচ্চমনোভাবসম্পন্না শিক্ষার্থিনী এই অলোকসামান্যা তপস্বিনী এবং আচার্য্যার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়া, সতত তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রপ্রভাব এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের জীবন মাতৃজাতির সেবায় উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গৌরীমা তাঁহাদিগের শিক্ষা এবং তিতিক্ষা পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত আধার মনে করিলে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষাদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমসেবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

এইসকল ব্রহ্মচারিণীর মধ্যে যাঁহারা সাধনভজনের পথে অগ্রসর হইয়া উচ্চতর আধারের বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, এবং ভগবদারাধনা, জ্ঞানচর্চ্চা ও নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম লইয়া আশ্রমে জীবনযাপন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই গৌরীমা 'মাতৃসঙ্ঘ' গঠন করেন। এই মাতৃসঙ্ঘ দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার নির্দ্দেশমত আশ্রমের সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই মাতৃসঙ্ঘই আশ্রমের স্তম্ভ, আশ্রমের প্রাণ,—মাতাজীর প্রবর্ত্তিত পথের আলোকবর্ত্তিকাবাহী।

মাতৃসঙ্ঘের ব্রতধারিণীগণ সকলেই সন্ন্যাসিনী। তাঁহাদিগের একজনকে শ্রীশ্রীমা এবং অনেককে গৌরীমা সন্ন্যাসদান করিয়াছেন। তাঁহারা আশ্রমবাসিনী কোন কোন ব্রাহ্মণকুমারীকে নারায়ণশিলা পূজা করিবারও নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। সমাজের বর্ত্তমান

অবস্থায় এইরূপ প্রথার তেমন প্রচলন না থাকিলেও ইহা একেবারে অভিনব নহে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়—সেই ত পুরুষ।" শ্রীশ্রীমাও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তারা কেবল থোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িথোড় করতে আসেনি, তা'রাও সন্ন্যিসী হ'তে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে। এ জন্যই ঠাকুর এবার স্ত্রীগুরু গ্রহণ করেছেন, মাতৃভাব প্রচার করেছেন।"

এই বিষয়ে গৌরীমা বলিতেন, "আজকাল তেমন প্রচলন না থাকলেও শুদ্ধচারিণী সাধিকার সন্ন্যাস এবং নারায়ণশিলাপূজা, এই দু'য়েরই উল্লেখ শাস্ত্রে রয়েছে।* বস্তুতঃ ধর্ম্মলাভের পথে যোগ্যতার বিচারে নারীপুরুষে কোন ভেদ নাই।" প্রব্রজ্যাকালে

(ক)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "প্রাতিমোক্ষ"-গ্রন্থের সুচিন্তিত প্রবেশিকায় হিন্দুর বহু শাস্ত্র হইতে বহুল বচন উদ্ধৃত করিয়া নারীর যোগ্যতা এবং অধিকার প্রমাণ করিয়াছেন,—

ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি নারীগণ ঋগ্বেদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। (অম্ভৃণ ঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী বাক্ সুপ্রসিদ্ধ 'দেবীসূক্তে'র ঋষি।)

ধর্ম্মশাস্ত্রকার যম বলিয়াছেন, পুরাকল্পে কুমারী কন্যাগণের উপনয়ন, বেদ অধ্যাপন এবং গায়ত্রীমন্ত্রপাঠ প্রচলিত ছিল। হারীতও এই কথা বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে ব্রহ্মবাদিনী বাচক্নবী গার্গীর নাম রহিয়াছে। শ্রীমৎ

গৌরীমাকে কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতদিগের সহিত এইবিষয়ে বিচার করিতে হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদান, আশ্রমে বালিকা ও বিধবাদিগকে আশ্রয়দান এবং কয়েকজনকে ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষাদানেই গৌরীমার সেবাব্রত সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক,—মাতৃজাতিকে আদর্শ জীবনযাত্রার পথে সহায়তাদান,

---

শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গার্গী পরিণীতা হন নাই। তিনি সংসারিণী ছিলেন না।

নারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে পরিণীতা না হইয়া, সংসারাশ্রমে না যাইয়া, আজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসিনীজীবন যাপন করিতেন, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে ইহা বহুলভাবে প্রমাণ করিতে পারা যায়।

বেদপন্থীদের অনতিপ্রাচীন সাহিত্যেও কুমারব্রহ্মচারিণী বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধযুগের ভিক্ষুণীদিগের পূর্ব্বেও যে বেদপন্থী সন্ন্যাসিনী বা পরিব্রাজিকা বর্ত্তমান ছিলেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। জৈনগণের শাস্ত্রেও সন্ন্যাসিনীগণের উল্লেখ রহিয়াছে। সন্ন্যাসিনীগণের সঙ্ঘের সৃষ্টিও বৌদ্ধযুগেই নূতন নহে।

(তন্ত্রের যুগে এবং পরবর্ত্তী কালেও হিন্দু সন্ন্যাসিনীগণের উল্লেখ দেখা যায়।)

(খ)

নারীগণের নারায়ণশিলা পূজা করিবার যে অধিকার আছে, ইহা মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত "স্কন্দপুরাণ" (নাগরখণ্ড), গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রণীত 'হরিভক্তিবিলাস" (পঞ্চম বিলাস), এবং মিত্রমিশ্র-প্রণীত "বীরমিত্রোদয়" প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন হয়।

কলিকাতা মহানগরী এবং অন্যান্য স্থান হইতেও আশ্রমে দর্শনার্থী মহিলাদিগের সংখ্যা নগণ্য নহে। তাঁহারা প্রধানতঃ গৌরীমাকেই দর্শন করিতে আসিতেন। আশ্রমকুমারীগণের স্তোত্রপাঠ, ব্রহ্মচারিণী এবং সন্ন্যাসিনীগণের পূজা ও পাঠ, এবং আশ্রম-দেবতার দর্শনও অল্প আকর্ষণ নহে। প্রথম প্রথম অনেকে কেবল দর্শনেচ্ছু হইয়াই আসেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহারা আশ্রমের প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করেন। আশ্রমের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ক্রমে তাঁহাদের মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগরিত করে। আশ্রমকে তাঁহারা আপন করিয়া লন। আশ্রমের ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে অনেকের জীবনে বহু কল্যাণকর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই সকলের মূলে রহিয়াছে—শ্রীশ্রীমায়ের করুণা, গৌরীমার তপঃশক্তি এবং আশ্রমের শুচিসুন্দর পরিবেশ।

গৌরীমার মহৎ জীবন এবং তাঁহার আশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমাজের হিন্দু মহিলাগণ কিরূপ ধারণা পোষণ করেন, তাহা সুধীসমাজে সুপরিচিতা দুইজন বিদুষী মহিলার ভাষায় উল্লেখ করা হইল।

অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার দৃষ্টান্ত যেন আমাদের হিন্দুসমাজের প্রত্যেক নারীকে পথ দেখাইয়া দেয়। নারীশক্তি যে নরশক্তি হইতে কোন অংশে তুচ্ছ নহে, নারী যে মহামায়া মহাশক্তির অংশসম্ভূতা, ইচ্ছা

করিলে নারী যে সমাজের জন্য প্রকৃত শুভকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিপূর্ব্বক দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ, তাঁহার মহৎ জীবনের দৃষ্টান্ত হইতে এই সত্য যেন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। * * প্রকৃত উচ্চশিক্ষিতা ধার্ম্মিকা নারীর হস্তে নারীশিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকা যে কত প্রয়োজনীয় তাহার দৃষ্টান্ত আজ এই সারদেশ্বরী আশ্রম * * শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, একদিন আমাদের সমস্ত নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকৃত হউক।”

নিরুপমা দেবী লিখিয়াছেন,—

“আমাদের নিজেদের জন্য—আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জন্য যে মুক্তির স্বপ্ন—যে জীবন লাভের দুরাশা আমার মনের নিভৃত কোণের কল্পনাতে মাত্র পর্য্যবসিত ছিল, সেই স্বপ্ন যে * * জীবন্ত সত্যরূপে আমাদের দেশের বুকে তাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—একথা যদি সময়ে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইত, তাহা হইলে বুঝি আজ নিজের জীবনেরও কোন শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্যলাভ আমার দুর্লভ হইত না। * *

“ঘরের কাজের সাহায্যে মাত্র, নিজেদের স্বার্থের সংসারে মাত্র আমাদের আর পুরিয়া রাখিও না, দেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রে—শিক্ষার ক্ষেত্রে—ত্যাগের আদর্শের ক্ষেত্রেও তোমাদের ভগিনী কন্যাদের তোমরা ডাক। একদিন এ ডাক ভারতে ছিল, নারীদের এ স্থানও এদেশে ছিল। * *

“এই জ্ঞানপিপাসা—মানবের এই চিরন্তনী তৃষা—এ

আমাদের বহু আদিম যুগের সম্পত্তি। একদিন আমাদেরই একজন নারী ব্রহ্মবাদিনী গার্গীরূপে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবেত্তা মীমাংসা-সভার নেত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্ববারা একদিন বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী একদিন জগৎকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্' * * একদিন মণ্ডনমিশ্র-শঙ্করাচার্য্যের বিচার-সভায় উভয়ভারতী বিচারক আচার্য্যার পদ পাইয়াছিলেন। লীলাবতী, খনা একদিন আমাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিত। তাই আবার বলি, সেদিন আজ আমাদের কোথায়! কিন্তু আজ এই আশ্রমের * * ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীদিগকে দেখিয়া সেই দিনের কথাই আমাদের মনে হইতেছে। * * এই আদর্শ হিন্দুর ঘরে ঘরে সত্য হইয়া উঠুক, ইহাই আজ আমার একান্ত কামনা।"

গৌরীমার ব্যবহার এবং আন্তরিক স্নেহ মানুষকে সহজেই আপন করিয়া লইত। তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ উপদেশে কত ব্যথিতহৃদয় সান্ত্বনা পাইয়াছে। একমাত্র অবলম্বন পতিকে হারাইয়া ব্যথাতুরা বিধবা আসিয়া তাঁহার কাছে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া বলিয়াছেন, "স্বামী তোমায় ফাঁকি দেননি, মা। (নারায়ণশিলা দামোদরকে দেখাইয়া বলিতেন,) ঐ ত্যাখ, সিংহাসনে ব'সে আছেন—জগতের স্বামী।"

প্রাণপ্রিয় সন্তানকে হারাইয়া পাগলিনী জননী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছেন। তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, "সন্তান

তোমার শাস্তির রাজ্যেই গেছে মা, দুঃখ ক'রো না, এখন থেকে আমিই তোমায় 'মা' ব'লে ডাকবো।" কঠোর সন্ন্যাসিনীর মাতৃ-হৃদয় কাহারও দুঃখ দেখিলে এই ভাবেই কাঁদিয়া উঠিত।

আশ্রমের বাহিরেও কত দুঃস্থা নারী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। তিনি এইরূপ অনেক নারীকে চাউল, বস্ত্র এবং অর্থদ্বারা সাহায্য করিতেন। তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য ভক্তগণ যে বস্ত্র দিয়া যাইতেন, তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি অনেক বিধবা নারীকে দিয়া আসিতেন। কোন কোন সন্তানের নিকট তিনি সরুপাড় ধুতি চাহিয়া লইতেন। সন্তানগণ মায়ের ইচ্ছা অবিলম্বে পূর্ণ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ বোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, আশ্রমের বাহিরেও এমন কত দুঃখিনী মাতা ও ভগিনী তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের জন্য করুণাময়ী মাতাজীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন, যাঁহারা বহুবিধ কারণবশতঃ অন্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখদৈন্য প্রকাশ করিতে অক্ষম।

আধুনিক সমাজের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা যে পারিবারিক একতাবন্ধনকে শিথিল করিয়া ফেলিতেছে, ইহাতে গৌরীমা দুঃখ প্রকাশ করিয়া মহিলাদিগকে উপদেশ দিতেন,—নিজের এবং স্বামিপুত্রের সুখসুবিধাকেই একমাত্র কাম্য মনে করিলে গৃহিণীর কর্তব্য শেষ হয় না, পরিবারের অন্যান্য সকলের অভাব অভিযোগও নিজের মত করিয়াই অনুভব করিতে হইবে।

সীতা-সাবিত্রী-অরুন্ধতীর আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিয়া তিনি

বলিতেন, ইঁহাদের সতীত্ব এবং আত্মত্যাগ সমগ্র হিন্দুনারীকে মহিমময়ী করিয়া তুলিয়াছে। স্ত্রীর যত্ন, শ্রদ্ধা এবং তপস্যায় স্বামীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে পতিপত্নীর মধ্যে যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া এক বধূকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "স্বামিসেবা মাতৃসেবা ভাল করিয়া করিবে, তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মহাগুরু।"

গৌরীমা যাহা বলিতেন, তাহা সহজ সরল ভাষায় এবং সমস্ত অন্তর দিয়াই বলিতেন। এইকারণেই তাঁহার উপদেশ হৃদয়গ্রাহী হইত। তাঁহার একটি-ছুইটি অর্থপূর্ণ কথা মানুষের মনে কিরূপ বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া করিত, তাহা লিখিয়াছেন জনৈকা মহিলা, "একদিন আমি রাগ করিয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরীমাতা তাহা দেখিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'অনু' সংযোগ কর। সেই কথাটি আজও আমার কানে যেন লাগিয়া রহিয়াছে। * * রাগের সঙ্গে অনু সংযোগ করিলে 'অনুরাগ' (প্রেম) হয়। মনে মনে রাগের জন্য লজ্জাও হইল।"

গৃহস্থ বধূদিগকে তিনি প্রায়ই উপদেশ দিতেন, "মা-সকল, সমাজের এখন যা অবস্থা তা'তে আচারনিষ্ঠা, পবিত্রতা এবং শান্তি—এক কথায় সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদেরই বেশী, একথা তোমরা যেন কখনো ভুলো না। মনে রেখো, বাইরের চাকচিক্যে মেয়েদের সৌন্দর্য্য বাড়ে না। মেয়েদের আসল সৌন্দর্য্য—তাদের দেহমনের পবিত্রতায়।"

তিনি নিজেও শাস্ত্র এবং আচারনিষ্ঠা যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন। আচারবিচারের প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ঠাকুর সন্তানদের মধ্যে অনেককে আচারবিচার শিখিয়েছেন, অনেক বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলেছেন। এমন-কি, অশ্লেষা, মঘা আর বিস্যুদবারের বারবেলায় কোথাও যেতে বা নতুন কাজ আরম্ভ করতে নিষেধ করতেন।" যথার্থ আচারনিষ্ঠা যথার্থ উদারতার পরিপন্থী নহে, বরং জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই হিতকর। অনেকের জীবনেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহাকেও ধর্ম্মপথে সহায়তাদানকালে, কাহারও বিপদ উপস্থিত হইলে অথবা আর্ত্তের সেবার প্রয়োজন হইলে, আচার-নিষ্ঠ হইয়াও গৌরীমা সকলকে দ্বিধাহীনচিত্তে এবং সানন্দে সাহায্য করিয়াছেন, কাহাকেও অবহেলা করেন নাই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত পাশ্চাত্ত্যদেশীয় ভক্তগণ কলিকাতায় কখনও আগমন করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৌরীমাকে দর্শন করিতে আসিতেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুপম জীবনচরিত বর্ণনা করিতেন, ধর্ম্মোপদেশচ্ছলে মহাপুরুষগণের ত্যাগ ও ভক্তিসাধনার কথা শুনাইতেন, ভারতীয় নারীর আদর্শ বুঝাইয়া বলিতেন।

এইরূপ ক্ষেত্রে কোন তৃতীয় ব্যক্তি উভয় পক্ষের বক্তব্য ইংরাজি এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। মধ্যে মধ্যে গৌরীমা দুই-চারিটি কথা ইংরাজিতেও বলিতেন। বলিয়াই আবার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন, ঠিক হয়েছে ত? এই সকল বিদেশীয় ভক্তের প্রশংসা করিয়া তিনি বলিতেন,—কত

দূরদেশ থেকে ঠাকুরের টানে এরা এসেছে। আহা, এদের কেমন শ্রদ্ধা! ঠাকুরের সন্তানদের দেখবে ব'লে, তাঁদের মুখের দুটো কথা শুনবে ব'লে এদের কি ব্যাকুলতা! বীরের জাত, ভোগও যেমন করে, ত্যাগও আছে। আমাদের ঠাকুর, মাঠাকরুণ আর বিবেকানন্দকে এরা কালে কালে আরও মানবে।

তাঁহার উদার মনোভাব, অতিসাধারণ বেশভূষা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সকলকে মুগ্ধ করিত। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহার আরাধ্য দামোদরের ভোগরাগ এবং সাজসজ্জা ব্যতীত নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলিয়া পৃথক কিছু ছিল না। তাঁহার নিজের প্রয়োজন বলিতে,—সাধারণ রকমের একখানি চওড়া লালপাড় শাড়ী এবং দুইগাছি শাঁখা। ভক্তগণ অনেকসময় নিজেদের মনোমত মূল্যবান বস্ত্র তাঁহার ব্যবহারের জন্য দিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেন। ভক্তের নিতান্ত আগ্রহে তিনি তাহা কদাচিৎ পরিধান করিতেন। আবার কখনও পরিহিত সাধারণ কাপড়ের উপরেই গরদের শাড়ী গায়ে জড়াইয়া বলিতেন, এই দেখ, তোমার দেওয়া সুন্দর শাড়ীখানি প'রে কেমন সেজেগুজে ব'সে আছি। মূল কথা এই যে, মূল্যবান বস্ত্র, জামা এবং চাদর তিনি অধিকক্ষণ গায়ে রাখিতে পারিতেন না।

মিলের সাধারণ কাপড় এবং গরদের শাড়ীতে যে অনেক প্রভেদ, তাহা তিনি মনে রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার এই সকল বস্ত্রাদি যদি অন্য কেহ যথাস্থানে তুলিয়া না রাখিতেন, তবে

সময় সময় দেখা যাইত, তাহা কোথাও অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে; হয়ত তিনি তাহাদ্বারা ভাঁড়ার ঘরের জিনিষপত্র পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিবার পথে এগুীর চাদরেই তরিতরকারী, গরুর খইল বা ঘোড়ার ছোলা বাঁধিয়া আনিলেন। চাদর বিকৃত হইত, ছিঁড়িয়া যাইত। মূল্যবান বস্ত্রের এই দুরবস্থা কেহ দেখাইলে তিনি উদাসীনভাবে বলিতেন,—কেন দেয় লোকে? আমি কি ব'সে ব'সে এগুলোর খবরদারি করবো? আমার এসব পোষায় না, বাপু!

তাঁহাকে কেহ কিছু প্রদান করিলে, ভক্তের মনে যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা তাহাই তিনি দেখিতেন, বস্তুর বাহ্যিক মূল্য নহে। এইজন্যই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে এক পয়সার শাক অথবা একগাছি ফুলের মালাও কেহ ভক্তি করিয়া আনিয়া দিলে তিনি তাহাতেই অতীব প্রসন্ন হইতেন।

যাঁহারা যথার্থ সরল এবং ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারাই গৌরীমার অধিক স্নেহ লাভ করিয়াছেন। এইকারণেই তেওর-জাতীয় ভক্ত মুচিরাম তাঁহার যে-স্নেহযত্ন পাইয়াছেন এবং সাধনপথে তাঁহার যেরূপ সহায়তা পাইয়া অভীষ্টলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাহা উচ্চকুলোদ্ভব অনেকের ভাগ্যেই সম্ভব হয় না। ভক্তের ধনমান জাতিকুলকে তিনি প্রাধান্য দিতেন না, প্রাধান্য দিতেন তাঁহাদের অন্তরের ভক্তিবিশ্বাসকে ও ভাবসম্পদকে।

শত শত নারী আসিয়া যেমন গৌরীমার নিকট উপদেশ

পাইয়াছেন, প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ অনেক পুরুষ সন্তানও তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কত ধর্ম্মপিপাসু আসিয়াছেন, কত শোকতাপদগ্ধ ব্যক্তি আসিয়াছেন,—বৃদ্ধ আসিয়াছেন, স্কুলকলেজের ছাত্র আসিয়াছেন,—মহাশক্তির সাধিকা গৌরীমার প্রাণস্পর্শী কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রাণে আনন্দ পাইয়াছেন, তাঁহার তেজোদৃপ্ত বাণী শুনিয়া মনে বল পাইয়াছেন, তাঁহার উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অনেকে সাধনপথে পরমানন্দের আস্বাদও পাইয়াছেন।*

আবার, ধর্ম্মার্থীদের মধ্যে, কাহারও অন্তরে কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা অথবা কপটতা দেখিলে গৌরীমা সাবধান করিয়া বলিতেন, ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমেই চাই—সত্যনিষ্ঠা, সরলতা এবং উদার মন। কেহ সৎ হইবার চেষ্টা না করিয়া 'ভাবের ঘরে চুরি' করিলে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া বাহিরে সাধুতার ভাণ দেখাইলে, অথবা পরনিন্দা বা পরের অনিষ্ট চেষ্টায় থাকিলে তিনি তাহাকে প্রশ্রয় দিতেন না; এমন-কি, এইরূপ

* "Gauri Ma's was a striking personality. She was what the Upanishads ask one to be—strong, courageous and full of determination......She did not know what it was to fear. Her very presence radiated strength and would infuse courage and hope into drooping spirits. She was all positive, there was nothing negative in her. She had a dynamism rare even amongst men".

("The Disciples of Sri Ramakrishna,"—Advaita Ashrama).

দুই-তিন জনকে তিনি বর্জ্জনও করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও তিনি বলিতেন, "এ সব ছেলেরাও ঠিক পথে আসবে, তবে দেরীতে আসবে। কর্ম্মবিপাকে ঘুরতে ঘুরতে যখন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে এদের জটিলতার পাক খুলে যাবে, তখন এরা আসবে।"

গৌরীমার নিকট যে-সকল নরনারী সাধনভজন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন, তিনি তাঁহাদিগের আধার বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপদেশ দান করিতেন। কোন কোন সন্তানকে তিনি প্রাণায়ামাদি যোগপ্রণালীও শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশকেই তিনি বলিতেন, "জপধ্যান ও স্মরণমননের পথই সহজ। এ পথেও ভগবান লাভ করা যায়। জপ করতে ব'সে প্রথম কিছুক্ষণ হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করবে। তা'তে মন শুদ্ধ হবে। তারপর ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করতে করতে জপ করবে। সংসারের কাজের চাপে বেশী সময় যদি না-ই পাও, তবু প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দু'বেলা অন্ততঃ ১০৮ বার ক'রে ইষ্টমন্ত্র জপ করবে। জপ যত বেশী করতে পার, ততই মন স্থির হবে। প্রথম প্রথম ভাল না লাগলেও ধৈর্য্য ধ'রে লেগে থাকতে হয়, তা হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই ভাল লাগবে। গুরু, মন্ত্র আর ইষ্ট আলাদা ভেবো না। তদ্‌গতচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতেই দেখবে—ধ্যান জমে যাবে, আনন্দ পাবে।"

সকল কথার মধ্যে এবং সকল কথার পরে তিনি বারংবার উপদেশপ্রার্থী নরনারীকে স্মরণ করাইয়া বলিতেন, "গৃহীই হও, আর সন্ন্যাসীই হও, আসল কথা—মন। 'মন সাঁচ্চা ত সব

সাঁচ্চা। মনটি খাঁটি হ'লে তবে ভগবানের কৃপা হয়। ঠাকুর বলতেন, 'পবিত্র দেহমনে খুব ব্যাকুলভাবে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়।' তাঁকে না ডাকলে, তাঁর কৃপা না হ'লে, মানুষের জীবন দুঃখের বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়। সকল কাজের মধ্যেই তাঁকে স্মরণ করবে। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকবে, যেন তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।"

এইভাবে গৌরীমাতা অসংখ্য নরনারীকে জীবনপথ-যাত্রায়—তাঁহাদের দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কায়-মনোবাক্যে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত "মাতৃদ্বয়"-পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—

"গৌরীমার শক্তি এক স্ফুলিঙ্গ মাত্র বিকাশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই স্ফুলিঙ্গ হইতে এক মহাদাবানল উত্থিত হইবে। তাঁহার কার্য্য সবে সুরু হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্য দেশ ব্যাপিয়া ছড়াইবে। বাঙালীর মেয়ের ভিতর যে, এইরূপ অদ্ভুত শক্তি বিরাজিত, গৌরীমা তাহা দেখাইয়াছেন, এবং তিনি নারী-জাতির উন্নতির জন্য বহুচিন্তা করিয়াছিলেন, বহুপরিমাণে চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন, বহুভাবে ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। * * ভবিষ্যতে তাহা প্লাবনের ন্যায় কার্য্য করিবে। * * *

"গৌরীমাকে আমি আদ্যাশক্তির অংশ বলিয়া ধারণা করি। এইজন্য তাঁহার চরণে আমি শত কোটি প্রণাম করি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।"

নানাস্থানের ঘটনাবলী

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া বারাকপুরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত, প্রব্রজ্যাকালে গৌরীমা যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি অনেক তীর্থে গমন করিয়াছেন। উত্তরাখণ্ডে অভ্রভেদী বিশাল হিমগিরির দুর্লঙ্ঘ্য প্রদেশে অবস্থিত বদরী, গোমুখী, কৈলাস হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণসীমান্তে সাগরতরঙ্গ-বিধৌত কুমারিকা পর্য্যন্ত, পশ্চিমভাগে দ্বারকাধাম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বসীমান্তে চন্দ্রনাথ এবং কামাখ্যাপীঠ পর্য্যন্ত ভারত মহাদেশের সকল তীর্থক্ষেত্রই তিনি দর্শন করিয়াছেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্ত্তিকালে অনেক তীর্থযাত্রী এবং অনেক কৌতূহলী ভক্তের নিকট ঐসকল তীর্থস্থানের যেরূপ সমুজ্জ্বল ও অবিকল বর্ণনা তিনি প্রদান করিতেন, তাহাতে সত্যই মনে হইত ঐসকল স্থান বুঝি তিনি সম্প্রতি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন,—অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের পুরাতন স্মৃতি ইহা নহে। এমন-কি, কোন্ মন্দিরে কোন্ বিগ্রহের কিরূপ গঠন, কোন্ মূর্ত্তিতে কোন্ বিশেষ ভাবের বিকাশ, কোথায় কি ইতিবৃত্ত প্রচলিত, তিনি সরস ভাষায় তাহাও যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। এইভাবেই তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার

ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রখর ও অক্ষুন্ন ছিল।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরও বিভিন্ন সময়ে তিনি ভক্তসন্তানগণের আমন্ত্রণে বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের বিভিন্ন নগর এবং পল্লীতে গমন করিয়াছেন। সেই সেই স্থানে তিনি ভগবৎ-কথা, বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বাণী প্রচার এবং মাতৃ-জাতির কল্যাণকল্পে উপদেশাদি দান করিয়া অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন। সকল স্থানের কার্য্যাবলী এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থে সমাবেশ করা সম্ভবপর নহে। কোন কোন স্থান এবং কোন কোন ঘটনার কথা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

মুঙ্গেরে

গৌরীমা একবার শারদীয়া পূজার সময় মুঙ্গেরের 'কষ্টহারিণী'-ঘাটে ছিলেন। এইসময় দেবী নাম্নী একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে তিনি প্রত্যহ কুমারীপূজা করিতেন। স্থানীয় বহু লোক ধর্ম্মোপদেশ-লাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সেন (সিভিল সার্জ্জেন), সূর্য্যকুমার সেন (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট), রাজনারায়ণ ঘোষ, চন্দ্রকুমার সেন, কালীচরণ মজুমদার-প্রমুখ মুঙ্গেরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও এইসময় মাতাজীর দর্শনলাভ করেন।

তৎকালে ঐ অঞ্চলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম তত প্রচারিত ছিল না। গৌরীমা ভক্তগণের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের

লোকোত্তর চরিতকথা প্রচার করিতে লাগিলেন।* উপেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্ম্মিণীর আগ্রহে একদিন তাঁহাদের বাসভবনে গিয়া ঠাকুরের একখানি প্রতিকৃতি-দর্শনে গৌরীমা বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই এই সেনপরিবার তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন।

সূর্য্যকুমার সেনের নিকট মাতাজীর ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তথাকার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহার পত্নী মধ্যে মধ্যে মাতাজীকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং কোন কোন দিন প্রচুর ফুল দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

চন্দ্রনাথে

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে যখন প্রথম খোলা হয়, সেই সময় গৌরীমা চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ তীর্থ চন্দ্রনাথ অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় কয়েকদিন বাস করিয়া তিনি চন্দ্রনাথ, স্বয়ম্ভূনাথ, বিরূপাক্ষ এবং উনকোটী শিবের মন্দির প্রভৃতি দেবস্থান দর্শন করেন।

---

* আলমবাজার মঠ হইতে মুঙ্গেরে গৌরীমাতার নিকট লিখিত (২৪. ১১. ১৮৯৫) স্বামী সারদানন্দের একখানি পত্র :—

শ্রীচরণেষু—আপনার দ্বিতীয় পত্র কাল পাইলাম। প্রথম পত্রও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। মারা যায় নাই। তজ্জন্য চিন্তা নাই। প্রিয়নাথ বোধ হয় এতদিনে আপনাকে ২ খণ্ড শ্রীশ্রীদেবের জীবনী পাঠাইয়াছে। আট আনা দামের একখানি শ্রীশ্রীদেবের ছবি শীঘ্রই পাঠাইব। ···আমার শত শত প্রণাম ইত্যাদি ইত্যাদি জানিবেন। যদি বিলাত যাওয়া হয় তো দেখা করিয়া যাইব। এখনও স্থিরতা নাই কে যাইবে। নরেন্দ্রের চিঠি আসিলে স্থির হইবে। ইতি—শ্রীশরৎচন্দ্র

চন্দ্রনাথ হইতে ফিরিবার পথে সিদ্ধভূমি মেহার কালীবাড়ীও তিনি দর্শন করেন।

পুরুলিয়ায়

চন্দ্রনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই-তিন বৎসর পর তিনি পুরুলিয়ায় গমন করেন। সেইস্থানে তিনি একটি প্রাচীন মন্দিরে অবস্থান করিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সেই বৎসর তথায় খুব উৎসাহের সহিত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাটালে

১৩০৪ সালে যখন গৌরীমা বারাকপুর-আশ্রমে ছিলেন, সেই সময়ে মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে সেখানে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তন্মধ্যে ভক্তিমতী চারুহাসিনী দেবী, অন্নপূর্ণা দেবী এবং রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাতাজী যখন ঘাটালে উপস্থিত হইলেন, বহু নরনারী সমবেত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রত্যহ বহু লোক আসিয়া তাঁহার উপদেশ ও শাস্ত্রপাঠ শুনিতেন। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে নৌকা এবং গরুর গাড়ী করিয়াও অনেক নরনারী আসিতেন। স্থানীয় লোকের আগ্রহে তথায় একটি মহিলাসভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সভাতে তিনি নারীর আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পশ্চিমাঞ্চলে

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার চারি-পাঁচ বৎসর পরে একবার তিনি কাশীতে

গিয়া মাসাধিক কাল বাস করেন। এই সময়ে শান্তিপুরের বিনয়কুমার সান্যাল এবং অমিয়কুমার সান্যাল সপরিবারে তথায় গিয়া কিছুদিন ছিলেন। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে মাতাজীকে লইয়া তাঁহারা পুরীধামেও গিয়াছিলেন।

১৩০৯ সালে গৌরীমা বৈদ্যনাথ, কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর, নাসিক প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গমন করেন। এই যাত্রায় স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা আহূত হয় এবং তিনি তাহাতে বক্তৃতা করেন। একবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাশীধামে অবস্থানকালেও তিনি তথায় গিয়া কিছুদিন মায়ের সহিত বাস করেন।

পাবনায়

১৩১৭ সালে পাবনা জেলায় সলপের জমিদার দক্ষিণারঞ্জন সান্যাল এবং হেডমাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিকের অনুরোধে সেখানে গিয়া গৌরীমা প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এতদুপলক্ষে তথায় একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা এবং নারীজাতির সম্বন্ধে আশার বাণী শুনিয়া তত্রত্য জনসাধারণের মনে পরম উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

ময়ূরভঞ্জে

স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন সাহেবের জমিদারীর ম্যানেজার নলিনচন্দ্র মিত্র এবং আরও কতিপয় ভক্ত ১৩১৮ সালে গৌরীমাকে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রধান নগর বারিপদায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তথায় বিবিধ ফল, ফুল এবং শস্যাদিতে পরিপূর্ণ এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলা অবস্থিত।

ইহারই সন্নিকটে সাঁওতালগণ মিলিয়া সাধু মায়িজীর ব্যবহারের জন্য নূতন একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল।

নলিনচন্দ্রের উদ্যোগে একদিন কাঙ্গালীভোজনের ব্যবস্থা হয় এবং তাহাতে শত শত দরিদ্র উড়িষ্যাবাসী ও সাঁওতালকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মাতাজী যে-কয়েকদিন সেখানে ছিলেন, ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে বহু উড়িষ্যাবাসী এবং বাঙ্গালী তাঁহার নিকট আসিয়া উপদেশলাভে ধন্য হইয়াছেন।

এইস্থানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নলিনচন্দ্র গৌরীমাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। আশ্রমকে তিনি অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা অনেক সাহায্য করিয়াছেন। গৌরীমার নির্দ্দেশানুযায়ী তিনি শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যান্য সন্তানদেরও অকুণ্ঠ সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ভুবনেশ্বরে

ভুবনেশ্বর-মঠের নির্ম্মাণকার্য্য যখন চলিতেছিল, সেই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার ভুবনেশ্বরে যাইবার জন্য গৌরীমাকে আমন্ত্রণ করেন এবং যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া যান। মঠের সন্নিকটে একখানা বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত হয়।

তিনি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে মহারাজের কী আনন্দ! মহারাজ নিজেই তাঁহাকে লইয়া ভুবনেশ্বর-দর্শনে গেলেন। পরের দিন মঠের কোথায় কোন্ ঘর হইবে, কোথায় বাগান হইবে এবং আর কোথায় কি হইবে, তাহা সরল বালকের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি মাতাজীকে দেখাইলেন।

ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদিগকে গৌরীমা খুবই স্নেহ করিতেন, বিশেষ করিয়া ঠাকুরের মানসপুত্র 'ব্রজের রাখালের' প্রতি তাঁহার অপরিসীম বাৎসল্যভাব ছিল। তিনি যে-কয়েকদিন ভুবনেশ্বরে ছিলেন, নিজে কাছে বসিয়া আদরযত্ন করিয়া তাঁহাকে দামোদরের প্রসাদ খাওয়াইতেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গে তাঁহাদের এই দিনগুলি পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইসময় মহারাজ একদিন মাতাজীকে বলেন, "মা, তুমি ত এখন বুড়ো হয়েছ, আর কত খাটবে! তোমার মেয়েদের আমি ব'লে দিয়েছি, তা'রাই এখন আশ্রম বেশ চালাতে পারবে। তুমি এখানেই থাক। আমিও কাছে থাকব, আর তোমার হাতের রান্না পেসাদ পাব।"*

সিমলায়

মাতাজীর প্রাচীন ভক্তসন্তান জহরলাল ঘোষ সিমলার এক মহোৎসবের বর্ণনায় (১৩৪৬ সালে) লিখিয়াছেন,—

"প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে একদিন দুইতিন

* ভুবনেশ্বর যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আশ্রমবাসিনী কুমারীগণসহ গৌরীমা একদিন বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন। কুমারীদিগের তপস্যা এবং অধ্যয়নের কুশলাদি প্রশ্নের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "মা ত তোমাদের বেশ গ'ড়ে তুলেছেন, তোমরাই এখন আশ্রম চালাতে পারবে। কিছুদিনের জন্যে আমাদের মাকে ছুটি করে দাও। দক্ষিণেশ্বরের কথা ব'লে দিনগুলো আমাদের বেশ আনন্দে যাবে।"

জন ভদ্রলোকের সহিত পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাজীর পরিচয় হয়। কথাপ্রসঙ্গে মাতাজী তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যার কথা বলিতে লাগিলেন। মাতাজীর মুখে সে মধুময় কথা শুনিয়া তাঁহারা বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, মা, এমন মধুর কথা আমরা আর শুনি নি। আপনাকে আমরা একদিন আমাদের সিমলেয় নিয়ে যাব।"

"দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহারা মাতাজীকে সিমলায় আমাদের বাড়ীর নিকটে একটী প্রশস্ত ভবনে লইয়া আসেন। ঐস্থানে উক্ত ভক্তগণের উদ্যোগে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার কথা শুনিতে সমাগত হইয়াছিলেন। আমারও এখানেই মাতাজীকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মাতাজী সকলের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের কথা আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ এতই আনন্দিত হইলেন যে, তাঁহারা আর তাঁহাকে সেই দিন যাইতে দিলেন না; ঐ স্থানেই তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউর সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

"দ্বিতীয় দিনে শাস্ত্রব্যাখ্যা, দক্ষিণেশ্বরের লীলাকাহিনী বর্ণন, কীর্ত্তন এবং প্রসাদ বিতরণ চলিল। এই দিন লোকসংখ্যা প্রথম দিন অপেক্ষাও বেশী হইল। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে মাতাজী এমন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেন যে, ভক্তবৃন্দ ঠাকুর শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের নামে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারাও মাকে ছাড়িতে চান না,

মাও এ আনন্দ ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। কাজেই উৎসব চলিতে থাকিল।

"এই উৎসবে সুগায়ক গোপালচন্দ্র রায় কীর্ত্তন গাহিয়া সকলকে খুব আনন্দ দিয়াছিলেন। এই ভাগ্যবান ভক্তকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদা দক্ষিণেশ্বরে আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। মাতাজীর আদেশে দীন লেখকও উক্ত উৎসবে কয়েকটি গান গাহিয়াছিল।

"ক্রমে এই মহোৎসবের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গী পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ এবং বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ এবং আনন্দ বর্দ্ধন করেন। একদিন দুইদিন করিয়া বার দিন এইরূপ মহোৎসব চলিল। অবস্থা দেখিয়া স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছিলেন, 'গৌরমা, ঠাকুরের নামে যে সিমলেপাড়া মাতিয়ে দিলে!"

কটকে

কটকের অন্তর্গত বহু-গ্রামের জমিদার হরিপ্রসাদ বসু ১৩১৯ সালে গৌরীমাকে তথায় লইয়া যান। আশ্রমের কয়েকজন সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীও সঙ্গে ছিলেন। স্থানীয় ভক্তগণ এক উৎসবের আয়োজন করেন এবং গৌরীমার পূজিত দামোদরকে প্রচুর দুগ্ধের পায়সান্ন ভোগ দেন। পল্লীগ্রামের সরল নারীগণ শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনকথা শ্রবণে এবং গৌরীমার গৌরাঙ্গ-প্রীতি

দর্শনে পরম আনন্দ অনুভব করেন। আশ্রমবাসিনীদিগের সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিয়া তাঁহারা উৎসাহ লাভ করেন।

গৌরীমা তাঁহাদিগের অনেকের সহিত উড়িয়া ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিতেন। উড়িয়া ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিও তিনি পাঠ করিতে পারিতেন।

ইহার পূর্ব্বেও গৌরীমা প্রচারকার্য্যে কটকে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মিশ্র লিখিয়াছেন,—

"পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী গৌরীমা এবং দুর্গামা একবার কটকে আসিলেন। গৌরীমার মুখে ঠাকুর এবং মা-ঠাকুরাণীর প্রসঙ্গ শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাঁহাদিগের কথা বলিতে বলিতে গৌরীমা একদিন ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন।"

গৌরীপুরে

আসাম-গৌরীপুরের ভক্তিমতী রাণী সরোজবালা দেবীর ব্যাকুল আহ্বানে ১৩১৯ সালে মাতাজী গৌরীপুরে গিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত আরও তিন-চারি বার তিনি সেইস্থানে গমন করিয়াছেন। রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গভীর শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে মাতাজীর সম্বর্দ্ধনা এবং সেবাযত্ন করেন। তাঁহার বাসের জন্য রাজবাটীর নিকটে একটি বাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ দলে দলে নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন।

গৌরীপুরের প্রসঙ্গে ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

লিখিয়াছেন, "বোধ হয় ৭ দিন আমরা ওখানে ছিলাম, বড় আনন্দেই দিন কাটিয়েছিলাম। * * প্রত্যহ মা'র আশ্রমে দেশবাসী মহাপ্রাণদের ভিড় লেগে থাকতো। মাও প্রাণখুলে অগ্নিবাণী বর্ষণ করতেন। মা'র সে সময়কার তেজমূর্ত্তি আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি,—কোমলে কঠোরে যুগ্মমূর্ত্তি, এমনটী আর দেখি নাই।"

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে এক ভক্তের কথা।

গৌরীপুরের রাজকুমারদিগের গৃহশিক্ষক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পরম ভক্ত। শ্রীশ্রীমাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। একবার তিনি লেখিকার নিকট স্বীকৃতি আদায় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকালে গৌরীমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

১৩২৭ সালে আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে একদিন সংবাদ আসিল, আশুতোষ অসুস্থ, গৌরীমাকে সেইদিনই একবার দর্শন দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভক্তের অন্তিমকালে গৌরীমা গিয়া উপস্থিত হইলেন ; মুমূর্ষু বৃদ্ধ নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, —মা এসেছো, বেশ হলো। আমার ডাক এসেছে, এবার আমি চল্লুম। মা-ঠাকরুণ যাবেন, আমি তাঁর ঝাড়ুদার, পথের ধূলোকাঁকর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে। নইলে যে মায়ের পায়ে ব্যথা লাগবে। ভক্তিমহারাণী সারদা-জননী যাবেন, আমি আগে গিয়ে তাঁর জন্যে 'মছলন্দ' পেতে রাখবো। আমি চল্লুম।

সত্যই শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির কয়েকদিবস পূর্ব্বেই ঠাকুরের

নাম করিতে করিতে এই ভক্তসন্তানটি যেন শ্রীশ্রীমায়ের গমনপথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেই এই মরজগৎ হইতে বিদায় লইলেন।

শ্রীহট্টে

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হবিগঞ্জে জনপ্রিয় রায় কমলাকান্ত ঘোষ বাহাদুরের বাড়ীতে গিয়া গৌরীমা ১৩২০ সালে প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন। অনেক নরনারী তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিতে আসিতেন। সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়াও তিনি মহিলাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছেন।

স্থানীয় মুন্সেফ নগেন্দ্রনাথ বসু, উকিল প্রেমনারায়ণ কর, কবিরাজ অক্ষয়কুমার গুপ্ত-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুরোধে তত্রত্য ধর্ম্মসভাগৃহে মাতাজী 'ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' এবং 'ধর্ম্ম-জীবন' সম্বন্ধে দুইদিন বক্তৃতা করেন।

স্কুলকলেজের ছাত্রগণও তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে এবং সত্যনিষ্ঠ হইতে বলিতেন।

হবিগঞ্জে যাইবার পূর্ব্বে তথাকার ভক্তগণের ব্যাকুল আমন্ত্রণ পাইয়া গৌরীমা যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"ঠাকুর আমাকে মাতৃসেবা-মহাযজ্ঞে ব্রতী করিয়া দিয়া তোমাদের সম্মুখে নামাইয়া দিয়াছেন। এখন বৎসসকল, তোমরা মিলিয়া * * এই মহাযজ্ঞ পূর্ণ কর। মঙ্গলময় হরি, সর্ব্বমঙ্গলা

মা যজ্ঞেশ্বরী কৃপা বিতরণ করুন। * * এস যোগ্য সন্তানগণ, * * মাতৃগণোন্নতিসাধন-সেবনে স্বার্থত্যাগ করিয়া মহাপবিত্র হও, সচ্চিদানন্দ লাভের যোগ্য হও।"

কুচবিহারে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কুচবিহারের ভক্তগণের আগ্রহে গৌরীমা ১৩২০ সালে তথায় গমন করেন। ওখানকার পোষ্টমাষ্টার অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"প্রথম দর্শনেই কেমন যেন হইয়া গেলাম। যেন কত কালের পরিচিত এবং অতি আত্মীয়! কে ঐ করুণাময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে! কে ঐ আনন্দময়ী, যাঁর উপস্থিতি মাত্রেই সমস্ত বাটীখানি আনন্দে ভরপূর! কে ঐ মা, যাঁর স্নেহাভিষেক সকলেরই একমাত্র কাম্য! তাইত, এমনও হয় নাকি?—এইরূপ ভাবের তরঙ্গে আমার মন প্রাণ তখন উদ্বেল। অবাক হইয়া অনিমিষনয়নে মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। আমি * * যেন যন্ত্রচালিত হইয়া মাতৃসান্নিধ্য লাভ করিলাম ও পদধূলিগ্রহণে ধন্য ও পবিত্র হইলাম। * *

"মা প্রতিদিনই আমার জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন এবং আমি অপরাহ্নে কলেজ হইতে প্রত্যাগত হইলে কত আদরে ও স্নেহে ঐ প্রসাদ খাওয়াইতেন। এমন স্নেহ আমার জীবনে আর পাইয়াছি কিনা মনে পড়ে না।

"ঐ বৎসর শ্রীশ্রীমাতাজী কুচবিহারে প্রায় একমাস কাল অবস্থান করেন। ঐ সময় প্রতিদিনই অমূল্যবাবুর বাসা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইত। পূজা, সংকীর্ত্তন, ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ, প্রসাদ-বিতরণ—এ সকল নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছিল। সহরের জমিদারবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত এবং নিঃস্ব ভদ্রলোকদিগের অনেকেরই ভবন মায়ের পুণ্য পাদস্পর্শে পূত হইয়াছিল। সহরের মাতৃবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের (গৌরীমার) উপদেশামৃত এবং আশ্বাসবাণী শ্রবণে উৎসাহিত এবং আশান্বিত হইয়াছিলেন। স্কুল ও কলেজের ছাত্রমণ্ডলী দলে দলে আসিয়া মায়ের চরণপ্রান্তে বসিয়া মাতৃমুখনির্গত অমৃতধারায় অভিষিঞ্চিত হইয়া জীবন ধন্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

"ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাবাসকল, মানুষ হ'য়ে জন্মেছ। এমনভাবে চলো না, যা'তে প্রকৃত মানুষ হ'বার পথে বাধা পড়ে। সংযম শিক্ষা করবার এই তো সময়; তোমরা সংযমী হও। সংযম না থাকলে অন্য কোন সুশিক্ষা দাঁড়াবে না। দেশের আশাস্থল তোমরা, তোমরা যদি মানুষ না হও তবে দেশের আশা কোথায়? মেয়েদের সম্মানের চোখে দেখবে এবং তাদের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হবে। মেয়েদের ছোট ক'রে তোমরা বড় হবে কেমন ক'রে? মনে রেখো, মেয়েরা শক্তির অংশ, তা'দিগকে বিদ্যাশক্তি ক'রে না তুললে তা'রাই অবিদ্যাশক্তি হ'য়ে উঠবে। তা'তে দেশের কল্যাণ কখনও হবে না।' * *

"অপরাহ্নে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইত। কীর্ত্তন ও ভজন আরম্ভ হইত। মাঝে মাঝে মা-ও সেই সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন, এবং প্রেমের বন্যায় সকলকে ভাসাইয়া দিতেন। সে কি দৃশ্য! * *

"এইভাবে কখনও ঠাকুরের প্রসঙ্গে, কখনও কীর্ত্তনে কখন বা পাঠে, কখনও বা বক্তৃতায় মায়ের দিনরাত অতিবাহিত হইত। ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই।

"মা ভক্তবৃন্দ লইয়া ঠাকুরের কথা বলিতেন, আর মাঝে মাঝে যাইয়া রন্ধনদ্রব্যাদি রন্ধনপাত্রে নিক্ষেপ করিতেন। সময়মত তাঁহার ডাক পড়িত এবং তিনি যথাবিহিত কার্য্যান্তে আবার ভগবৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেন। 'এক হাতে কাজ কর, আর এক হাতে তাঁকে ধ'রে থাক,'—ঠাকুরের এই বাণীর সত্যতা মার প্রত্যেক কাজে উপলব্ধি করিয়াছি। আরও বুঝিতে পারিয়াছি, মহাপুরুষদের কথার সত্যতা সাধুজীবন সংসর্গেই উপলব্ধ হয়—দ্বিতীয় পথ নাই।"

ঢাকায়

গৌরীমা ঢাকা নগরীতে কয়েকবার গমন করিয়াছেন এবং জেলার কোন কোন পল্লীতেও তিনি গিয়াছেন। ভক্তগণের আগ্রহে ১৩২২ সালে তিনি ঢাকা নগরীতে প্রথম গমন করেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী তথায় মোহিনীবাবুর বাড়ী 'সবজি-মহলে' অবস্থান করেন।

মাতাজীর ত্যাগ ও বৈরাগ্য, ভক্তিপূর্ণ উপদেশ এবং তেজস্বিতায় দর্শনার্থী নরনারীগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে একটি প্রশস্ত ভবনে তিনি দুইদিন বক্তৃতা করেন। প্রথম দিন ধর্ম্মবিষয়ক এবং দ্বিতীয় দিন মাতৃজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। যে মহাশক্তির প্রেরণায় তিনি বাল্যাবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মহতী সাধনায় নিরত ছিলেন, তাহার প্রভাব তাঁহার ভাব ও ভাষায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

ঢাকার স্বনামধন্য জননায়ক আনন্দচন্দ্র রায়, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাতাজীর সহিত নারীশিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন।

তাঁহার ঢাকায় গমন উপলক্ষে ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ ভগবান সেতারী তাঁহাকে সেতার-বাজনা শুনাইয়াছিলেন। বাজনা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হন এবং সেতারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঠাকুরের সন্তানদিগের প্রতি গৌরীমাতার কিরূপ বাৎসল্যভাব ছিল, তাহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। এইস্থানে আর একটি ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

নিত্যগোপাল গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। তিনি এককালে 'থিওসফিষ্ট' ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গেলে, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে পদস্থাপন করেন, সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়। সেই হইতে তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত।

গৃহী হইয়াও তিনি সংসারে নিতান্ত নির্লিপ্ত ছিলেন, দিবসের

অধিকাংশ সময় ভগবদ্‌ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বহু ধর্ম্মার্থীকে তিনি সাধনভজনে সহায়তা করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে বহুবৎসর তিনি ঢাকা সহরে অতিবাহিত করেন।

গৌরীমা ঢাকায় গেলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইত, ঐশ্বরীয় কথায় উভয়ে দিব্যভাবে বিভোর হইতেন। মধ্যে মধ্যে ভক্তিসঙ্গীত আলাপনও চলিত। শ্রোতৃবর্গ আনন্দলাভ করিতেন। একবার গৌরীমা ঢাকায় গিয়া কয়েকদিবস বুড়ীগঙ্গার উপর একখানি বড় নৌকায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তায় গোস্বামী মহাশয় অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—মা এসেছেন, মা এসেছেন, তোমরা একবারটি আমায় নিয়ে চল-না সেখানে। মাকে আমি দেখব।

একদিন অপরাহ্ণে ভক্তগণ তাঁহাকে গৌরীমাতার দর্শনে লইয়া গেলেন। নৌকার নিকটে গিয়াই "মা কৈ, মা কৈ গো", বলিতে বলিতে ভাবাবেগে তাঁহার দেহ এমনই অসাড় হইয়া গেল যে, সিঁড়ি হইতে জলে পড়িয়া যাইবার উপক্রম। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া সাবধানে নৌকার মধ্যে লইয়া গেলেন।

গৌরীমাকে দর্শনমাত্র "মা, আপনি এসেছেন, মা, তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সরল শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরীমা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। একটু সাব্যস্ত হইলে ঠাকুরের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল, লীলামাধুরী-কীর্ত্তনে উভয়ে এমনই মগ্ন হইলেন যে, অশ্রুধারায় উভয়ের বক্ষ সিক্ত হইতে লাগিল।

বিদায়ের প্রাক্কালে ঠাকুরের ভোগে নিবেদিত জিলিপি প্রসাদ গৌরীমা গোস্বামী মহাশয়ের হাতে দিলেন। কিন্তু তখনও তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে এমনই তন্ময় যে, জিলিপি হাতে রাখিতে পারিলেন না, পড়িয়া গেল। গৌরীমা অত্যন্ত আচারনিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রগাঢ় মাতৃস্নেহবশে জননী যেমন অবোধ শিশুকে খাওয়াইয়া দেন তেমনিভাবে গোস্বামী মহাশয়কে নিজহস্তে একটু একটু করিয়া জিলিপি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে উপস্থিত ভক্তগণের চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ময়মনসিংহে

প্রথমবার যখন মাতাজী ঢাকা গিয়াছিলেন, সেই সময়ে জনৈক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহে লইয়া গেলেন। স্থানীয় 'দুর্গাবাড়ী'তে তিনি মাতৃজাতির আদর্শবিষয়ে বক্তৃতা করেন। ইহাতে বিশেষ করিয়া মাতৃজাতির মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সুসঙ্গের মহামান্য রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের সভানেতৃত্বে ময়মনসিংহের জনসাধারণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ইহারও তিন-চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি আর একবার ময়মনসিংহে গমন করেন। সেই সময়ে কুচবিহার রাজসরকারের তদানীন্তন কর্ম্মচারী শৌর্য্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহাকে স্বগ্রাম [illegible] লইয়া গিয়াছিলেন। সন্তোষের জমিদার দিনমণি

চৌধুরাণীর সভানেত্রীত্বে এক মহিলাসভায় তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ময়মনসিংহের একদিনের বর্ণনা দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন কুমারভক্ত শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন,—

"একবার দুই তিন দিনের জন্য ময়মনসিংহ গিয়াছিলাম। আমার জনৈক আত্মীয় তথাকার পুলিস ইন্‌সপেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এখানে পরমহংসদেবের একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী শিষ্যা কাল টাউন-হলের সম্মুখের মাঠে বক্তৃতা করিবেন। আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই এই সন্ন্যাসিনী কে? ঠাকুরের কোন শিষ্যা প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন, আমার এইরূপ ধারণা ছিল না। সুতরাং কতকটা কৌতূহল-বশতঃই আমার সেই আত্মীয়ের সঙ্গে সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। সভায় যাইয়া দেখি, প্রায় দুই হাজার নরনারী তথায় সমবেত হইয়াছেন। এত লোক ময়মনসিংহের টাউন-হলে সঙ্কুলান হইবে না বলিয়াই সম্মুখের উন্মুক্ত প্রান্তরে এই সভার অধিবেশন হয়।

"আমরা সভার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অদূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তখন সভায় একজন পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরীমা তাঁহার নিকটেই একটি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম যে, এ সন্ন্যাসিনী আমাদেরই পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীগৌরীমাতা।

"পণ্ডিত মহাশয় যখন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার মাঝখানে

হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া গৌরীমা বলিলেন,—ব্যাখ্যা ঠিক হলো না। এই বলিয়া তিনি সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার বিশদ, সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিলেন। এবং গোপীপ্রেমের একটি অপূর্ব্ব ভাবঘন চিত্র শ্রোতাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। শ্রীবৃন্দাবনলীলার অতীন্দ্রিয় প্রেম ব্যাখ্যা করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন।

"সহসা তিনি ধীরে ধীরে আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের অবতারণা করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মাতৃজাতি কতদূর বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, এবং সেজন্য যে পুরুষরাই দায়ী, তাহা ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিলেন। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার ভাষণ শুনিতে লাগিলেন। একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা তিনি বলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতাশক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। জীবনে সেই প্রথম তাঁহার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

"সভা ভঙ্গ হইতে না হইতে একটি বালক আমার নিকট আসিয়া বলিল, গৌরীমা আপনাকে ডাকিতেছেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, অতদূর হইতে মায়ের দৃষ্টি আমার উপর কিভাবে আসিয়া পড়িল! তাঁহার স্নেহের আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হইল। আমি নিকটে যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি জননীর ন্যায় স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, বাবা, তুই কবে এসেছিস? আমার সঙ্গে চল।

"সভাভঙ্গে শ্রোতাদের মধ্যে অনেক নরনারী তাঁহার পদধূলি

গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তিনি সকলকেই স্মিতবদনে মাতৃসুলভ স্নেহপ্রদর্শন করিয়া বিদায় লইলেন।

"তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া স্থানীয় এক জমিদারের জুড়ি-গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই একটি বালক এবং দুই একটি ভক্তনারীও গাড়ীতে উঠিলেন। জমিদারের সুবৃহৎ প্রাসাদোপম দ্বিতল গৃহে পৌঁছিয়া দেখি, একটি ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীদামোদরজীউ রহিয়াছেন। * * *

"আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি মা, কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছেন? তাহার উত্তরে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, না রে, ঠাকুর এখন আমাকে ঘোরাবেন। অনেকে আমাকে এই অঞ্চলে আহ্বান কচ্ছে। দেখি, আশ্রমের জন্য যদি কোন সাহায্য পাই। ঠাকুর তো আমাকে বলেছিলেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।' এখন সেই কাজই করি।

"আমি হাসিয়া তাঁহাকে বলিলাম, মা, জীবনে অনেক বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু তোমার ভেতর যে-রকম প্রতিভা এবং আকর্ষণী বাগ্মিতাশক্তি আছে, তা আমার কখনো ধারণা ছিল না। আজ তা প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম।

"ইতিমধ্যে আরও অনেক ভক্ত নরনারী আসিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিলাম, তিনি আমার মস্তকে শ্রীহস্ত স্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি মুগ্ধহৃদয়ে এই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।"

রাঁচিতে

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তগণের আহ্বানে গৌরীমা ১৩২২ সালে রাঁচিতে গিয়াছিলেন। উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দুইবার তিনি তথায় গমন করেন। রাঁচির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় নগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, সেক্রেটারিয়েটের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, রাধারমণ বরাট, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘটক-প্রমুখ ভক্তগণ প্রত্যহ ঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনিতে সমবেত হইতেন। তথায় বিরাট জনসভায় গৌরীমা একাধিক দিন বক্তৃতা দান করেন। তৎকালে সেই স্থানে ঠাকুরের অন্যতম সন্তান স্বামী সুবোধানন্দও উপস্থিত ছিলেন।

শিলংয়ে

১৩২৩ সালে শিলং গিয়া গৌরীমা প্রথম কিছুদিন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের য়্যাসিষ্টাণ্ট একাউণ্টস্ অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। পরে কন্ট্রোলার অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের গৃহেও তিনি কিছুদিন ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"নিত্যই মাকে দর্শন করিবার জন্য স্ত্রীপুরুষ ভক্ত অনেকে আসিতেন। পুরুষভক্তেরা অফিসের পর, প্রায় সন্ধ্যার সময়ই আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় রাত্রি ১১টা বাজিয়া

যাইত। তৎপর আমরা বিশ্রাম করিতাম। সকালে উঠিয়া দেখিতাম, মা জাগিয়াই আছেন। রাত্রিতে তিনি নিদ্রা যাইতেন কি না বলিতে পারি না।

"সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা ২।৪টী ভক্ত সঙ্গে লইয়া প্রায়ই রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেন। সেই সময় রাস্তায় স্ত্রীপুরুষ যাহাকেই দেখিতেন (খাসিয়া পর্য্যন্ত) সকলকেই উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ,' কি 'জয় মা সারদেশ্বরী' বলিয়া ঠাকুর কি মার নাম শুনাইতেন। খাসিয়া মেয়েরা হাসিতে হাসিতে তাঁহার মুখপানে চাহিত, মাও আরও উল্লসিতা হইয়া তাহাদিগকে নাম শুনাইতেন। * *

"একদিন রবিবারে তাঁহারই ইচ্ছামতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী ছোটখাট উৎসবের আয়োজন হইল। * * মা বাহিরের ঘরে সকলের মধ্যে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্থ রাসপঞ্চাধ্যায় হইতে কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা সকলকে শুনাইলেন। এই প্রসঙ্গ কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। মা নিজের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ টীকাকারদের ব্যাখ্যাও কিছু কিছু বলিলেন। সকলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন।" * *

ধানবাদে

ধানবাদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার রায় নগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর মাতাজীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"১৯১৯ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণী দুইবার ধানবাদে পদার্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত রাঁচিতে এবং অন্যত্রও তিনি সেবকের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। আমি আর তাঁহার কি সেবা করিয়াছি। তিনিই আমাকে গর্ভধারিণী জননীর অধিক স্নেহে আদরযত্ন করিতেন।

"ফুলগাছ হইতে নিজেই কত যত্ন করিয়া প্রত্যহ ফুল তুলিতেন এবং তাহা দিয়া কত আনন্দে ঠাকুরকে সাজাইতেন! ফুলফলের গাছের প্রতিও তাঁহার কত যত্ন ছিল! ধানবাদের বাসায় অনেক স্থান খালি পড়িয়াছিল। সেখানে তিনি কতকগুলি শাকসবজির বীজ বপন করেন। পরে তাহাতে প্রচুর ফসল হয়। তিনি স্বহস্তে একটি কাঁটালের চারাও রোপণ করিয়াছিলেন। সেই গাছটি এখন অনেক বড় হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শন এবং উপদেশ লাভের জন্য প্রায়ই সন্ধ্যাকালে সহরের এবং দূর স্থানেরও অনেক লোক আসিতেন। মহিলাগণ সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরে দলে দলে আসিতেন। তিনি সকলের নিকট মানবজীবনের কর্ত্তব্যের কথা বুঝাইয়া বলিতেন, ঈশ্বরীয় কথা বলিতেন।

"জনৈক ভক্ত আসিয়া একদিন মাকে কয়েকটি গান শুনাইলেন। তাঁহার গান শুনিয়া মা অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। আমার বাল্যবন্ধু জহরলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দেশমত তিনিও একটি শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন,—

'পাবি না ক্ষেপা মায়েরে, ক্ষেপার মত না ক্ষেপিলে—'

"শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীর সেবাকার্য্যে মা কক্ষান্তরে গমন করিলে, তাঁহার প্রসঙ্গে উপস্থিত একজন প্রবীণ ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন,—'গৌরীমা একদিন ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট বললেন, 'গৌরী এলে আজ তা'র কাপড় পরার ধরণ দেখবি, ঠিক যেন ব্রজের মেয়ে,—ও যে ব্রজের গোপী।'

"কিছুক্ষণের মধ্যেই গৌরীমা এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বললেন, 'মা' তুই যে আজ এ বেশে আসবি, আমি তা এক্ষুণি বলছিলুম।' সঙ্গে সঙ্গে গৌরীমার দৃষ্টি কাপড়ের উপর পড়ল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ নহবতে শ্রীশ্রীমার কাছে চ'লে গেলেন।"

জামসেদপুরে

টাটা-কোম্পানীর কর্ম্মচারী বীরেন্দ্রনাথ হাজরা এবং তাঁহার পত্নী অন্নপূর্ণা দেবীর ব্যাকুল আহ্বানে দুইজন আশ্রমকুমারীসহ ১৩৩০ সালের প্রথমভাগে গৌরীমা জামসেদপুর গিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে দিন দশেক ছিলেন। প্রত্যহ অনেক নরনারী মাতাজীকে দর্শন করিতে আসিতেন।

টাটা-কোম্পানীর অন্যতম কর্ম্মচারী সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশস্ত গৃহে মহিলাদিগের একটি সভা হয়। গৌরীমা মহিলাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের হিতসাধনার্থ

যথাসাধ্য কাজ করিতে বলেন। এই উদ্দেশ্যে একদিন 'এল্-টাউনে'ও একটি মহিলা-সভার অধিবেশন হয়।

জামসেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটীর সেবকগণ মাতাজীর নিকট একদিন বলিলেন, "আমরা মহারাজদের মুখে শুনেছি, ঠাকুর আপনার হাতের রান্না খেতে খুব ভালবাসতেন। আমরা কিন্তু আপনার হাতের রান্না প্রসাদ একদিন খেতে চাই।" মাতাজী সানন্দে তাঁহাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন, একদিন জগা-খিচুড়ি রান্না করিয়া তাঁহাদিগকে পরমস্নেহে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

জামসেদপুর সম্পূর্ণ আধুনিক নগর। একদিন খাদ্যাখাদ্যের প্রসঙ্গে মাতাজী বলেন,—হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যাহা অখাদ্য কুখাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, সেইসকল দ্রব্য এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। শাস্ত্রানুমোদিত সাত্ত্বিক খাদ্যের মধ্যেও যথেষ্ট পুষ্টিকর উপাদান রহিয়াছে। সাত্ত্বিক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দেহকে পরিপুষ্ট করে। পক্ষান্তরে কতকগুলি খাদ্য আপাতমুখরোচক হইলেও পরিণামে দেহের অনিষ্ট করে, এই কারণেই আমাদের শাস্ত্রকারগণ খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক বিধিনিষেধের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। উহা আমাদের মানিয়া চলা উচিত।

মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

রাজা রাও নামে গৌরীমার একজন মাদ্রাজী শিষ্য ছিলেন। তিনি জাতীয় মহাসভার অধীনে দেশের সেবায় দীর্ঘকাল আত্ম-

নিয়োগ করেন এবং পরবর্ত্তী কালে মাদ্রাজ সরকারের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়, মহাত্মা গান্ধী তখন কলিকাতায়, রাজা রাও আসিয়া একদিন মাতাজীকে বলেন,—মহাত্মাজীর নিকট আপনার কথা এবং আশ্রমের কথা বলিয়াছি। চলুন না একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। মাতাজী এবং একজন আশ্রমবাসিনী রাজা রাও-এর সঙ্গে একদিন তথায় গেলেন। গান্ধিজী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শ্রদ্ধাসহকারে মাতাজীকে অভ্যর্থনা করেন। মাতাজী ভাল হিন্দী বলিতে পারিতেন, তাহাতেই কথাবার্ত্তা চলিল। হিন্দী ভাষায় তাঁহার অধিকার দেখিয়া গান্ধিজী বিস্ময় প্রকাশ করেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গে গান্ধিজী বলেন, গৃহস্থমাত্রেরই আদর্শ হওয়া উচিত—রামচন্দ্র এবং সীতাদেবী। ঘরে ঘরে সীতাদেবীর আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠুক। ইহাতেই সংসারে শান্তি এবং শ্রী ফিরিয়া আসিবে।

অতঃপর গান্ধিজী বলিলেন, মাতাজি, এইবার আপনি কিছু বলুন, আমরা শুনি।

মাতাজী প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলিলেন। তাহার পর, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—এবারকার ঠাকুরের লীলা সকল রকমেই অপূর্ব্ব। তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিজের সাধনা। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী এবার কেবল সহধর্ম্মিণী এবং

লীলাসঙ্গিনী নহেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে জগজ্জননীজ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। পত্নীকে ভগবতীজ্ঞানে পূজা, এরকমটি আর কোন যুগে দেখা যায় নাই। ঠাকুরের আর এক বৈশিষ্ট্য,—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিবার শিক্ষাদান। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ যুগাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি ঠাকুরের ইচ্ছারই অভিব্যক্তি মাত্র।

মাতাজীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া গান্ধিজী আনন্দ প্রকাশ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভক্তি ও বিস্ময়ে এমনই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, মাতাজীর প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সজলনয়নে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মাতাজী তাঁহাকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

স্বামী ভোলানন্দ গিরি

গৌরীমা ও ভোলানন্দ গিরি উভয়ের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু লিখিয়াছেন,—

"* * গ্রীষ্মকালে এক ছুটির দিনে দুপুর বেলা মাকে দর্শন কর্ত্তে যাচ্ছিলুম। পথে হরিদ্বারের শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা। মহারাজের সঙ্গে পূর্ব্বেই আমার পরিচয় ছিল। এভাবে তাঁকে দেখে আমার ভারী আশ্চর্য্যবোধ হলো। আমি কাছে যেতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'আরে, বীরেন বাবু যে, এদিকে কোথায় যাচ্ছ ?"

"আমি বল্লুম, 'এখানে এক সন্ন্যাসিনী মাতাজী থাকেন—গৌরীমায়ী, তাঁকে দর্শন কর্ত্তে যাচ্ছি।'

"মহারাজ বিস্মিত হয়ে বল্লেন, 'গৌরীমায়ী! তিনি কি কাছেই থাকেন? তাঁর সঙ্গে যে আমার বহু বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ে দেখা হয়েছিলো, চল, আমিও যাবো।'

"মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মাতাজীর আশ্রমে গেলুম। সংবাদ পাঠাতেই তিনি নীচে নেবে এলেন, বাইরের ঘরে। ছ'জনের দেখা হতেই ভারী আনন্দ। বহুক্ষণ ধ'রে হরিদ্বারের এবং হিমালয়ের তপস্যাকালের অনেক পুরণো কথা হলো।

"মা'র আশ্রমের আদর্শ এবং সন্ন্যাসিনী গঠনের কথা শুনে গিরি মহারাজ ভারী আনন্দ প্রকাশ কল্লেন। মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে লাগলেন, 'মাতাজী যে কি কঠোর তপস্যা করেছেন, তা এখন কলকাতার ঘরে বসে তোমরা ঠিক বুঝবে না। আবার দেখছি, কত বড় মহৎ কাজে নিয়ে নেবে পড়েছেন। মাতাজীকে সাধারণ মানুষ মনে করো না, বীরেন বাবু।' মহারাজের মুখে মা'র কথা শুনে, আর মা'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিলো।"

কালী বড়, না কৃষ্ণ বড়,

একবার গৌরীমা শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া দেখেন, বহুলোকের ভিড়। একস্থানে দেখা গেল, দুই দল লোকের মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে,—কালী বড়, না কৃষ্ণ বড়?

তাহাদের তর্ক শুনিয়া গৌরীমা হাসিতে হাসিতে সঙ্গের

সন্তানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ঐ শোন, লোকগুলোর খেয়েব'সে আর কোন কম্ম নেই—কালী বড়, না কৃষ্ণ বড়! দাঁড়া, ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি।"

তিনি আস্তে আস্তে যাইয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া তার্কিকগণ সসম্ভ্রমে কতকটা জায়গা খালি করিয়া দিল। সেখানে বসিয়াই তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজীরা, আগমেশ্বরীতলার সেই কলার গল্প শুনেছ তোমরা?" একে অন্যের মুখের দিক কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া জানাইয়া দিল, এমন কথা তাহারা কখনও শুনে নাই। ক্রমে আরও লোক আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গৌরীমা গল্প আরম্ভ করিলেন,—

অনেক কাল আগেকার কথা। আগমেশ্বরীতলায় তুই ভাই বাস্ করতেন। বড় ভাই ছিলেন—গোপাল-সাধক, ছোট ভাই —কালী-সাধক। তু'জনেরই খুব নিষ্ঠা আর ভক্তি; কিন্তু উভয়েই নিজ নিজ ইষ্ট দেবতাকে অন্যের ইষ্টদেবতা হ'তে বড় ব'লে মনে করতেন। এই নিয়ে ভা'য়ে ভা'য়ে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে তর্কও চলে, কিন্তু কে বড়, কে ছোট, তা'র আর কোন মীমাংসা হয় না।

তাঁদের বাগানে নতুন একটা গাছে এক কাঁদি কলা শীগ্‌গিরই পাকবে, এই অবস্থা। তু'ভাই-ই তু'বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তা' দেখে যান, আর ভাবেন—কলার কাঁদি পাকলে ইষ্টদেবতাকে তা' দিয়ে আগে ভোগ দেবেন। বড় ভাই একদিন দেখলেন, সেই

কলাগাছের উপর একটা কাক বসেছে। তিনি মনে করলেন, কলা পেকেছে, তাই কাক এসে বসেছে। কলার কাঁদিটা কেটে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি ঝুলিয়ে রেখে দিলেন।

ছোট ভাই বাইরে গিয়েছিলেন কি কাজে, ফেরার পথে দেখেন, গাছে কলা নেই। আর কোথায় যায়! বাড়ীতে ঢুকেই তিনি দাদার সঙ্গে কোঁদল সুরু করে দিলেন, "আমি এদ্দিন ধ'রে কলার কাঁদি পাহারা দিচ্ছিলুম, পাকলে মাকে ভোগ দেবো; তুমি একবার আমায় জিজ্ঞেস না ক'রে, সবই তোমার গোপালকে দিয়ে দিলে!"

বড় ভাই তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "না ভাই, ভুল বুঝেছ। কাকে ঠুকরে এঁটো করলে, তা'তে দেবতার ভোগ হয় না, তাই আমি কাঁদিটা কেটে এনেছি। গোপালকে ভোগ দিইনি এখনো। তা' তুমি তোমার মাকেই ভোগ দাও।"

ছোট ভাই চটেই আগুন, বলেন, "চাইনে তোমার দান। তুমি গোপালের নাম ক'রে এনেছ, তাঁকেই ভোগ দাও! আমার মায়ের ভোগ ওতে চলবে না।"

কলার মীমাংসা তাঁদের আর হলো না।

তারপর একদিন বড় ভাই ঠাকুরঘরে পুজো কচ্ছিলেন। অনেক দেরী দে'খে ছোট ভাই ভাবলেন, দাদা নিশ্চয়ই গোপালকে আজ কলা ভোগ দিচ্ছেন। এজন্য তা'র দুঃখুও হচ্ছিল, হিংসেও হচ্ছিল। তবু দাদা কিভাবে গোপালকে নতুন গাছের কলা ভোগ দিচ্ছেন, সে দৃশ্য দেখবার লোভ সামলাতে না পেরে তিনি বাইরে

থেকেই দরজাটা ফাঁক ক'রে ভেতরে তাকালেন। ভেতরে যা' দেখলেন, তা'তে স্তম্ভিত হ'লেন, দেহ তাঁর কাঁপতে লাগলো। দেখলেন, তাঁর আরাধ্যা দেবী মা কালী দাদার গোপালকে কোলে বসিয়ে পরমস্নেহে কলা খাইয়ে দিচ্ছেন। এই-না দেখে, ছোট ভাই 'দাদা, দাদা,—মা, মা' ব'লে চীৎকার ক'রে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।

গল্প শেষ করিয়া গৌরীমা বলিলেন, "মানুষের ঘোলা মন, দৃষ্টি খাটো, তাই এত ভেদবুদ্ধি। কেবল ঝগড়া ক'রে মরে। ঠাকুরদেবতারা আসলে এক,—কোন ভেদ নেই।"

ভগবানকে কি পাওয়া যায়

অতঃপর রেলগাড়ীতে উঠিয়া গৌরীমা মহিলাযাত্রীদিগের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। পাশের কামরায় মেদিনীপুরের একজন সবজজ উঠিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। গৌরীমার পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য তিনি বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গাড়ীর অপর কয়েকজন ভদ্রলোকও ইহাতে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।

পরবর্ত্তী এক ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে তাঁহারা গৌরীমার নিকট গিয়া নিবেদন জানাইলেন, তাঁহাদের গাড়ীতে তাঁহাকে একবার পদার্পণ করিতে হইবে, তাঁহারাও ধর্ম্মকথা শুনিবেন। তাঁহাদের আগ্রহে গৌরীমা সেই কামরায় গেলেন।

ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা হইতে হইতে অনুভূতির কথা উঠিল। সবজজ গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবানকে কি সত্যই দেখা যায়, মা?"

গৌরীমা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা। তবে তাঁকে পেতে হ'লে সাধনভজন চাই। মানুষ চায় ফাঁকি দিয়ে 'বেয়ারিং পোষ্টে' পার হ'তে, তা' কি কখনো হয়? সবটা মন দিয়ে তাঁকে ভালবাসলে, একেবারে মানুষের মতই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়।"

অতঃপর সবজজ মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "একটা কথা, মা,—বলবেন কি?"

—"বাধা না থাকলেই বলবো।"

—"মা, আপনি কখনো ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন?"

এই প্রশ্নে গৌরীমা হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "কঠিন প্রশ্নই করেছ, বাবা। কি বলবো বল? হাঁ, বলাও উচিত নয়, না-ও বলা যায় না। এসব কথা কি খুলে বলতে আছে?"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভগবানকে যে সত্যিকারের ভালবাসতে পারে, ভগবান কি তা'কে দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন? তিনি ভক্তের কাঙ্গাল, ভক্ত ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকলে, তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গেলে, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁকে পাওয়া অসম্ভব অথবা খুবই কঠিন, এমন কথা তোমরা মনে করো না। আপনাকে একেবারে ভুলে যে তাঁকে সর্ব্বস্ব দিয়ে দিতে পারে, তেমন ভক্তের কাছে তাঁকে ধরা দিতেই হবে।"





মাতৃজাতির দুঃখে

একদা গঙ্গাতীর দিয়া যাইবার সময় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক নির্জ্জন স্থানে গৌরীমা দেখিতে পাইলেন, একটি স্ত্রীলোক দুইটি শিশুসন্তান লইয়া, একটিকে বুকে এবং অপরটিকে পিঠে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গৌরীমা তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন এবং তাঁহার নিকট শুনিলেন যে, স্বামী ও শাশুড়ীর অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়াই তিনি সন্তানদ্বয়সহ আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

আর একদিন গৌরীমা লোকমুখে সংবাদ পাইলেন যে জনৈকা স্ত্রীলোক মাণিকতলায় খালের জলে সন্তানসহ ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি তখন সেই স্থানে গিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, স্বামীর অবহেলা এবং সংসারের অশেষ দুঃখদৈন্যের পীড়নেই স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহারই কিছুদিন পর আর এক স্থানে মাতাজী দেখিলেন যে, একটি বিধবা নারী সংসারের উৎপীড়নে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন।

উপর্য্যুপরি এইরূপ কয়েকটি শোচনীয় ঘটনায় তিনি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং ইহার প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতে তাঁহার মনের ব্যথা কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে,—

আয় রে কে মায়ের ছেলে, খেলায় ভুলে থেক না রে।
মা বেড়ায় ঐ কেঁদে কেঁদে পথে পথে দেখ না রে॥

অন্নাভাবে তনু ক্ষীণা ছিন্নবস্ত্রে দীনা হীনা
কেঁদে বেড়ায় কে মলিনা দেখ না রে।
এলোকেশে পাগলীবেশে, কাঙ্গালিনী দেশে দেশে,
নয়নধারায় ধরা ভাসে, এ দশায় আর রেখ না রে।
মায়ের দুঃখ দেখিয়া হায়, পাষাণবুকও ফেটে যায়,
তাদের সুখ শান্তি কোথায়, এ দশায় আর রেখ না রে॥

দুঃস্থা নারীর সাহায্যে

বারাকপুর-আশ্রমে একদিন ভদ্রঘরের জনৈকা দুঃস্থা বিধবা তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মাতাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিদারুণ অভাবের কথা জানাইয়া উভয়কে আশ্রমে স্থান দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অবস্থা শুনিয়া মাতাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আশ্রমের নিয়মানুযায়ী মাতাপুত্রকে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব হইল না।

অনেক ভাবিয়া অবশেষে মাতাজী তাঁহার জনৈক সন্তান ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয় লিখিলেন।

ললিতকুমার তখন কাশিমবাজারের স্বনামধন্য দানবীর মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের প্রধান কর্ম্মসচিব। তিনি তদুত্তরে জানাইলেন যে, মাতাজী যদি এই বিষয়ে মহারাজকে বলেন, তবে সহজেই উক্ত বিধবার উপায় হইতে পারে। এই উপলক্ষে তিনি মাতাজীকে একবার তাঁহার মুর্শিদাবাদের

বাড়ীতে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি সম্মত হইলে তাঁহাকে তথায় লইয়া যান।

কাশিমবাজার-রাজবাটীতে মহারাজ পরম-শ্রদ্ধাসহকারে মাতাজীকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহার নিকট দুঃখিনী বিধবার কথা শুনিয়া সদাশয় মহারাজ অবিলম্বে ঐ বিধবা ও তাঁহার পুত্রের ভরণপোষণ এবং শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মাতাজীর সহিত মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া এবং তাঁহার নারীশিক্ষার আদর্শ শুনিয়া মহারাজ বিশেষ প্রীত হন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে কাশিমবাজার যাইতে অনুরোধ করেন।

ইহার কয়েকবৎসর পর জননায়ক রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর আর একবার মাতাজীকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যান এবং সমাদর করিয়া নিজগৃহে রাখেন। এবারও মাতাজীর সহিত মহারাজের সাক্ষাৎকার এবং আশ্রমসম্বন্ধে আলোচনা হয়। মহারাজ আশ্রমকে একখণ্ড ভূমি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু নানাকারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

জলমগ্না বালিকার জীবনরক্ষা

কলিকাতায় একদিন প্রত্যূষে গৌরীমা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন, সঙ্গে আশ্রমবাসিনী কয়েকজন বালিকা। গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি লোক ঘাটে জড় হইয়া কেবল 'হায়, হায়' করিতেছে। গঙ্গার দিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, একটি মেয়ে স্রোতের জলে একবার ডুবিতেছে,

আর একবার ভাসিতেছে। দেখিয়াই ব্যাপারটা বুঝিয়া তিনি দর্শকমণ্ডলীকে একবার মাত্র তিরস্কার করিলেন, "একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে, আর মরদগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে," এবং তৎক্ষণাৎ আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া 'জয় মা কালী' বলিয়া তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন। আবেগের আতিশয্যে ভুলিয়াই গেলেন যে, নিজে সাঁতার জানেন না।

এদিকে আশ্রমের বালিকাগণ তাঁহাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ঠাকুমা, আপনি আর এগোবেন না, ডুবে যাবেন।" তখন উপস্থিত দুই-তিন ব্যক্তি মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সাঁতার কাটিয়া সেই মেয়েটিকে তুলিয়া আনিলেন। মেয়েটি একটু সুস্থ হইলে জানা গেল, স্নান করিতে গিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌরীমা আশ্রমের গাড়ীতে করিয়া মেয়েটিকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং মৃগীরোগগ্রস্তা বালিকাকে এভাবে একা ছাড়িয়া দেওয়া যে কত অন্যায় হইয়াছে, তাহা তাহার অভিভাবকগণকে বুঝাইয়া সতর্ক করিয়া দিয়া আসিলেন।

বিপন্ন জীবের উদ্ধার

মূক এবং বিপন্ন জীবের প্রতি গৌরীমা কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহারও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি কুকুরশাবকের জন্য তিনি নিজের জীবনকে কিভাবে বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আশ্রম তখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে। একদিন দুই-তিনটি হনুমান একটি ছোট কুকুরশাবককে কিভাবে যেন ছাদের উপর তুলিয়া পীড়ন করিতে থাকে। এই করুণ দৃশ্যে গৌরীমার চিত্ত ব্যথিত হইল। এই বিপন্ন জীবটিকে কি উপায়ে হনুমানের কবল হইতে উদ্ধার করা যায়, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমে যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাতে সুফল দেখা গেল না।

একতলা হইতে একটা বাঁশের সাহায্যে সেই হনুমানগুলিকে তাড়াইতে না পারিয়া তিনি ছাদে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। অথচ সেই বাড়ীর ছাদে উঠিবার কোনও সিঁড়ি ছিল না। তিনি শক্ত করিয়া কাপড় পরিলেন এবং কোমরে একটা লাঠি গুঁজিয়া লইয়া একটা জীর্ণ পিচ্ছিল প্রাচীর বাহিয়া ধীরে ধীরে ছাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় হনুমানগুলি ছাদের আলিশায় আসিয়া মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহার মাথার উপর লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তখন মাতাজী একস্থানে বসিয়া লাঠিটা বাহির করিয়া হনুমানগুলির সম্মুখে ঘুরাইতে লাগিলেন। ইহাতে সুফল দেখা গেল। হনুমানগুলি ভয়ে সরিয়া গেল। তিনি তখন ছাদের উপর উঠিয়া কুকুরশাবককে কাপড়ের মধ্যে বাঁধিয়া লইলেন এবং সাবধানে পুনরায় নীচে নামিয়া আসিলেন।

তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আশ্রমবাসিনীগণ তাঁহাকে বলিলেন, "একটা কুকুরছানার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন মা, ভাগ্যিস পড়ে যান নি, তাহ'লে কি হতো!"

তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের সৃষ্ট একটি অসহায় জীব এভাবে চোখের সামনে মরবে, সেটাই কি ভাল হতো ?"

পানাসক্তের সুমতি

একবার গৌরীমা ঘাটালে গিয়াছিলেন, এক মদ্যপায়ী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। মাতাজী শুনিলেন যে, তিনি ঐ স্থানের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি, কিন্তু পানদোষের জন্য তাঁহার সংসারে বড় অশান্তি। তিনি আগ্রহসহকারে মাতাজীর পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলে, মাতাজী হঠাৎ একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলেন, "আমি মাতালের প্রণাম নিই না।"

ইহাতে ঐ ব্যক্তি মনে মনে ব্যথিত হইয়া বলেন, "তুমি ত জগতের মা, তুমি কি মাতালের মা নও ?"

তাঁহার কথার উত্তরে মাতাজী বলেন, "তা বেশ, মদ খাওয়া ছেড়ে দাও তোমারও মা হব।"

"তা হ'লে এই আশীর্ব্বাদই কর," এই বলিয়া সেই ব্যক্তি বাহির হইতেই মাতাজীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, আর আসেন নাই।

ইহার কিছুকাল পরে ঘাটালের জনৈক সন্তান জানাইলেন যে, মাতাজীর আশীর্ব্বাদে মদ্যপায়ী ভদ্রলোকটি সত্যই মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে,—তিনি এখন মাতৃভাবে বিভোর।

প্রথম দীক্ষাদান

প্রব্রজ্যাকালে গৌরীমা যখন বিন্ধ্যাচলে, তখন তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুমার ব্রহ্মচারী তাঁহার দর্শন লাভ করেন। মাতাজীকে প্রথম দর্শন করিবামাত্র নগেন্দ্রনাথের মনে হইল—ইনিই আমার গুরু। তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গৌরীমা দীক্ষাদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রনাথ ইহাতে ভাবিলেন যে, মা তাঁহাকে দীক্ষাদানের অনুপযুক্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মায়ের দরজায় পড়িয়া রহিলেন। কোন সময় মা বাহিরে আসিলে এই ভক্তসন্তান তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা মৌনকাতরতায় প্রকাশ করিতেন। কঠোর সন্ন্যাসিনী পুনরায় জানাইয়া দিলেন, তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন না। দীক্ষাপ্রার্থী সন্তান ইহাতেও নিরাশ হইলেন না।

একদা প্রত্যূষে মৃদুস্বরে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গৌরীমা গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। ঐ মধুর নাম শ্রবণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন,—মা, এই ত আমার দীক্ষার মন্ত্র লাভ হইয়া গেল! আপনার মুখনিঃসৃত যে মহামন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই আমি জপ করিব।

গৌরীমা হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার ত কৃষ্ণমন্ত্র নয় বাবা, তোমার দীক্ষা হবে শক্তিমন্ত্রে।"

তাঁহার এই কথায় নগেন্দ্রনাথের সুযোগ উপস্থিত হইল, তিনি পুনরায় কাতরতা প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহার ব্যাকুলতা এবং বৈরাগ্যদর্শনে গৌরীমা মনে মনে প্রীত হইয়াছিলেন এবং সেই দিনই তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন। ইনিই গৌরীমার প্রথম মন্ত্রশিষ্য। পরবর্ত্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ইনি ভগবদারাধনায় জীবনপাত করেন।

শ্রীললিতা সখীর কথা

গৌরীমার মন্ত্রশিষ্য নহেন অথচ তাঁহার নিকট উপদেশ ও অনুপ্রাণনা লাভ করিয়া ত্যাগতপস্যার পথে অগ্রসর হইয়াছেন এমন অনেক ভক্ত ও সাধকের কথা আমরা জানি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৌরীমার নিকট দীক্ষাপ্রার্থীও হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধিসঙ্গত দীক্ষা না দিয়া, সাধনভজনের পথের নির্দ্দেশ দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন,—এভাবে এগিয়ে চলো। গুরুর জন্যে অস্থির হয়ো না, গুরু যার যার নির্দ্দিষ্টই রয়েছেন, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হবেন।

এইস্থানে আমরা এইরূপ একজন সাধকের কথা উল্লেখ করিতেছি। তিনি শ্রদ্ধেয়া ললিতাসখী, পূর্ব্বাশ্রমের নাম গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। যখন কিশোরবালক, দক্ষিণ-কলিকাতায় থাকিতেন, গৌরীমার সহিত তাঁহার পরিচয়। তখন হইতেই গৌরীমার প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনেতিহাস শুনিতেন, ধর্ম্মোপদেশ

শুনিতেন। একদিন গৌরীমার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে তিনি এমনই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই দিনই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে সিদ্ধপুরুষ চরণদাস বাবাজীর নিকট তিনি দীক্ষালাভ করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বারাকপুর-আশ্রমে গৌরীমার একবার টাইফয়েড জ্বর হয় এবং সংবাদ পাইয়া তিনি মায়ের সেবাশুশ্রূষার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। মা সুস্থ হইবার পরই তাঁহাকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। এই সময়ে তাঁহার লিখিত একখানি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। গৌরীমাকে তিনি কিভাবে দেখিতেন তাহার পরিচয় এই পত্রে পাওয়া যায়।—

ওঁ হরি

৺নবদ্বীপ পোঃ
৺চৈতন্য চতুষ্পাঠী, ব্রজরাজ গোস্বামীর বাড়ী
সন ১৩০৩।৯ চৈত্র

শ্রীশ্রীদামোদরায় নমঃ॥

শ্রীচরণে শত সহস্র কোটি কোটি নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন এই, মাগো! অদ্য প্রাতে আসিয়া নবদ্বীপ পহুছিয়াছি।...

আজ কি বলে পত্র লিখিব তাহাই জানিনা কারণ আজ আমার প্রাণ যেরূপ করিতেছে মাতার জন্য কি পুত্রের প্রাণ এরূপ হয়? তবে কি ইষ্টদেবী বলিব, না তাহাতেও প্রাণ শান্ত

হয় না। তবে কি বলিব শাস্ত্রাদিতে বলে যে "মা হইতে জগতে আর উচ্চ জিনিষ নাই", আমি দেখি যে জগতে এরূপ কোনও পদার্থ ভগবান সৃষ্টি করেন নাই যাহার সহিত ঐ স্নেহময়ী মূরতিখানির তুলনা দিব, যাহার সহিত ঐ মধুমাখা বাক্যগুলির উপমা দিব।......

মা! অনেকদিন হইল আপনার সঙ্গে আলাপ কিন্তু কৈ এরূপ ভাব ত মনে কখনই হয় নাই। মাতঃ! আমি বড়ই হতভাগ্য, বড়ই অপাত্র, বড়ই মূর্খ, বড়ই কুলাঙ্গার, তাহা না হইলে এমন মা যার ঘরে তাহার ছেলে কিনা শুক পাখির ন্যায় দুই চারিটা কথা মুখস্থ করিবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে? কি হইবে, দুইখানা বই পড়িলেই কি কিছু হইল? দেশে দেশে ঘুরিলেই কি কিছু হইল? লোকের কথায় কি হইবে।...

মা! পড়াশুনা কিছুই ভাল লাগেনা, লোকের কথা শুনিতে ভাল লাগেনা, চুপ করে একস্থানে বসে বসে কেবল মা মা বলে ডাকিতে বাসনা হয়। অনেক লিখিব বলে আশা ছিল আর পারিলাম না। লিখিতে গেলেই কেবল মা কথা লিখিতে ইচ্ছা হয়। যে লোক মা অক্ষরটী সৃষ্টি করেছিল তাহার প্রাণ যে কি রকম ছিল তাহা বলা যায় না।...

দ্বারিকবাবু মুচিরামদাদা প্রভৃতিকে আমার সবিনয় নিবেদন জানাইবেন। তাহারাই ভাগ্যবান, মার শুশ্রূষা করা ভাগ্যবান ভিন্ন কখনও হয় না। এ হতভাগার ভাগ্যে হইল না। সেবা

করা দূরের কথা এতদিন থেকে মাকে যে কত জ্বালাতন করেছি সে সকল দুঃখ যে কবে দূর করিব জানিনা। ইতি

সেবকাধম শ্রীচরণদাসানুদাস…

গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পরবর্ত্তী কালে আমাদিগের নিকট একখানি পত্রে গৌরীমার প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "আমার জীবনে যাহা কিছু লাভ করিয়াছি তাহার মূল একমাত্র মায়ের কৃপা।"

পথভ্রষ্টাকে পথের নির্দ্দেশ

ত্রিবেণীর তটভূমিতে গৌরীমা তপস্যা করিতেছিলেন। একদিন জনৈকা মহিলা ঐরূপ স্থানে একাকিনী এই সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইয়া স্নানান্তে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসিনী তখন ধ্যাননিমগ্না। তাঁহার দীপ্ত প্রশান্ত মুখমণ্ডল-দর্শনে মহিলা মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন।

ধ্যানান্তে গৌরীমা তন্ময় হইয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন। চতুষ্পার্শ্বের জগৎ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে অতিবাহিত হইল। মহিলা কি-এক দৈব আকর্ষণে মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সেই স্থানে বসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনীর উদাত্ত-কণ্ঠনিঃসৃত চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না,—কে এই সন্ন্যাসিনী? মানবী, না দেবী!

পাঠ সমাপন করিয়া গৌরীমা চাহিয়া দেখেন,—পার্শ্বেই উপবিষ্টা এক রূপবতী নারী, বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা। কিন্তু মুখে বিষাদের ছায়া, নয়নে অশ্রুধারা। গৌরীমা স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি? কাঁদছ কেন?"

সেই স্নেহার্দ্র প্রশ্নে নারীর অন্তরের রুদ্ধ বিক্ষোভ অধিকতর উদ্বেল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। পরে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, "আমার কি কোন উপায় আছে, মা?"

গৌরীমা বলেন, "উপায় ভগবান। কিন্তু, কি হয়েছে তোমার? তোমার দুঃখু কিসের?"

ক্ষণেকের ভুলে কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিয়া নারী বলিলেন, "আপনি আমায় শান্তির পথ দেখিয়ে দিন।"

—সে পথ যে ভারী কঠিন। সকল রকম বিষয়বাসনা না ছাড়লে সে পথে এগোনো যায় না।

—সে পথ যত কঠিনই হোক, মা, আমি তা গ্রহণ করবো। আমার এ শান্তিহীন জীবনের একটা উপায় ক'রে দিন। আমি আর ঘরে ফিরবো না।

—বেশ, সত্যিকারের অনুতাপ যদি তোমার এসে থাকে, তা হ'লে পারবে। যদি প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের সন্ধান পেতে চাও, তবে সব ছেড়ে ভগবানকে ডাক। পেছন ফিরে চেয়ো না।

এইরূপে গৌরীমা তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দান করিলেন

এবং হৃষীকেশে গিয়া লোকালয়ের বাহিরে দিবারাত্র সাধনভজনে নিমগ্ন থাকিতে বলিয়া দিলেন। অনুতপ্তা নারী যমুনার জলে তাঁহার সকল স্বর্ণালঙ্কার বিসর্জ্জন দিলেন, কাটিয়া ফেলিলেন কেশরাশি এবং অতিশয় দীনহীনার বেশ ধারণপূর্ব্বক সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া সেইস্থান হইতেই হৃষীকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দীর্ঘকাল পরে হৃষীকেশে গৌরীমার সহিত এই মহিলার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। গৌরীমা প্রথমতঃ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই; মহিলা প্রয়াগতীর্থের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। গৌরীমা বুঝিলেন, মহিলা সাধনভজনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন।

পুরুষবেশে

প্রব্রজ্যাকালে গৌরীমা সময় সময় যে পুরুষ-সাধুর বেশে থাকিতেন এবং কদাচিৎ কৌতুকচ্ছলেও পুরুষের বেশ ধারণ করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্থানে অনুরূপ আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে,—

অনেক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা টাউন-হলে একটি ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন হয়। ভূপেন্দ্রকুমার বসু (বিবেকানন্দ-সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ভক্তগণ ঐ সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহারা গৌরীমাকেও আমন্ত্রণ করেন। গৌরীমা আলখাল্লা ও

পাগড়ি পরিয়া পুরুষ-সাধুর বেশে উক্ত সভায় যোগদান করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং আত্মপ্রকাশ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার পরিচিত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই ঐরূপ বেশধারী গৌরীমাকে চিনিতে পারেন নাই।

আর একবার, শ্যামনগরে অবস্থানকালে তথাকার কয়েকজন মহিলা একদিন কথাচ্ছলে গৌরীমার পুরুষবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এখন বলছ বটে, কিন্তু সে বেশ দেখলে তখন ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে যাবে।" মহিলাগণ তথাপি আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কয়েকদিন পর গ্রামে বারোয়ারি কালীপূজা হইতেছিল। সন্ধ্যার পর রাখালবাবু নামক স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে কে আসিয়া দরজায় কড়া নাড়িতে লাগিল। রাখালবাবুর মা দরজা খুলিয়া অন্ধকারে দেখিলেন—এক আগন্তুক, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি, গায়ে অদ্ভুত কাল পোষাক, মাথায় টুপি। দেখিয়াই তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ইতোমধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আগন্তুকের সম্মুখে তাঁহার মাকে তদবস্থায় দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। তখন "Babu take care of your mother" (বাবু, তোমার মাকে দেখ), এই বলিয়া আগন্তুক সেইস্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য নামক আর এক প্রতিবেশীর অন্তঃপুরে বসিয়া তিনজন মহিলা গল্প করিতেছিলেন। এমন সময়

"কোই হ্যায় রে" বলিয়া সেই আগন্তুক তাঁহাদের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অকস্মাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে ঐরূপ অদ্ভুতবেশধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া মহিলাগণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

আগন্তুক তখন হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন গো, বড় যে বলেছিলে, যোগিনী-মাকে পুরুষবেশে দেখে কেউ ভয় পাবে না!"

গৌরীমা তখন মহিলাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তিন-তিনটে মানুষ নিজেদের বাড়ীর অন্দরের মধ্যে ব'সে রয়েছ, হাতের কাছেই ঘটি, বাটি, কাটারীও রয়েছে। যখন দেখলে, একটা অচেনা বেটাছেলে অন্দরে ঢুকেছে, চীৎকার করবার আগে না হয় লোকটার দিকে একটা কিছু ছুড়েই মারতে। আমাদের দেশের মেয়েরা হঠাৎ একটা বেটাছেলে দেখলে অত ভয় পায় কেন! তিনটে মেয়েতে মিলে কি একটা লোককে তাড়ানো যায় না? শুধু ভালমানুষ হ'লেই চলবে না, আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের শক্তিমতীও হ'তে হবে।"

নির্য্যাতিতা যাত্রীদের মুক্তি

একবার একদল নারীতীর্থযাত্রী গদাধরের চরণদর্শন-মানসে দূরদেশ হইতে গয়াধামে আসেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ না পাওয়ায় পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে একটি গৃহে

আবদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং অধিক টাকা না দিলে কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, এই বলিয়া শাসাইতে লাগিল।

তীর্থপর্য্যটনের উদ্দেশ্যে এইসময় গৌরীমা গয়াধামে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন সূত্রে এই সংবাদ শুনিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য নিজেই ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া তিনি পাণ্ডাদিগকে বলিলেন, "মেয়েদের কাছে আমায় নিয়ে চল, দেখি, আমি এর একটা বিহিত করতে পারি কি-না।"

মাতাজী তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থাই করিবেন, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে যাত্রীদিগের নিকট যাইতে দিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তিনি স্ত্রীলোকদিগের মুখে তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিলেন এবং আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "গদাধর তোমাদের রক্ষে করবেন। তোমরা ভয় পেয়ো না, কেঁদো না।"

তাঁহারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, মা? কা'র সাহায্যে আমাদের উদ্ধার করবেন? আপনিও ত মেয়েমানুষ, আপনাকেও যদি ওরা আটক করে!"

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আটক করবে কে? আমার সেথো-ঠাকুর আছেন। তিনিই তোমাদের উদ্ধার করবেন। তোমরা ভেবো না।"

মাতাজীর কথায় তাঁহারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন। পাণ্ডারা মনে করিল, তিনি তাহাদের টাকার ব্যবস্থা করিতেই যাইতেছেন।

তৎকালে গয়া সহরে হরিহরবাবু নামে এক দারোগা এবং আর একজন ওভারসিয়ার গৌরীমাকে চিনিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। গৌরীমা তাঁহাদের কাছে এই অসহায়া মহিলাদিগের দুর্দ্দশার কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বলেন, "বাবা, পাণ্ডাদের কবল থেকে যেমন ক'রে হোক এই বিপন্ন মায়েদের উদ্ধার করতেই হবে।"

গৌরীমার সহিত দারোগাবাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। দারোগাকে দেখিয়াই পাণ্ডাদের মুখ শুকাইয়া গেল। দারোগা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তোমরা বুঝি আর কাজ পাওনি, মেয়ে-মানুষদের আটক ক'রে পয়সা আদায়ের ফিকিরে আছ?"

দারোগার ভয়ে পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদিগকে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিল। উদ্ধার পাইয়া তাঁহারা আনন্দে গৌরীমার নিকট পুনঃপুনঃ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা সেথো-ঠাকুরকে একবার দেখিতে চাহিলেন। তিনি তখন গলায় বাঁধা দামোদরশিলাকে দেখাইয়া সকলকে বলেন, "ইনিই আমার সেথো-ঠাকুর।"

তেজস্বিতার একটি দৃষ্টান্ত

আশ্রমের জনৈক সেবক—ক—লিখিয়াছেন,—

"বাংলা ১৩২৩।২৪ সালে কলেজের ছুটির অবকাশে মাকে দর্শন করিতে একবার ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি।

মা একদিন বলিলেন, 'রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) অনেক দিন দেখিনি, তোরা কেউ মঠে যাবি ত চল আমার সঙ্গে।'

"বেলুড় মঠে যাইবার সৌভাগ্য ইহার পূর্ব্বে আমার আর হয় নাই, সানন্দে স্বীকৃত হইলাম। আরও কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে চলিলেন। মঠে যাইয়া রাখাল মহারাজের প্রতি মায়ের যে স্নেহ দেখিলাম এবং মহারাজেরও মায়ের প্রতি যে ভক্তিবিমিশ্র ভালবাসার পরিচয় পাইলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়—স্বর্গীয় ভাবের বস্তু।

"ফিরিবার সময় বেলুড় মঠ হইতে একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা বাগবাজার ঘাটে আসিয়া নামিলাম। মা এবং আমরা সকলে বাঁধের উপরে উঠিয়া আসিলাম। মাঝিদের ভাড়া মিটাইয়া দিবার জন্য একটি ভক্ত নীচে রহিলেন। মাঝিরা তাঁহাকে মফঃস্বলের লোক বুঝিয়া বেশী ভাড়া হাঁকিয়া বসিল। তিনি তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহা লইয়া মাঝিদের সহিত তাঁহার বচসা হয়; কথায় কথায় এক মাঝি তাঁহার প্রতি অসম্মানসূচক ভাষা ব্যবহার করে। ভক্তটি অসাধারণ বলিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু ইহাদিগের সহিত মারধর করিলে পাছে মা অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কায় তিনি কথাটা হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়া তাহাদিগের দাবী মিটাইয়া দিলেন।

"মা কিন্তু কথাটা শুনিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গম্ভীরমুখে উপর হইতে নৌকার কাছে গিয়া সেই মাঝিকে

একবার তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, 'তু মেরে লেড়কেকো কাহে গালি দিয়া ?' বলিয়াই তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন।

"তারপর সেই ভক্তকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'মরদ্ হ'য়ে এমন গালিটা বেমালুম হজম করে ফেল্‌লে ! তোমাদের আত্ম-সম্মানবোধ নেই ! নয়, ঘু'ঘা দিয়ে ঘু'ঘা খেতেই।'

"মায়ের সাহস দেখিয়া ততক্ষণে আরও লোক আসিয়া সেখানে জড় হইল। মা অবিচলিতচিত্তে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

"কলিকাতায় এবং বাহিরে নানাস্থানে মায়ের সহিত যাতায়াতকালে এমন আরও কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মনে মনে মায়ের এইরূপ ব্যবহারের বিচার করিয়াও দেখিয়াছি। আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, মা নিমেষের মধ্যে তাহাই করিয়া ফেলিতেন। পরিণামের গবেষণা করিতেন না।

"অন্যায় দেখিলেই মা তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া উঠিতেন, কখনও তাহা নীরবে সহিয়া যান নাই। অথচ মাকে কোন দিন তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতে দেখি নাই। কোন বিষয়েই পরাজয় তাঁহার কখনও হয় নাই; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিজয়িনীর গর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন।"

আর একটি দুঃসাহসিক ঘটনা

"একদিন মা বেলিয়াঘাটার কোলে-মহাশয়দের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ফিরিবার সময় তাঁহারা একখানি ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া দিলেন। গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই মা

গাড়োয়ানকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে ঠাকুর আছেন, গাড়ীর ছাদে কেহ উঠিবে না। গাড়োয়ান ইহাতে সম্মত হইল।

"সার্কুলার রোড দিয়া গাড়ী আসিতেছিল। শিয়ালদহ ষ্টেশন অতিক্রম করিবার পরেই একটি মুসলমান বালক পিছন দিক দিয়া ছাদের উপরে গিয়া বসিল। আমি দেখিয়াও চুপ করিয়া রহিলাম, কারণ, মা জানিতে পারিলে এখনই একটা বিষম কাণ্ড ঘটিবে। মা কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, তুই দেখেছিস, ওকে বারণ করলি না কেন? আমি কি আর করি, বলিলাম, ছোট্ট একটা ছোকরা উঠেছে মা, ও গাড়োয়ানেরই লোক।

"গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া মা গাড়োয়ানকে বকিতে লাগিলেন। সে জানাইল, মাইজী, ও গাড়ীর সঙ্গেই থাকে। তাহার জবাব অগ্রাহ্য করিয়া মা বলিলেন, তুমি গাড়ী থামাও, আমি তোমার গাড়ীতে যাব না। গাড়োয়ান আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল।

"গাড়ী যখন সার্কুলার রোড ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের ঠিক সংযোগস্থলে, মা চীৎকার করিয়া বলিলেন, আমি তোর গাড়ীতে যা-ব-না, আলবৎ তোকে গাড়ী থামাতে হবে। এই বলিয়াই, গাড়ী থামিবার অপেক্ষা না রাখিয়া, বামদিকের দরজাটা খুলিয়া অকস্মাৎ মা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; স্থান—কুখ্যাত রাজাবাজার।

"রাস্তায় নামিয়াই মা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন এবং দক্ষিণ

হস্ত বাড়াইয়া দিলেন গাড়োয়ানের দিকে, তাহাকে টানিয়া নামাইবেন।

"এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী গাড়োয়ানকে মারিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শতাধিক লোক আসিয়া গাড়ীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

"একজন বৃদ্ধ মুসলমান অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'ক্যা হুয়া মাইজী?' মাতাজী হিন্দীতে উত্তর দিলেন, গাড়ীতে ওঠবার আগেই ওর সঙ্গে আমার কড়ার হয়েছিল যে, আমার মাথার উপরে কেউ বসবে না। ও কেন একটা ছোকরাকে গাড়ীর ছাদে তুলেছে?

"কাহার অদৃশ্য ইঙ্গিতে যেন পলকে ঘটনাস্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জনতার বিচারে সাব্যস্ত হইল, গাড়োয়ানেরই দোষ, কেন সে মাতাজীর কথার অমান্য করিয়াছে। তাহারা গাড়োয়ানকে বকাবকি করিল, ছোকরাকে টানিয়া নামাইয়া দিল। বেগতিক বুঝিয়া গাড়োয়ান বলিল, 'মাইজী, মেরা কসুর মাপ কীজিয়ে।' বৃদ্ধ মুসলমানটি গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া মাতাজীকে অনুরোধ জানাইলেন, 'আপনি এইবার গাড়ীতে উঠুন মা, আর কোন ঝঞ্ঝাট হ'বে না।'

"মা গাড়ীতে উঠিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। সেইদিন ঐরূপ পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইয়া এই কথাই বারবার আমার মনে উদয় হইয়াছিল,—ভগবান যাঁহার সহায়, তাঁহার অনিষ্ট কে করিতে পারে?"

"আমার একটি বন্ধু—তিনি কবি। তিনি বলিতেন, 'বাঙ্গালীর মেয়ের এমন তেজস্বিতা, ওঁর পায়ে মাথা নোয়াতেই হবে।'

"মায়ের চরিত্রে যে সকল বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছি, তন্মধ্যে দুইটি বিপরীত ধারার সম্মেলনে মুগ্ধ হইয়াছি। মায়ের বাহিরে রুদ্রাণীমূর্ত্তি, কঠোর শাসন; আর অন্তরে মাতৃমূর্ত্তি, স্নেহের নির্ঝর,—শুষ্ক কঠিন নারিকেলের অন্তঃস্তলে যেন সুমধুর পানীয়।"

গৌরীমার স্নেহভালবাসা এবং তেজস্বিতার কথায় শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন,—

"* * গৌরীমার স্নেহ ভালবাসার কথা বলিতেছিলাম। এস্থলে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি। বরাবর গৌরীমার নিয়ম ছিল, কোন পালপার্ব্বন হইলেই তিনি পার্ব্বনীস্বরূপ একটি টাকা, আধুলী বা সিকি আমাকে দিতেন। মা যেমন ছোট ছেলেকে পার্ব্বনীর পয়সা দেন ঠিক সেইভাবে দিতেন। আমি সেই টাকা বা সিকিটি মাথায় তুলিয়া প্রণাম করিতাম এবং সকলকে বলিতাম, 'ইহা অতি পবিত্র বস্তু। তোমরা কিছু মিষ্টি আনিয়া সকলে একটু একটু মুখে দাও। ইহা গৌরীমার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ।'

"আর একটি কথা, গৌরীমা যখন যা রাঁধিতেন, বিশেষতঃ তাঁর বিখ্যাত খিচুড়ী যখন রাঁধিতেন, তখন প্রায়ই লোক মারফৎ আমাকে ডাকাইয়া খাওয়াইতেন, এটা তাঁর প্রথা হইয়া গিয়াছিল। একদিন তিনি মালপো করিয়াছেন। বেলা ১ টার সময় গরম মালপো লইয়া একটা রিক্সা করিয়া তিনি

আসিয়াছেন। হাতে তখনও গুলা ময়দা সব লাগিয়া আছে। আমি মধ্যাহ্নে আহারের পর সবে বিশ্রাম করিতেছিলাম। গৌরীমা এসেই আমায় তুলিয়া তাঁহার সম্মুখে এই গরম মালপো খাওয়াইয়া তবে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপ মাতৃস্নেহের বহু উদাহরণ তাঁহার কার্য্যাবলী হইতে দেওয়া যাইতে পারে।

"রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিতর দেবশক্তিপূর্ণ কি ভালবাসা ছিল, যে দেবশক্তির দরুন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এত প্রসার লাভ করিল, তাহা বুঝিতে হইলে গৌরীমার ক্রিয়াকলাপ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। তাহাতে স্ফুলিঙ্গভাবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভালবাসার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। এই ভালবাসাই হইল জীবন্ত ভগবান।

"গৌরীমার মনস্তত্ত্ব বলিতে হইলে, এই বলিতে হয় যে, তিনি অন্তরে পুরুষ, বাহিরে প্রকৃতি, অর্থাৎ চণ্ডীতে যাঁহাকে ('চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা') ভয়ঙ্কর ও ক্ষেমঙ্করী, রুদ্রাণী ও মৃড়ানী বলা হয়। যেমন প্রচণ্ড রুদ্রাণীর ভাব একদিকে, তেমনি স্নেহময়ী মাতৃভাব অপর দিকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা বিপরীত ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাই, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে যে চণ্ডীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে, তাহাতে একসঙ্গে রুদ্রাণীভাব ও মাতৃস্নেহের ভাব দেখা যায়, কিন্তু জীবন্ত মানুষের ভিতর এরূপ কম দেখিয়াছি। গৌরীমার ভিতর এই বিপরীত ভাবের সম্মিলন ও আশ্চর্য্যভাব দেখিয়াছি। * * তাঁর সম্মুখে যাইলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, একটা প্রত্যক্ষ মহাশক্তির কাছে ক্ষুদ্র জীব

গিয়াছে। যেমন গম্ভীর, রাশভারী, প্রত্যক্ষ রুদ্রাণীর মূর্ত্তি, আবার অপরদিকে তেমনি স্নেহময়ী মাতা। * * চণ্ডীতে আদ্যাশক্তি যাহাকে বলে, তাহা গৌরীমাতে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইত।"

বেলুড় মঠে একদিন

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী গৌরীমার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

"সত্যই তাঁর পবিত্র ত্যাগময় জীবনের কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

"সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে যা অল্প পরিচয় আমার হয়েছিল, আজও তার স্মৃতি এক অপূর্ব্ব আনন্দ দেয়। তার মধ্যে একদিনের কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। বোধ হয় ১৯১৫।১৬ হবে। পূজনীয় মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মঠে আছেন, গৌরীমা সকালের দিকে এসেছেন, আমরা—মঠের ছেলেরা সকলেই খুব খুসী। তাঁকে ঘিরে নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হচ্ছে ঃ—শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা, বৃন্দাবন আদি স্থানে তাঁর তপস্যা ও ভ্রমণাদির কথা, এরূপ সব। আমার বেশ মনে আছে, যখন ঐরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি বলছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, ঐ অল্পবয়সে একাকিনী নিঃসম্বল হ'য়ে ভ্রমণ করতে আপনার ভয় করতো না?' উত্তরে যে কয়টি কথা বলেছিলেন তা অপূর্ব্ব তেজে-ভরা, আর তা আমায়—উপস্থিত সকলকেই খুব আনন্দ দিয়েছিল।—

"বাবা, দেহটা নিয়েই ত যত ভয়। তা কলুষিত যাতে না হ'তে পারে, সে বন্দোবস্ত সাথেই রাখতাম।'

"তারপর হঠাৎ গম্ভীর উন্নত শিরগ্রীব হয়ে দৃঢ়স্বরে বল্লেন, 'জানিস্ বাবা, জানিস্, ঠাকুরের কৃপায় পুরুষগুলোকে কীট মনে হয়—আর (দৃঢ়তাসূচক মস্তক সঞ্চালনের সাথে) আর—কীট নীচ হৈ রহত পদতল,—কাদার স্থান এই পায়ের নীচে,—এই—এই' বলে দু'বার বাঁ-পায়ের গোড়ালী সজোরে মেজের উপর ঠুঁকলেন। তখন তাঁর চোখে-মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল, তা অবর্ণনীয়—দৃঢ়—আত্মবিশ্বাস ও তেজবিমণ্ডিত। এখনও সেই ছবি স্মৃতিপটে যেন স্পষ্ট দেখি, আর আনন্দে হৃদয় ভরে যায়। ভাবি তেমনি ছিলেন বোধ হয়—গার্গী, আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী আদি ব্রহ্মবাদিনীরা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আবার ভারতে তাঁদের মত সব হবে,—নিশ্চয়ই হবে। স্বামিজীর ইচ্ছা তিনি নিশ্চয়ই অপূর্ণ রাখবেন না।

"আমার এই পবিত্র স্মৃতিটুকু আপনাদের কাজে লাগলে সুখী হব। বিশেষ মনে হয়—সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগিণী ভগ্নীদের কাজে লাগবে।"

দৃষ্টিতে পাষণ্ডদলন

গৌরীমা কিভাবে দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৃষ্টিমাত্রে শাসন করিয়াছেন, পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় তাহার একটি বিবরণ (১৩৪৬ সালে) লিখিয়াছেন,—

"মনে পড়ে, ৪৪ বৎসর পূর্ব্বের সেই ফাল্গুনী সংক্রান্তির অভিনন্দনীয় পুণ্য কাহিনী! * * আমার এক বন্ধু, নাম প্রিয়নাথ বসু, তিনি ছিলেন শুভক্ষণজাত নিষ্ঠাবান্ শাক্তভক্ত। প্রায় প্রতি শনিবারেই তিনি জগন্মাতা শ্রীশ্রীজয়কালীর দর্শনে সন্ধ্যাকালে কালীঘাটে যাইতেন। মাঝে মাঝে তখন তাঁহারই প্রীতির আকর্ষণে আমিও ৺শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভে ধন্য হইতাম। * * সেদিন নাটমন্দিরে বসিয়া উভয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম। কিছু সময় পরেই শ্রীমন্দিরের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সঙ্গে সঙ্গেই আরতির মঙ্গলধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। * *

"মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইবে—আর বিলম্ব নাই—হঠাৎ এ কি অপূর্ব্ব কাণ্ড! মায়ের মন্দির হইতে পূর্ব্ব দিকের দ্বারপথে বাহির হইয়া মন্দিরের বারান্দায় প্রবেশ করিলেন—এক আলো-করা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি! এ কি সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তির ভিতরকার চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিলেন? প্রকোষ্ঠে শাঁখা, ভালে সিন্দূর, লালপাড় গৈরিকবসনপরিহিতা, অগ্রভাগে গ্রন্থি-দেওয়া কুন্তলরাজি নিতম্ব পর্য্যন্ত বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ঠিক মায়ের সম্মুখে একটু দাঁড়াইয়া কমণ্ডলু রাখিয়া প্রণাম করিলেন, দুই মিনিটের অধিক নহে। তারপরেই মায়ের মন্দিরের পশ্চিম দিকে বাহির হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পূর্ব্ব দ্বার দিয়া শ্রীনকুলেশ্বর মন্দিরের দিকে মা আমার ভাস্বরপ্রভা চারিদিকে ছড়াইয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। প্রিয়নাথ ও আমি উভয়েই বাক্যহীন—

মুগ্ধ। দুইজনেই বিনাবাক্যে তাঁহার অনুসরণ করিলাম, কিন্তু ২০।৩০ হাত দূরে থাকিয়া। শ্রীনকুলেশ্বর বাবার দর্শন করিয়া সেই পুণ্যপ্রতিমা পশ্চিম দিকের গলিতে প্রবেশ করিলেন। * *

"পশ্চিম দিকে কতটুকু অগ্রসর হইয়া উত্তরমুখী এক ক্ষুদ্র গলিতে প্রবেশ করিতেই তিন-চারিটি মাতাল যুবক সেখান হইতে তাঁহার অনুসরণ করিল।

"হঠাৎ মা পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন—দৃষ্টিতে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—মধুরকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'কে রে তোরা?' কথার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধূর্ত্ত পাপমতিগণ 'পপাত সহসা ভূমৌ' —ভূতলে পতিত হইল ও ছটফট করিতে করিতে 'মা রক্ষা কর, মা রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আর কখনো মাতৃজাতির প্রতি এমন বুদ্ধি করিস নে, যা এবার' বলিয়াই তিনি পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিলেন।

"আমরা উভয়েই এই ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। আর অগ্রসরও হইতেছিলাম না। মা ও আমাদের মধ্যে তখন প্রায় ৫০।৬০ হাত ব্যবধান। চাহিয়া আছি—নির্নিমেষ লোচনে তাঁহারই প্রতি। আবার ফিরিলেন, স্নেহবিজড়িত মধুরকণ্ঠে ডাকিলেন, 'শিবধন, দাঁড়ালি কেন? ছুটে আয় বাপ আমার।'

"প্রিয়নাথ বলিল, 'দাদা, মা তোমার এমন পরিচিতা, এতক্ষণ বলনি কেন? তুমি ত বেশ!'

"আমি বলিলাম, 'চৌদ্দপুরুষেও না। তোমারই সঙ্গে

আজ তাঁর প্রথম দর্শন পেয়েছি।' বলিতে বলিতেই ছুটিয়া গিয়া উভয়ে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম।

"তারপর আমাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া একটি বাড়ীর * * দোতলায় প্রবেশ করিয়াই কলিকাতার ভাষায় বলিলেন, 'শীগ্‌গির আমার ছেলে দু'টিকে খেতে দাও মা, ওদের পেট জ্বলছে খিদেতে।'

"বাস্তবিকই আমরা তখন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। বলামাত্র সেই বর্ষীয়সী বিধবা দিদিমা আমাদের দুইজনকেই রুটি, তরকারি ও চাটনি পরিচ্ছন্ন থালায় করিয়া খাইতে দিলেন। আর মা দিলেন কমণ্ডলু হইতে বাহির করিয়া প্রচুর কাঁচাগোল্লা ও ডাবের নেওয়া। পরিতোষপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া আচমন করিলাম। * * এ যেন জন্মজন্মান্তরের একান্ত নিজ জনের চিরকালের জাগ্রত পরিচয়!"

ডাকাতকে শাসন

একবার গৌরীমা একাকিনী পদব্রজে কলিকাতা হইতে জয়রামবাটী যাইতেছিলেন। সেকালের রাস্তাঘাট এখনকার মত সুগম এবং নিরাপদ ছিল না। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জাহানাবাদের নিকটে তিনি একদল ডাকাতের চক্রান্তে পড়িলেন। তাহারা মনে করিয়াছিল, মায়ের সঙ্গে টাকাপয়সা এবং ঠাকুরের মূল্যবান অলঙ্কার আছে। ডাকাতেরা ভালমানুষ সাজিয়া মায়ের সহিত চলিল এবং তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি

দেখাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঠাকুরের পূজা করিবার উদ্দেশ্যে গৌরীমা এক গাছতলায় বসিলেন।

ডাকাতেরা ভোগের জন্য গ্রাম হইতে নানাজাতীয় খাদ্যসামগ্রী যোগাড় করিয়া আনিয়া দিল। পূজান্তে দামোদরের ভোগ নিবেদন করিবার সময় বাধা পড়িল। গৌরীমার মনে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন তিনি সেই লোকগুলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। ভোগের সামগ্রী ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া তিনি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোরা অতি পাষণ্ড, ঠাকুরের ভোগের জিনিষে বিষ মেখে দিয়েছিস্!"

তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি তিনি কি করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহা ভাবিয়া ডাকাতগণ বিস্মিত এবং ভীত হইল। সন্ন্যাসিনীকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বুঝিয়া তাহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। গৌরীমা তখন বলিলেন, "তোরা দুষ্কর্ম্ম ছেড়ে দে, মুনিষের কাজ ক'রে সংসারধর্ম্ম পালন কর। ঠাকুর তোদের উদ্ধার করবেন।" তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না। ডাকাতেরা কিয়দ্দূর পথ দেখাইয়া চলিল, পরে মায়ের কথামত ফিরিয়া গেল।

জয়রামবাটীতে পৌঁছিয়া গৌরীমা এই ডাকাতদের কাহিনী বিবৃত করিলেন। সকলে রুদ্ধশ্বাসে তাহা শুনিয়া বলিলেন, "ডাকাতদের হাত থেকে খুব বেঁচে গেছেন আপনি।" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "ঠাকুরই ওকে রক্ষে করেছেন।"

বাঘনাপাড়ায় শাকের উৎসব

গৌরীমা একবার বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঘনাপাড়া গ্রামে গিয়াছিলেন। বলদেবজীর মন্দিরের সন্নিকটে একটা গাছতলায় তিনি থাকিতেন। নিকটেই ছিল একটা পুকুর। একদিন পুকুরের ধারে তিনি বসিয়া আছেন, কণ্ঠে দামোদরলালজী। জনৈকা পল্লীবধূ সেই পুকুর হইতে তাঁহার সমক্ষে কিছু শাক তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন।

রাত্রিতে বধূ স্বপ্ন দেখেন,—একটি কৃষ্ণকায় বালক বলিতেছে, "হ্যাগা, তুমি কেমন লোক! অতগুলো শাক তু'লে আনলে, আর আমি পুকুরধারে ব'সে, আমায় চারটিখানি দিলে না!"

বধূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে রে, বাপু?"

বালক বলিল, "বাঃ রে, আমায় বুঝি আর দেখ নি! আমি ত তোমাদের যোগিনী-মার কাছেই থাকি।"

বধূর দুঃখ হয়, আহা, ছেলেমানুষ, চারটি শাক খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, যোগিনী-মার ভয়ে তখন বলতে সাহস পায় নি!

পরদিন বধূটি কিছু শাক লইয়া গিয়া বলেন, "হ্যাঁ যোগিনী-মা, আপনার এখানে কে একটি কালো ছেলে থাকে? আমার কাছে কাল চারটি শাক খেতে চেয়েছে।"

গৌরীমা বলিলেন, "নাঃ, কৈ, এখানে আর কে থাকে!"

একজন বর্ষীয়সী মহিলা সেখানে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা আছে বৈ কি! ভারী দুষ্টু ছেলেটি।"

তাহার পর সেই মহিলা একটু রঙ্গ করিয়া গৌরীমাকে বলেন,

"যা হোক, বেশ লোক ত তুমি। এতকাল ঘর ক'চ্ছ, আর কালো ছেলেটি কে, বুঝতে পারলে না।"

সকলের চমক ভাঙ্গিল তাঁহার কথায়। বধূটিও বুঝিতে পারিলেন, যোগিনী-মার দামোদর ঠাকুরই বালকবেশে তাঁহার নিকট শাক চাহিয়াছেন। তিনি তখন দামোদরের সম্মুখে শাক রাখিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

বিস্ময় ও অভিমানে গৌরীমা দামোদরকে বলেন, "কেন ঠাকুর, আমি কি তোমায় চারটি শাক খাওয়াতে পারতুম না, যে পরের কাছে চাইতে গেলে!"

যোগিনী-মার দামোদর ঠাকুর এক বধূর নিকট শাক চাহিয়া খাইয়াছেন, এই কথা লোকের মুখে মুখে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া গেল। দামোদরকে দর্শন করিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে দলে দলে লোক শাক লইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাছতলায় শাক স্তূপীকৃত হইল। শাকের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণও আসিল। বাঘনাপাড়ায় কয়েকদিন ধরিয়া দামোদরের শাকের উৎসব চলিল।

মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার

দুই তিন জনের উপযুক্ত ছোট একটি পাত্রে গৌরীমা দামোদরের জন্য ভোগ রন্ধন করিতেন। কিন্তু পরিবেশনের সময় দেখা যাইত যে, বহুলোক প্রসাদ গ্রহণ করিলেও তাহা ফুরাইয়া যাইত না। এইপ্রকার এক ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন বসিরহাটের শৈলবালা চৌধুরী,—

"১৩১৫ সালে দোলের দিন মা অনেককে প্রসাদ পাইতে বলিয়াছিলেন। ৺দামোদরের ভোগ সমাপ্ত হইলে কয়েকজন প্রসাদ পাইয়া গিয়াছেন, এমন সময় মা আমায় বলিলেন, 'শৈল, সকলের পাতা ক'রে দে।' আমি তখন পাতা করিলাম না, অন্য কাজে গেলাম। তাহাতে মা একটু জোরে আবার পাতা করিতে বলিলেন। পূর্ব্বে পাতা করি নাই, ভাবিয়াছিলাম, এত লোক—ঐ হাঁড়ির খিচুড়িতে কি প্রকারে হইবে? আর এক হাঁড়ি খিচুড়ি বসান হইলে তারপর পাতা করিব। তখন আমার মনে অভিমান হইল, কারণ, মা জোরে বলিয়াছেন। এই অভিমান-বশতঃ যেখানে যত জায়গা ছিল সমস্ত পাতা করিয়া দিলাম। আর মনে মনে ভাবিতেছি, বেশ তো, আমায় পাতা করিতে বলিলেন, করিয়া দিলাম; কিন্তু এত লোকের ঐ এক হাঁড়ির খিচুড়িতে কি প্রকারে হইবে, দেখিব। আমার দৃষ্টি সেই দিকেই রহিল।

"যখন সকল লোকের খাওয়া হইয়া গেল, তখন মা আমায় বলিলেন, 'শৈল, তুই বোস, আর ঝিকেও পাতা ক'রে দে।' আমায় প্রসাদ দিলেন, আমিও প্রসাদ পাইলাম। মা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর নিবি?' আমি বলিলাম, 'না'। ভাবিলাম মার হাঁড়িতে বোধ হয় আর নাই, কম পড়িবে, আর লইব না। আমার খাওয়া হইয়া গেলে মা আমায় ডাকিলেন, বলিলেন, 'এই ছাখ, এখনও খিচুড়ি হাঁড়িতে আছে।' তখনও হাঁড়িতে খিচুড়ি দেখিয়া আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহা

দেখিয়া মা আমায় বলিলেন, 'উনানে আগুন থাকলে, কম পড়ে না। যখন উনানের আগুন নিভে যায় তখন আর হয় না।' তাহা শুনিয়া আমার অভিমান চলিয়া গেল। আমি তো পূর্ব্বে এ সব জানিতাম না।"

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিলং-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে সেদিন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উৎসব ছিল।

"মা কখনও গান করিতেছেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুরের ও শ্রীমার নাম করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগের রান্নাও চলিতেছে। দ্বিপ্রহরে পূজাপাঠ ও ঠাকুরের ভোগরাগ সম্পন্ন হইল। তৎপর বাহিরের উঠানে নিমন্ত্রিত পুরুষ-ভক্তদিগকে স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। আমরা পরিবেশন করিতে চাহিলে মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'বাবা! আমিই বাড়ব তা হোলে প্রসাদ কম পড়বে না।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহাপ্রয়াণ

ঠাকুরের প্রতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং সেবাপরায়ণতার জন্য গৌরীমা তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন এবং তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনিও আবার অনুরূপ কারণেই গৌরীমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

একবার শারদীয়া পূজা উপলক্ষে উদ্বোধন-ভবনে গৌরীমাকে অতিশয় নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করিতে দেখিয়া তিনি

বলিয়াছিলেন, "আপনার ভক্তিবিশ্বাসের তুলনা হয় না, মা।" ইনিই গৌরীমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসু পশ্চিমভারতের জনৈক ফরেষ্ট অফিসারকে লিখিয়াছিলেন, "গৌরীমার ন্যায় উন্নত জীবন এ যুগে দুর্লভ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অতিশয় অসুস্থ হইয়া যখন কলিকাতায় আসিলেন, গৌরীমা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন তাঁহার জন্য কালীঘাট হইতে মা-কালীর চরণামৃত আনিয়া দেখিলেন, তিনি নিদ্রিত। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার অস্বস্তি হইবে মনে করিয়া জনৈক সেবকের নিকট চরণামৃত রাখিয়া গৌরীমা চলিয়া আসিলেন। স্বামিজী নিদ্রাভঙ্গের পর চরণামৃত পাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে না ডাকিয়াই মা চলিয়া গিয়াছেন জানিয়া অভিমান প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার তিন-চারি দিন পরে একদিন পূজা সমাপন করিয়া উঠিয়া গৌরীমা দেখিলেন, দরজার বাহিরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাঁড়াইয়া আছেন। দিব্য সুস্থ দেহ, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মুখে মৃদু হাসি। গৌরীমা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। স্বামিজী বলিলেন, "এইবার গিরিশের পালা।" কিন্তু গৌরীমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিনি বুঝিলেন, শেষ সময় দেখা হয় নাই বলিয়া শশী শেষ দেখা দিবার অপেক্ষায় এইরূপে বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মুক্ত আত্মা যেন বলিয়া গেলেন, "মা, তোমার শশী শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে চলিল।" পরে জানিলেন, জনৈক ভক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের

দেহত্যাগের দুঃসংবাদ মুখে প্রকাশ না করিয়া পত্রে লিখিয়া তাহা আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন। গৌরীমা আর পত্রখানি স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপ অনেক ঘটনা গৌরীমার জীবনে ঘটিয়াছে। অনেক অপ্রত্যক্ষ ব্যাপার তিনি বুঝিতে পারিতেন, সময় সময় তাহা বলিয়াও ফেলিতেন। কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে না দেখিয়াও তিনি তাঁহার ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই-একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, পরে দেখা গিয়াছে, তাঁহার কথা মিথ্যা হয় নাই। তিনি যাহা বলিতেন তাহা সত্য হইত। তিনি বলিতেন, আমি ত এসব সিদ্ধাই কখনো কামনা করি নি। কোন কোন সময় এক-একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শ্রীধাম নবদ্বীপের পরমসাধিকা ললিতা সখী এইপ্রকার কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে দুইটি উদ্ধৃত হইল,—

"একদিন দামোদরের রান্না হইবে, মা রান্না করিবেন। জল দিতে বলিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মা কত জল দিব? মা বলিলেন, 'চার জনের পরিমাণ দে।' আমি,—মা, চারিজন কে? মা বলিলেন, 'আছে ২টা ছেলে আসিতেছে, রাস্তায় বাহির হইয়াছে, তাহারা খুব ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র দামুর ভোগ করিতে হইবে।' বাস্তবিকই দেখি, ভোগ হইতে না হইতে শান্তিপুরের অমিয়দাদা এবং

অন্তদিকের একটী ভাই ক্ষুধায় খুব কাতর হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ মাঝে মাঝে প্রায়ই হইয়া থাকিত।

"রথের সময় মা একদিন বলিলেন, 'চল্, আজ রথযাত্রা, মাহেশে রথ দেখিয়া আসি।' শুনিয়া আনন্দে মায়ের সঙ্গে চলিলাম। রথ টানা আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য দূর রথ যাইতে না যাইতে ব্যস্তসমস্তভাবে মা বলিলেন, 'চল্ চল্, শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইতে হইবে।' আমি বলিলাম, 'রথটানা হইতেছে। দেখিয়া যাইতে হইবে।' মা বলিলেন, 'আরে, না রে, এখনই এখানে খুনাখুনি রক্তারক্তি হইবে।' বলিয়াই মা চলিলেন। আমি এবং আর দুই-একজন যাঁহারা ছিলেন সকলেই কিন্তু বিমনা হইয়া চলিলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে শুনি যে, রথের চাকার তলে পড়িয়া একটা লোক কাটা পড়িল, চারিদিকে রক্তারক্তি, বিষম ব্যাপার। তখন মায়ের কথা বুঝিলাম।

"একদিন একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, অনেক সাধুদের দেখিতে পাই, নানারূপ সিদ্ধি দেখান, কেহ বা মনের কথা বলেন, কেহ বা কাহারও রোগ ভাল করিয়া দেন, কেহ বা কাহারও মামলা জয় করাইয়া দেন, এ সমস্ত কি করিয়া হয়?'

"মা বলিলেন, 'বাবা, ভগবানকে যে কোনও ভাবে ডাকিলে তাঁহার কৃপা হয়। সেই কৃপায় সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ঐ সাধককে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হয়। যদি ঐ সমস্ত কোন ঐশী ব্যাপারে সাধক মুগ্ধ হন, তবে আর শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সমস্ত গ্রহণ করিতে

নিষেধ করিয়াছেন। তবে যে, কোন স্থলে কিছু কিছু প্রকাশ পায়, উহা ভক্তের ইচ্ছাকৃত নহে। উহা মাত্র ভগবদিচ্ছায় ভক্তের হৃদয়ে ক্ষণিক বিকাশ, ভক্তের অনবধানে।”

এই তুচ্ছ অষ্টসিদ্ধির কথাই গৌরীমা তাঁহার “শিব-শক্তি” রচনায় লিখিয়াছেন,—

স্বয়ং যদি দেন প্রভু, গ্রহণ না করে কভু,
সারূপ্যাদি মুক্তি বর নিন্দে॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রসিদ্ধ এই চতুর্ব্বর্গ,
পুরুষার্থ চতুষ্টয় খ্যাত।
বহু দূরে প’ড়ে থাকে, তৃণপ্রায় নাহি দেখে,
সাধিলে-বা কে-বা হয় রত॥

যে-বা অষ্টাদশ সিদ্ধি নাহি করে ভস্মবুদ্ধি,
অণিমাদি সেবিলে কি হবে।
দিব্য চিন্তামণি এড়ি’ বল কে কুড়ায় কড়ি,
কাঞ্চন ত্যজিয়ে কাঁচ লবে॥

পুরুষার্থ শিরোমণি যে-জন সে-ধনে ধনী,
সে-বা কেন অন্য ধন চা’বে।
হেন কে হয় আনাড়ি, আপন ইচ্ছায় ছাড়ি’
সুধাবিন্দু, ক্ষারবিন্দু খাবে॥

দিব্যভাবে

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষাল লিখিয়াছেন,—

"আমরা কামাখ্যা দর্শনে যাই। মা সেখানে গিয়ে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেলেন। সমস্ত তেজ লুকিয়ে ফেলে ছোট্ট মেয়েটির মত 'মা' 'মা' করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, সে কি বিনম্র সশ্রদ্ধ পূজারিণীর ভাব! যখন মন্দির থেকে বাইরে এলেন তখন মা'র মুখের প্রশান্ত অথচ মৃদুহাস্য ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল—সিদ্ধিলাভ করেছেন।

বসিরহাটে "একদিন রাত্রে মা আমাকে দিয়ে ২।১ খানি ভজন গাইয়ে স্বয়ং উদ্দীপিতা হয়ে এমন দিব্য ভাবে ও সুরে বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্ত্তন করেছিলেন যে, উপস্থিত সকলেই ভাবের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আমি মা'র স্বরূপ দেখেছিলাম। শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রাণের ও সাধনার সন্ধান—একটু ক্ষীণ ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মুঙ্গেরের একদিনের ঘটনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মায়ের কাছে গিয়াছি। মা দামুর (দামোদরের) প্রসাদ দিলেন, তারপর বলিলেন, 'চল্ আমার সঙ্গে।' এই বলিয়া চলিতে চলিতে একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মা বসিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে মাতৃ-সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃই মনে হইতে লাগিল মা যেন কোন এক অজানা ভাবের রাজ্যে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার বাহ্য চেতনা লোপ পাইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহে অদ্ভুত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল,— দেহ রক্তাভা ধারণ করিল, লোমকূপগুলি কাঁঠালের কাঁটার মত ফুলিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত উদ্‌গত হইবার উপক্রম হইল। মুখে অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল!

"আমি তখন ভাবসমাধির অবস্থা বুঝিতাম না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া এবং কোন সাড়া না পাইয়া আমার ভয় হইল। আমি চীৎকার করিয়া যতই ডাকি, 'ও মা, মা, তোমার কি হলো? কথা বলছো না কেন?' মা কোনই সাড়া দেন না। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"এইরূপে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। অদূরে মন্দির-মধ্যে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাঁহার বাহ্য চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন আস্তে আস্তে হাতে তালি দিয়া মায়ের নাম করিতে লাগিলেন।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"আশ্রমে একদিন মায়ের কাছে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শুনিতেছিলাম। এমন সময়ে বাহিরের দরজার কড়া নড়িল। দরজা খুলিয়া দেখি, স্বনামধন্য দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়। ছুটিয়া আসিয়া মায়ের নিকট বলিলাম, 'বরিশালের অশ্বিনী বাবু আপনাকে দর্শন

করতে এসেছেন।' মা বলিলেন, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আয়।' অশ্বিনী বাবু বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিসহকারে মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'মা, কতকাল ধ'রে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু আসতে আসতে কত দেরী হয়ে গেল।' মা তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার ভক্তি ও সেবাধর্ম্মের কথা শুনে অবধি আমারও তোমাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল।'

"দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের দর্শন এবং তাঁহার অমৃতোপম উপদেশ পাইয়া অশ্বিনী বাবু কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উল্লেখ করিলেন। কথায় কথায় প্রেমাবতার চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। জীবের প্রতি তাঁহাদের অহেতুকী কৃপার কথা বলিতে বলিতে দুরাচার মাধাইকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কলসীর কাণায় আহত এবং রক্তাক্তকলেবর হইয়াও নিত্যানন্দ প্রভু কিরূপে বিগলিত করুণাধারায় পাপদুষ্ট মাধাইকে পরিশুদ্ধ এবং আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিতে করিতে মা বলিয়া উঠিলেন, 'যীশুখৃষ্টও জীবের কল্যাণে প্রেম বিতরণ করতে গিয়ে কত কষ্টই না সইলেন! আহা! শেষটায় কি-না হতভাগা লোকগুলো তাঁকে পেরেক বিঁধেই মেরে ফেল্লে গা! উঃ, কী ভীষণ!' বলিতে বলিতে মায়ের ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া মা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সহসা তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে

উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় সেই অবস্থাতেই নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

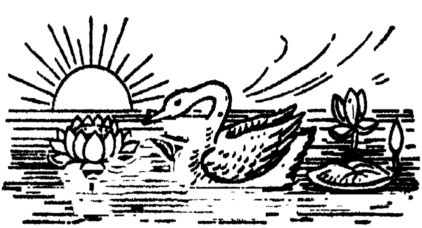
"আমি অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইলাম; অশ্বিনী বাবু বলিলেন, 'ব্যস্ত হয়ো না, প'ড়ে যাবার উপক্রম হ'লেই মাকে ধরো।' আমরা সকলে স্তম্ভিত ও হতবাক্ হইয়া মায়ের অপূর্ব্ব ভাব দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে মায়ের বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিতে লাগিল, দেহ শিথিল হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িয়া মা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

"কিছুক্ষণ পর অশ্বিনী বাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'মা, আপনি একটু নিভৃতে বিশ্রাম করুন, আমরা এখন আসি। আজ আমরা ধন্য হলুম। কিন্তু দেখার আশা মিটলো না। আর একদিন এসে অনেকক্ষণ থাকবো।' অশ্বিনী বাবু চলিয়া গেলেন। আমি মাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।"

গৌরীমার জানকী-ভাবের প্রসঙ্গে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

শিলংয়ে একদিন প্রত্যূষে "মা জনকদুহিতা কুমারী সীতাদেবীর কথা আমাকে বলিতে লাগিলেন। তখন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব একখানি সোনার থালার মত উদিত হইতেছিলেন। মা বলিলেন, দেখ, সীতাদেবীর বয়স যখন ৮ বৎসর তখন তিনি জনক রাজার

ঠাকুরঘরে রক্ষিত হরধনুখানি বাঁ হাতে এইরূপে তুলিয়া (হাতে দেখাইয়া) ডান হাতে ঘর লেপিতেন। * * ইতিমধ্যে মা পাকঘর হইতে উঠানে আসিয়াই পূর্ব্বমুখী হইয়া হঠাৎ কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। * * আমি এরূপ চিত্র আর কখনও দেখি নাই। এদিকে ঠাকুরের সমাধির কথা স্মরণ করিয়া 'সীতারাম, সীতারাম' নাম করিতে লাগিলাম। * * মা শীঘ্রই 'রামরাঘব, রামরাঘব' বলিতে লাগিলেন। পরে আরও স্পষ্টতর ভাবে ঐ নাম বলিতে বলিতে সুস্থ হইলেন,—চক্ষু নামিল, হস্তপদ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল। মার মুখমণ্ডল তখন এক দিব্য রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতে আবার মৃদু মৃদু দিব্য হাসি খেলিতেছে। * * বোধ হইল, তিনি এক অমৃতসরোবরে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছেন * *।"



শেষ অধ্যায়

"জ্যান্ত জগদম্বাদের" সেবার উদ্দেশ্যে গৌরীমা যে আশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজ তাহা নিজস্ব ভূমি ও ভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার হাতে-গড়া আশ্রম-সেবিকাগণের সাধুতা, একনিষ্ঠতা এবং কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, "মা ঠাকৃরুণের কৃপায় আশ্রমের কাজ ভালই চলবে।" আশ্রমের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মগুলি তিনি আস্তে আস্তে উপযুক্ত সেবিকাগণের হাতে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, যদিও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমের সকল বিষয়ের প্রধান পরিচালিকা রহিলেন তিনি নিজেই। আশ্রমবাসিনীগণও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা করিতেন।

এইরূপে আশ্রমকর্ম্মের ভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইলেও তাঁহার লোকশিক্ষাব্রত কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস পাইল না। তাঁহার দর্শন, উপদেশ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দূর দূরান্তর হইতেও, এমন-কি দক্ষিণভারত এবং পশ্চিমভারত হইতেও, ধর্ম্মার্থী নরনারী অধিক সংখ্যায় তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

এই সময় প্রায় প্রতিবৎসরই তিনি পুরী এবং নবদ্বীপে গিয়া কিছুদিন বাস করিতেন। ১৩৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে পুরীধামে তিনি প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন। এইবার পুরীধামের বিভিন্ন অংশে বিরাজিত সকল দেবদেবীকেই তিনি একবার করিয়া দর্শন করেন। স্নানপূর্ণিমার পূর্ব্বদিন হইতেই জগন্নাথদেবের স্নান

দেখিবার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! স্নানযাত্রার দিন তিনি তিন-চারি বার জগন্নাথদেবকে দর্শন এবং স্পর্শ করেন।

পুরীধামের দিনগুলি তাঁহার খুবই আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত হইল। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদাও ঐ সময় পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রায়ই মায়ের নিকট আসিতেন এবং দামোদরের প্রসাদ পাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যস্মৃতির আলোচনা হইত। ঠাকুরের প্রিয় সঙ্গীতগুলি গাহিয়া তাঁহারা পরম আনন্দ অনুভব করিতেন।

পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন পুরীধামে বাস করিতেছিলেন। তিনিও সস্ত্রীক প্রায় প্রতিদিনই মাকে দর্শন করিতে এবং তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতে আসিতেন।

সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধপুরুষ বাসুদেব মহারাজের সহিত প্রায়ই শ্রীমন্দিরে মায়ের সাক্ষাৎ হইত। 'গৌরামায়ী'র জন্য তিনি জগন্নাথদেবের নানাবিধ মহাপ্রসাদ প্রতিদিন পাঠাইয়া দিতেন। মায়ের প্রসঙ্গে তিনি ভক্তগণের নিকট বলিতেন, "সাক্ষাৎ ভগবতী হ্যায়, জিত্‌নী সেবা করোগে, উতনা মেওয়া মিলেগা।"

একদিন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে করিতে মা যেন অনেকটা কাতরতার সহিতই বলিলেন, "প্রভু, এভাবে এসে তোমার দর্শন এবারই বোধ হয় আমার শেষ!" সন্তানগণ কেহই তখন তাঁহার এই কথাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু নিজের আয়ুঃ সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার প্রথম ইঙ্গিত।

পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবৎসর তাঁহাকে গিরিডিতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। তিনি এই ব্যবস্থায় অসম্মতি জানাইয়া বলেন, "এ বুড়ো বয়সে তীর্থস্থান ছাড়া কোন গঙ্গাহীন দেশে আমি যাব না।" কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে পরিচালনা-সমিতির সদস্যগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দুই-এক মাস করিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেন।

সকলের অনুরোধে অগত্যা তিনি কোন স্বাস্থ্যকর তীর্থস্থানে যাইতে সম্মত হইলেন। দুই-তিন স্থানে বাড়ী ভাড়ার চেষ্টা হইল। অবশেষে বৈদ্যনাথধামে সুবিধামত একটি বাড়ী পাওয়া গেল। ১৩৪১ সালে শারদীয়া পূজার পর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীসহ মা বৈদ্যনাথে গমন করেন। প্রশস্ত বাড়ী, সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ হইতে পূজার জন্য নানাবিধ ফুল আসিত। তিনি ফুল দিয়া বিবিধ সাজে দামোদরকে সাজাইতেন। পূজাবকাশ আনন্দে অতিবাহিত হইল, তাঁহার স্বাস্থ্যেরও প্রভূত উন্নতি হইল।

পরবর্ত্তী শারদীয়া পূজার পর তিনি নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হন। কেশবমোহিনী দেবী এবং শরৎকুমারী দেবী এই দুইজন ভক্তিমতী বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া তিনি হঠাৎ একদিন নবদ্বীপে চলিয়া গেলেন। নবদ্বীপে গেলে তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইত।

মায়ের সহিত সুদীর্ঘকাল পরিচিত ভক্ত জহরলাল ঘোষ নবদ্বীপস্থিত "গৌরী-নিকেতনের" স্মৃতি-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে মাকে সাধারণতঃ যে ভাবে দেখিয়াছি, কলিকাতার বাহিরে অবসর সময়ে মাকে দেখিয়াছি স্বতন্ত্ররূপে—ঠিক সরল শিশুর মত। আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী। বৃদ্ধবয়সেও মায়ের কত উৎসাহ! কত আদর করিয়া সামনে বসাইয়া মা প্রসাদ খাওয়াইয়াছেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না। মা কতরকম হাসিতামাসার গল্প বলিতেন, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিত। অথচ এইরকম সাধারণ ছোটখাট গল্পের মধ্য দিয়াই মা আমাদের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন। কত ভাবযুক্ত কীর্ত্তন মধুরকণ্ঠে আখর দিয়া তিনি আমাদের শিখাইয়াছেন।* সাধনভজনের কথায়, ভগবৎপ্রসঙ্গে, মহাভাবের তরঙ্গে মায়ের দিনরাত্রি যে ভাবে অতিবাহিত হইত, সেই সকল আনন্দের স্মৃতি মনে উদিত হইলে আজও যে কত আনন্দ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

* গৌরীমার কণ্ঠ অতি সুমিষ্ট এবং উদাত্ত ছিল। বাল্যকাল হইতেই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি রায়ের বহু সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই শিক্ষার মূলে তাঁহার জননী গিরিবালা দেবী। পরবর্ত্তী কালে বহু বৈষ্ণব পদাবলীও তিনি আয়ত্ত করেন। প্রাচীন সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা তিনি অধিক পছন্দ করিতেন। সাধনভজনের প্রশ্নে সময় সময় তিনি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াই উত্তর দিতেন।

নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুদিন পর পৌষমাসে মায়ের দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঔষধ গ্রহণের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

১৩৪২ সালে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরদেহধারণের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। গুরুদেবের শতবার্ষিক জন্মমহোৎসব উপলক্ষে গৌরীমা পঞ্চদিবসব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের প্রশস্ত গৃহে দুইটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ১৩৪৩ সালের ৯ই আশ্বিন তারিখে নাটোরের মহারাণী শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবীর সভানেত্রীত্বে এক 'মহিলা সম্মেলন' হয়। ১১ই আশ্বিন 'সাধারণ সম্মেলনের' অধিবেশন হয়, অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত দুই দিবসই সভার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া মা পরম উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গৌরীমা একটি সংক্ষিপ্ত এবং মনোজ্ঞ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত বেতারসঙ্ঘ তাহা বেতারযোগে প্রচার করেন। তাঁহার ঐ বাণী এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।—

"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়

"প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতায় আচ্ছন্ন ও জড়তায় অভিভূত হ'য়ে মানুষ তা'র নিত্য কর্ত্তব্য ভুলে যায়, সৃষ্টির মোহে

মুগ্ধ হ'য়ে স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয়,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি মোহমুগ্ধ মানুষকে বুঝিয়ে তা'র চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর শতবার্ষিকীও আজ তেমনি সমগ্র মানবকে সেই শাশ্বত সত্য স্মরণ করতেই বলছে। এই যে সারা জগতের নরনারীর মনে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে পৌঁছাচ্ছে সেই মহাপুরুষের প্রাণের কথা, ক্ষণিকের জন্যও মূর্ত্ত হ'য়ে উঠছে তাঁর সেই 'মা',—সাধারণের দিক থেকে বিচার করলে শতাব্দী-জয়ন্তী উৎসবের ইহাই পরম সার্থকতা।

"মহাভাবের বিগ্রহ ঠাকুরের কথা যখনই ভাবি, তখনই জেগে ওঠে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যতীর্থে তাঁর সমাহিত মূর্ত্তি, আর সেই সাথে তাঁর কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত,—

'আমায় দে মা পাগল ক'রে,
আর কাজ নেই আমার জ্ঞানবিচারে।'

আজ তাঁর স্মৃতি-বাসরে একদিনের জন্যও জ্ঞানবিচার ছেড়ে মনে জাগিয়ে তুলুন সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস, মাতৃচরণে সেই অসীম নির্ভরতা, যার বলে সোনা মাটি হয়, মাটি হয় সোনা,—যার বলে মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী জেগে ওঠেন। এই জ্বলন্ত বিশ্বাস ও অসীম নির্ভরতার সঙ্গে জীবনে অনুশীলন করুন তাঁর অমৃতময়ী বাণী। আর, যে মহীয়সী নারী অপূর্ব্ব ত্যাগ ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পতির ব্রতোদ্‌যাপনে সহায়তা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্যেও আজ একটিবার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিন। সেই

পূতচরিতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার আশীর্ব্বাদ সকলের অন্তরকে তপোভূমিতে পরিণত করুক।

"ঠাকুর যে কেবল কর্ম্মসন্ন্যাসের আদর্শ—ভাবভোলা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তা নয়। তিনি ছিলেন শক্তির একনিষ্ঠ পুজারী, মহাশক্তির বিরাট আধার। তাঁর শক্তি-বিভূতি বহুধা বিচ্ছুরিত হ'য়ে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির শত শত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দিকে দিকে গড়ে তুলেছে। তাঁর জীবদুঃখে বিগলিত হৃদয়ই শ্রীমদ্ বিবেকানন্দের জীবনব্রতের মধ্য দিয়ে দেশে দেশে নরনারায়ণের সেবাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছে।

"তাঁর কথা ব'লে শেষ করা যায় না। ভাষা সেখানে নিস্তব্ধ হ'য়ে ফিরে আসে, ভাব কূল না পেয়ে তলিয়ে যায়। কত মত, কত পথ, কত বিপরীত ধারা,—সব এসে মিলেছে তাঁর মাঝে। ভেদ নেই, দ্বেষ নেই, সংঘর্ষ নেই,—এক মহাসমন্বয়, এক বিরাট পূর্ণতা। আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবে সেই পূর্ণপুরুষের কথা সকলে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করুন, তাঁর কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে পুণ্যস্নান করে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

শতবার্ষিকীর পর মা নিজেই একদিন আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আশ্রম ও বিদ্যালয়ের প্রায় আশীজন ছাত্রীসহ খড়দহে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে যান, এবং দর্শনান্তে নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে অনেকক্ষণ থাকিয়া ছাত্রীদের সহিত আনন্দ-কৌতুকে অতিবাহিত করেন।

ইহার পরও কয়েকজন আশ্রমবাসিনীসহ তিনি একদিন কালীঘাটে এবং একদিন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে গমন করেন। দক্ষিণেশ্বরে ভক্তমণ্ডলীর নিকট পূর্ব্বের কত আনন্দস্মৃতির কথা বলিলেন, ঠাকুরের ঘরে বসিয়া কত গান গাহিলেন।

এই সময় তিনি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। আশ্রম বর্ত্তমান নিজ ত্রিতল ভবনে আসিবার পর প্রথম কয়েকবৎসর স্থানাভাবের জন্য কোনপ্রকার অসুবিধা বোধ হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং আশ্রমের কার্য্যও প্রসার লাভ করে। এইহেতু আশ্রম ও বিদ্যালয় উভয়ত্র স্থানের অভাব অনুভূত হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ তিনি আরও কিছু ভূমিক্রয়ের প্রয়োজন বোধ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ আশ্রম-ভবনের সংলগ্ন পশ্চিম দিকে ২৪নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে কিঞ্চিদধিক তিন কাঠা পরিমিত ভূমি শূন্য পড়িয়াছিল। তৎকালীন পরিচালনা-সমিতির অভিপ্রায়ানুযায়ী, বিশেষ করিয়া স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু এবং সুশীলচন্দ্র সেন মহাশয়গণের বিশেষ চেষ্টায় ১৩৪৩ সালে উক্ত ভূমিখণ্ড ক্রয় করা হয়। এই বৎসরই ২০শে পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথিদিবসে উক্ত ভূমির উপর শ্রীশ্রীদামোদর এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সমক্ষে গৌরীমা স্বয়ং পূজা, হোম ইত্যাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।

মাঘ মাসে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে উপস্থিত থাকিয়া তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বাৎসরিক জন্মোৎসব সুসম্পন্ন

করেন। এই উৎসব উপলক্ষে স্বামী অভেদানন্দ আশ্রমে আসিয়া কত আনন্দ করিয়া মায়ের সহিত ঠাকুরের কথা বলেন এবং মায়ের সম্মুখে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত মায়ের ইহাই শেষ সাক্ষাৎকার।

১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাস, রাধাষ্টমী দিবস। শেষরাত্রি হইতেই মা স্বরচিত একটি সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন,—

একবার করুণা কর বৃষভানু-নন্দিনী।
প্রেমধনে কর গো ধনী, (ত্রি)ভুবনবন্দ্য-বন্দিনী॥
চিদংশে সম্বিতা তুমি, আনন্দাংশে (আ-)হ্লাদিনী।
কৃষ্ণ-প্রেমার জন্মভূমি, সদংশেতে সন্ধিনী॥
পরাণে পিপাসা লয়ে পথপানে আছি চেয়ে।
(আমার) মানস-মন্দিরে জাগো করুণাঘন-রূপিণী॥
মহাভাব-রূপা রাধা, শুনেছি শ্যাম-অঙ্গ-আধা।
তব প্রেমে আছে বাঁধা মা যশোদার নীলমণি॥

অপরাহ্নে ভক্তবর বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় মাকে দর্শন করিতে আগমন করেন। মা বাহিরের ঘরেই কতিপয় ভক্তের সহিত কথা বলিতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই গোস্বামী মহাশয় বলেন, "মা, আমি 'কাঙ্গাল বিশ্বরূপ', তোমায় একবার দেখতে এলুম।" গোস্বামী মহাশয় মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

বিশ্বরূপ গোস্বামী ছিলেন সুকবি এবং সুগায়ক। উক্ত দিবস

নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, "মা, আজ তোমায় গান শোনাতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে আমার, অনুমতি কর।"

তাঁহার মনের ব্যাকুলতা বুঝিয়া মা বলিলেন, "গাওনা, বাবা। 'হল-করা তাঁর রূপের বাহার'[১] গানটি কিন্তু অনেক দিন শুনি নি।"

গোস্বামী মহাশয় ঐটি এবং আরও কয়েকটি স্বরচিত গান ভাবের সহিত গাহিয়া মাকে শুনাইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সাধ যেন মিটিল না। ইতোমধ্যে মাকে দর্শন করিতে অনেক মহিলাভক্ত আসায় মা আর বাহিরে থাকিতে পারিলেন না। গোস্বামী মহাশয়ের আরও গান শুনাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।[২]

কয়েকদিবস পরে, একদিন দ্বিপ্রহরে প্রসাদ গ্রহণ করিবার সময় প্রসাদের কিয়দংশ মা পৃথক রাখিয়া দিলেন। সেবিকাগণ

(১) কাঁচা সোনার বরণ ধরেছে রে, ওগো চিনলি কি তাঁরে ?
ও সে, হল-করা তাঁর রূপের বাহার কেবল বাহিরে॥ ইত্যাদি

(২) গৌরীমাতার দেহান্তে এক অমাবস্যা-তিথিতে প্রবল বারিপাত অগ্রাহ্য করিয়া 'কাঙ্গাল বিশ্বরূপ' মায়ের সমাধিস্থান—কাশীপুর মহাশ্মশানে মায়ের মাসিক স্মরণোৎসবে যোগদান করেন। সেই স্থানে তিনি মায়ের প্রতিকৃতির সমক্ষে পরমভক্তিসহকারে কিছুক্ষণ স্বরচিত "গৌরলীলা"-গ্রন্থ পাঠ করেন এবং পরে অনেকক্ষণ কীর্তন করেন। রাধাষ্টমী দিবসে মাকে আরও গান শুনাইবার যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অপূর্ণ ছিল, এইদিন মায়ের সমাধিস্থানে তাহা পূর্ণ হইল। ইহার মাত্র কয়েকদিবস পরেই ভক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাহাও গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "দু'টি ভক্ত মায়ী আসছে, ওটুকু পেসাদ তা'দের জন্যে রইলো।"

তিনি প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়াই এইরূপ বলিতেছেন, ইহা মনে করিয়া সেবিকাগণ বলিলেন, "এই দুপুর বেলা কেউ আসবে না, আপনি ওটুকু খেয়ে ফেলুন, মা।"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "না গো না, তা'রা কাঁদতে কাঁদতে আসছে, দেখিস্ তোরা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরদেশ হইতে দুইজন মহিলা অতিশয় ব্যাকুলভাবে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। একজন বৃদ্ধা, অপরজন প্রৌঢ়া। তন্মধ্যে একজনের তখন জ্বর। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "রামকৃষ্ণদেবের মানসকন্যাকে আমরা দর্শন করতে এসেছি। একটিবার তাঁর পায়ের ধূলো নেবো।"

জনৈকা বালিকা জানাইলেন, "ঠাকুমা এখন তেতলায় বিশ্রাম কচ্ছেন, আপনারা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন।"

ইহা শুনিয়া মহিলা যেন অধৈর্য্য হইয়াই, কিন্তু মিনতিভরে পুনরায় বলিলেন, "বেশ ত, দূরে থেকেই আমরা তাঁকে প্রণাম করবো। অনেক কষ্ট ক'রে এসেছি, শরীরটাও ভাল নয়। লক্ষীটি, তাঁর কাছে একবার আমাদের নিয়ে চল।"

সংবাদ পাইয়া আশ্রম-সম্পাদিকা তাঁহাদিগকে মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। দূর হইতেই তাঁহারা মাকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের একজন প্রাণের আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন মা, যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়।"

"আহা, শুদ্ধা ভক্তি কে চায়, মা! বেশীর ভাগ লোকই ত এসে আবদার করে, 'আশীর্ব্বাদের জোরে রোগ সারিয়ে দিন, নয়ত টাকাপয়সা পাইয়ে দিন।' ভক্তিধন ক'জন চায়, মা?" এই বলিয়া মা দুই হাত বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "এসো এসো, কাছে এসো, মা। তোমাদের জন্যে কখন থেকে ব'সে আছি আমি।" তাঁহারা নিকটে আসিলে মা তাঁহাদিগকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া খুব আদর করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

তিন-চার মাস পরে মায়ের দেহ পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন, রোগ—বার্দ্ধক্য-জনিত কাশি এবং দুর্ব্বলতা। তাঁহারা নিয়মিতভাবে আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন।* চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদমতেই

---

* মায়ের এই অসুস্থতার সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেন, কবিরাজ বারাণসী গুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে মায়ের চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি, কবিরাজ ভবতারণ বিদ্যারত্ন এবং কবিরাজ ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সময় সময় ডাক্তারগণ আসিয়া তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিলেও ডাক্তারী ঔষধ তিনি সেবন করিতেন না। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বাপর চলিতে লাগিল। আশ্রমবাসিনীগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

পরিচালনা-সমিতির মহিলাসদস্যগণ এবং আরও অনেক ভক্তিমতী মহিলা মধ্যে মধ্যে মাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার দেহের অবস্থা জানিয়া যাইতেন। মায়ের স্নেহধন্যা কন্যা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী কোলে* এবং আরও কেহ কেহ প্রায় প্রত্যহই আসিতেন এবং অনেকক্ষণ মায়ের শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন।

অসুস্থতাসত্ত্বেও মাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার কোন কষ্ট হইতেছে; বরং তাঁহাকে বেশ প্রফুল্লই দেখা যাইত।

এই সময়ে তিনি একদিন জনৈকা সেবিকাকে বলিলেন, "মা, কালো আঙ্গুর আছে কি? আমায় চারটি দে।" সেবিকা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আঙ্গুর পাইলেন না। নীচে আসিয়া পরিচারক অথবা এমন কাহাকেও পাইলেন না, যাহাকে দিয়া তখন বাজার হইতে কিছু আঙ্গুর আনাইতে পারেন।

মাকে কিছু খাওয়ান অধিকাংশ সময়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। কতদিন কত ভক্ত আঙ্গুর এবং অন্যান্য কত রকম ফল মিষ্টি দিয়া গিয়াছেন, মা কদাচিৎ তাহা গ্রহণ করিতেন। আর আজ তিনি নিজেই আঙ্গুর চাহিতেছেন, দিতে না পারিয়া সেবিকা বড়ই লজ্জিত এবং দুঃখিত হইলেন।

---

*কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। এই পরিবার সুদীর্ঘকাল আশ্রমের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

অল্পক্ষণ পরেই মা আবার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, কৈ, আঙ্গুর দিলিনি?

—এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি, ঠাকুমা।

—সে-কি রে? আঙ্গুর ত এসেছে।

—না ঠাকুমা, আনবার লোক নেই এখন, এক্ষুণি হয়ত কেউ এসে পড়বে।

—ওমা, শোন ওর কথা! আমি দেখলুম, ছোট্ট একটি ঠোঙ্গায় ক'রে কালো আঙ্গুর এনেছে। তুই বললেই হলো—আঙ্গুর আসে নি! খুঁজে ছাখ আবার ভাল ক'রে।

সেবিকা আবার একতলায় আসিলেন, ইতোমধ্যে আঙ্গুর আনিবার লোক কেহ আসিয়াছে কি-না তাহাই দেখিবার জন্য। সংবাদ লইয়া জানিলেন, তখনও কেহ আসে নাই। কেবল আসিয়াছেন সুসঙ্গের রাণী ভক্তিমতী সুরমা দেবী এবং তিনি মায়ের স্বাস্থ্যের সংবাদ লইতেছেন।

সুরমা দেবী মাকে দর্শন করিবার জন্য উপরে গিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ছোট ঠোঙ্গা বাহির করিয়া অতিশয় বিনয় এবং সঙ্কোচভরে নিবেদন জানাইলেন, "মা, ভাল দেখে চারটি কালো আঙ্গুর এনেছিলুম আপনার সেবার জন্যে। আপনি যদি—"

"আমার জন্যে বলো না মা, ওতে দামোদরের ভোগ হবে।" এই বলিয়া মা সহাস্যদৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত সেবিকাকে বলিলেন, "পেলি ত কালো আঙ্গুর! এবার দামুকে ভোগ দিতে বল।"

তাঁহার আঙ্গুরে ঠাকুরের ভোগ এবং মায়ের সেবা হইল দেখিয়া সুরমা দেবী নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিলেন।

দেহের এইরূপ অবস্থাতেও সন্তানদিগকে দেখিবার জন্য মা প্রায়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। একতলায় নামা, পুনরায় তিনতলায় ওঠা এবং অধিক কথা বলা, এই সমস্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে, চিকিৎসকগণের এই মতানুযায়ী সেবিকাগণ তাঁহার উপর-নীচ নামা-ওঠা করায় আপত্তি জানাইতেন। কিন্তু মহিলাগণ ইচ্ছামত তাঁহার নিকট উপরে আসিতে পারেন, আর পুরুষভক্তগণ দিনের পর দিন মায়ের দর্শন না পাইয়া একতলার বাহিরের ঘর হইতেই ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া যান, ইহা ভাবিয়া মায়ের প্রাণ অতিশয় ব্যথিত হইত।

একদিন মা বলিলেন, "আমার কেষ্টধন,[1] রাজা রাও[2] কত দূর থেকে এসেছে, আমার হরেন-ছেলে,[3] আরো সব ছেলেরা এসে ব'সে আছে। তোমাদের জন্যে যেমন আমার প্রাণ কাঁদে, ছেলেদের জন্যে বুঝি আর কাঁদে না? আমি আজ নাববো, তোমাদের ডাক্তার-কবিরাজ যা' খুসী বলুক।"

মায়ের ইচ্ছা প্রবল হইলে তাহা রোধ করিবার সাধ্য কাহারও

(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) মাদ্রাজী ভক্ত, ভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার নাগ।

ছিল না। আপত্তি জানাইয়াও সেদিন কোন ফল হইল না। সেবিকাদিগের সাহায্যে তিনি একতলায় বাহিরের ঘরে আসিলেন। মায়ের তৎকালীন স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা জানিয়া যদিও সন্তানগণ তাঁহার নীচে আসায় আপত্তি জানাইতেন, তথাপি এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দর্শন পাইয়া তাঁহাদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ তিনি আনন্দে অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপ অসুস্থতার মধ্যে এবং সকলের নিষেধসত্ত্বেও তিন-চারি দিন মা একতলায় আসিয়া ব্যাকুল সন্তানদিগকে দর্শনদান করেন। ২রা পৌষ, পূর্ণিমা-তিথিতে তিনি পুরুষসন্তানদিগকে শেষবার দর্শনদান করেন। এই দিনও তিনি বলেন, "আজ আমি একতলায় নাববো, ছেলেদের খবর দাও।"

দেহের অবস্থার কথা বুঝাইয়া কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু সন্তানবৎসলা মা তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, বলিলেন, "আমি তোমাদের বলছি, এর পর গৌরীপুরীর আর নীচে নাবা সুকঠিন। যারা যারা কাছে আছে, সংবাদ পাঠিয়ে দাও, আজ যেন আসে।"

অনেক সন্তান মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। মা তাঁহাদের সহিত কত কথা বলিলেন, তাঁহাদিগকে কত উপদেশ দিলেন। নিজের হাতে করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সমাগত ও অনাগত সন্তানদিগের নাম করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভাগ্যবান সন্তানগণ শেষবার তাঁহার পুণ্য চরণধূলি গ্রহণ

করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শেষবার তপঃসিদ্ধা মাতৃদেবীর মুখনিঃসৃত উপদেশামৃত পান করিলেন।

উপদেশপ্রসঙ্গে মা বলিলেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলা ত সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গল চিন্তা কচ্ছেন। মায়ের প্রণাম-মন্ত্রে আছে,—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

মা আমাদের সর্ব্বার্থসাধিকা। তিনি যেন ভাঁড়ার আগ্‌লে ব'সে আছেন, ভক্তির চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। নাছোড়বান্দা ছেলের মত মায়ের আঁচল ধ'রে থাকবে, তাঁর কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করবে।

"ঠাকুর বলতেন, 'তোরা আর কিছু না পারিস, মায়ের ঘ্যান্‌ঘ্যানে ছেলে হ। এক-একটা ছেলে দেখিসনি, মায়ের আঁচল ধ'রে সন্দেশের জন্যে কেমন আবদার করে। মা সংসারের কাজে এঘর ওঘর করেন, ছেলে তবু তাঁর আঁচল ধ'রে সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে, সন্দেশের জন্যে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করে। মা কিছুতেই ছেলের আঁচল-ধরা ছাড়াতে পারেন না। শেষে আর কি করেন? নিজেরই ত ছেলে, কতক্ষণ কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। তখন মা আঁচলের চাবিটা দিয়ে ভাঁড়ার খুলে ছেলের আবদার মিটিয়ে তা'কে কোলে তুলে শান্ত করেন।"

অপরাহ্ণে জনৈক শিষ্যসন্তানের কৃতবিদ্য পুত্র আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার ডাকনাম—ভজহরি। মা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুন্দর নামটি! ভজ হরি, হরিকে ভজ। হরিই একমাত্র নিত্য বস্তু, ইহসংসারে আর সবই

অসার। তাঁকে ভ'জে তুর্লভ মানবজন্ম যাতে সার্থক হয়, সে ভাবেই তোমরা চলবে।"

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় এবং তাহা মায়েরই নির্দ্দেশমত সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবসেও মহিলাগণ তাঁহার নিকট অনেক উপদেশ শ্রবণ করেন, তিনি সকলকেই সস্নেহে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

এইদিন কয়েকজন মহিলাকে উৎসাহচ্ছলে মা বলেন, "তোমরা মায়েরা কম কিসে গো? এই-যে যুগে যুগে কত কত সাধু সন্ন্যাসী অবতার এসে জগতের কল্যাণ কচ্ছেন, এঁরা সবাই মায়েদের পেটেই জন্ম নিয়েছেন। মায়েরাই সমাজ এবং ধর্ম্মকে ধ'রে রেখেছেন। তাঁদের ভক্তিবিশ্বাস বেশী। চেষ্টা করলে তাঁদের শীগ্‌গির ভগবান লাভ হ'তে পারে।"

১৬ই মাঘ, রবিবার, অমাবস্তার গভীর নিশীথে মা এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করেন।—

স্বর্গরাজ্য হইতে দেবগণের প্রতিনিধিস্বরূপ এক দেবতা আসিয়া মাকে বলিলেন,—আপনার ইহলোকের কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে আপনাকে স্বস্থানে লইয়া যাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

মা সানন্দে গমনোদ্যত হইলে অকস্মাৎ এক বাধা উপস্থিত হইল। * * দেবতা একাকী ফিরিয়া গেলেন।

অতঃপর চারিদিকে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে করিতে আসিলেন শশাঙ্কশেখর মহাদেব,—প্রশান্ত বিরাট আনন্দময় মূর্ত্তি, সঙ্গে পরমেশ্বরী ভবানী।

কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর মহাদেব মাকে বলেন, তোমার সাধনায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইবার পূর্ণাহুতি দাও। * *

মা যেন তখন এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তাহাতে মহাসমারোহে পূজা, অর্চ্চনা, হোম, দান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইল। সেই যজ্ঞে দেবদেবীগণ আসিলেন, ইষ্টদেবও আসিলেন। অসংখ্য সাধু, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, কুমারী এবং সধবা তাহাতে যোগদানপূর্ব্বক পূজা, ভোগ, বস্ত্র, দক্ষিণাদি গ্রহণ করিলেন। দেবতা মানব সকলেই অপরিসীম তৃপ্ত হইলেন। * *

স্বপ্ন শেষ হইল, ছায়াচিত্রের ন্যায় সকল অদৃশ্য হইয়া গেল। কী এক বিপুল উদ্দীপনায় মা কন্যাদের সকলকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কী যেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী বার্ত্তা সকলের জন্য তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন।

মা সকলকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। স্তব্ধ হইয়া সকলে তাহা শুনিলেন। বর্ণনা শুনিয়া কেহ রোমাঞ্চিত হইলেন, আবার কেহ স্বপ্নের পশ্চাতে কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে করিয়া শঙ্কিত হইলেন। স্বপ্নাদিষ্ট মহোৎসব কিরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার পরিকল্পনা মা নিজেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ২৯শে মাঘ, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী, নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথিতে

উক্ত উৎসবের দিন স্থির হইল। এই তিথিতেই মায়েরও জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী ঐ দিন কালীঘাটে এবং সিদ্ধেশ্বরী-তলায় পঞ্চাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ এবং বিশেষ পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হইল। আশ্রমে সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ এবং লক্ষ দুর্গানাম করিলেন। মা নিজের ঘরে বসিয়াই পঁচিশজন কুমারী এবং পঁচিশজন সধবাকে শাঁখা, সিন্দূর, বস্ত্র, আহার্য্য এবং দক্ষিণাদি দ্বারা পূজা করাইলেন। অনেক সাধু, ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত প্রসাদ ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্তানসন্ততিগণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কতিপয় সন্ন্যাসীও এই উৎসবে যোগদান করেন।* বহু দরিদ্রনারায়ণও প্রসাদ পাইলেন। এইরূপে অসংখ্য নরনারী মায়ের এই উৎসবে যোগদানপূর্ব্বক অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। পরিচিত এবং অপরিচিত নানাস্থান হইতে প্রচুর এবং নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারও এই উপলক্ষে অযাচিত-ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং আরও কয়েক-জন সঙ্গীতজ্ঞ আসিয়া কীর্ত্তন গাহিলেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের তদানীন্তন সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ ও বর্ত্তমান সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ, এবং আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী এই উৎসবে যোগদান করেন। স্বামী অভেদানন্দের দেহ অসুস্থ থাকায় তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যদিগকে পাঠাইয়াছিলেন।

পর্য্যন্ত অনেক সুগায়িকা ছাত্রী এবং মহিলা আসিয়া মাকে গান শুনাইলেন। মহিলাভক্তগণ ঐ দিন নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র, পুষ্পমাল্য এবং সিন্দূরচন্দনে নিজেদের মনোমত মাকে সাজাইলেন। অপরাহ্নে মা নিজের ফটো তুলিতে দিলেন। তিনি আজ কাহাকেও বাধা দিলেন না, যেন কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। আজ কূল ছাপাইয়া উঠিল তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস। আবার সন্ধ্যার সময় নিজেই একখানি গান ধরিলেন,—

ভবে সেই সে পরমানন্দ,
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।—

বিদায়ের পূর্ব্বে আনন্দময়ী মাতা এইভাবে সন্তানদিগকে পরম আনন্দ দিয়া গেলেন। মায়ের দেহ যে অসুস্থ এ কথা সকলেই ভুলিয়া গেলেন। এই অনুষ্ঠানের পরিণতি যে কোথায়, মা তাহা কাহাকেও ভাবিবার অবসর দিলেন না।

অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইলে তিনি নিজেই বলিলেন, "বাঃ, সুন্দর হয়েছে! যেমনটি ভেবেছিলুম, ঠিক তাই হয়েছে।"

এই শুভদিনে কয়েকটি আশ্রমকুমারীকে মা বিশেষ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাতৃসঙ্ঘের যে-সকল ব্রতধারিণী আশ্রমের সেবায় দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত ইঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধেও মা উচ্চধারণা পোষণ করিতেন। ইঁহারাও উপযুক্ততা লাভ করিয়া যথাকালে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিতা হইবেন, এইরূপ আশীর্ব্বাদ জানাইয়া তিনজন কুমারীর উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাসের বস্ত্র রাখিয়া দিলেন।

একদিন মা 'হরনিধি রামচন্দ্রে'র প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন এবং 'হরনিধি রামচন্দ্র' কথাটির নানাভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি রামচন্দ্রের একটি ভজন শুনিতে চাহিলেন। ভক্ত তুলসীদাসের 'শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন, হরণ-ভবভয়-দারুণম্' গানটি গ্রামোফোনে কয়েকবার তাঁহাকে শুনান হইল। শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া মা নিজেই গানটি গাহিতে লাগিলেন। আট-দশবার গানটি গাহিলেন। ক্রমে বাহ্যজগত ভুলিয়া গিয়া নিমীলিতনয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন 'হরনিধি রামচন্দ্র' 'ভোলানাথ মহেশ্বর' 'পরব্রহ্ম নারায়ণ'।

তাহার পর সমাধিস্থা। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় 'হরনিধি রামচন্দ্র' বলিতে বলিতে মা চক্ষু মেলিলেন। জনৈকা কুমারীকে বলিলেন, "শ্রীরামচন্দ্র আর মা জানকী এসেছেন, এঁদের ভোগ এনে দাও, মা।"

মিষ্টান্ন আনীত হইলে মা নিজে তাহা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "এই প্রসাদ কণা কণা ক'রে সকলে গ্রহণ কর।" বলিয়াই আবার 'হরনিধি রামচন্দ্র, হরনিধি রামচন্দ্র' বলিতে বলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

আর একদিন ভাবমুখে জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে বলিলেন, "তুমি আমার গৌরকে একটু ভালবেসো, মা।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাসবো, আপনার গৌরের কি আছে? সন্ন্যাসী ঠাকুর, কি-ই-বা দিতে পারেন তিনি?"

মা যেন অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইয়াই তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "ও কথা বলো না, মা। তিনি আমায় অনেক দিয়েছেন, আমায় পদাশ্রয় দিয়েছেন।"

মায়ের সুদুর্লভ ভক্তির কথা ভাবিয়া উক্ত আশ্রমবাসিনীর নয়নযুগলও বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

মায়ের অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ আশ্চর্য্য বোধ করিতেন। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে খুব অসুস্থ মনে হইত না। তাঁহার কাশি সময় সময় বৃদ্ধি পাইত, আবার সামান্য ঔষধ ব্যবহার করিলেই তাহার উপশম হইত। শেষ পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য-জনিত দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কোন কঠিন উপসর্গ প্রকাশ পাইল না। এই দুর্ব্বলতার জন্যই তাঁহারা আশঙ্কা করিতেন।

এইসময় একদিন কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেন মায়ের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, "নাড়ীর যা' অবস্থা, দেহ যে কিসের জোরে টিকে আছে, তা'ত বুঝতে পাচ্ছি না। তবে এঁদের যোগের দেহ, সঠিক কিছু বলা যায় না।"

শীতের অবসানে অনেকের মনের কোণে আশা জাগিয়া উঠিল—মায়ের দেহ এইবার ভালই চলিবে। জন্মোৎসবের পর তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন, দেহ আগের চেয়ে অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে। আহারাদি ব্যাপারে মা ইদানীং আর তেমন আপত্তি করিতেন না। সময় সময় ফল, লুচি, মিষ্টান্ন চাহিয়াও লইতেন, সেবিকাগণ ইহাতে প্রীতিলাভ করিতেন।

একদিন আশ্রমবাসিনী দুইজন সন্ন্যাসিনীকে মা অতি-সঙ্গোপনে বলিলেন, "ত্থাখ্, আমি বৃন্দাবনে যাব, তোরা কাঁদিস নি যেন।" কিন্তু মায়ের তৎকালীন স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, আশু কোন বিপদাশঙ্কার কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ভক্তগণ প্রায়ই নানাবিধ সুগন্ধি ফুল, ফল, মিষ্টান্ন এবং উত্তম বস্ত্রাদি তাঁহার জন্য লইয়া আসিতেন। একদিন একখানি সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মা বসিয়া আছেন,—কাহার সঙ্গে যেন নিজের মনেই ভাবাবেশে ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন, বার বার ফুল ছুড়িতেছেন, আর হাসিতেছেন।

একজন কুমারী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুমা, কা'র সঙ্গে কথা বলছেন আপনি? ফুল ছুড়ছেন কা'কে?"

আবেশের মধ্যেই মা মধুরহাস্যে উত্তর দিলেন, "রাধারাণীর সাথে খেলছি।"

মায়ের মুখচ্ছবিতে, কথাবার্ত্তায় এবং আচরণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ দেখা যাইতে লাগিল। ঠাকুরদেবতার কথা বলিতে বলিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনে হইত, তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহাদের কথা বলিতেছেন। সেবিকাগণও তাহার কিছু কিছু আভাস অনুভব করিতেন। কখন কখনও দেখা যাইত, তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কাহাকে আদর করিতেছেন, কাহারও সহিত অভিমান করিতেছেন।

এইরূপে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন।

তাঁহার অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ এমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরখানি স্বতঃই বাহিরে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। বাহ্য চরিত্রের সেই তেজস্বিতা, সিংহবিক্রম, রুদ্রকঠোরতা আনন্দাতিশয্যের সৌরকিরণে তুষাররাশির ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া মাধুর্য্যের অমৃত-সিন্ধুতে পরিণত হইল। রুদ্রাণীর সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় খরপ্রভা আজ সংহৃত, মৃড়ানী সকলকে স্নেহস্নিগ্ধ ক্রোড়ে ডাকিয়া লইলেন। যে আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ লইয়া তাঁহার অন্তরে নিত্য উৎসব-সমারোহ চলিতেছিল, তাহারই কিয়দংশ বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিল। যাঁহার মধ্যেই ভক্তিরসের সন্ধান পাইতেন, তাঁহাকেই বলিতেন, "তোমরাও আমার ঠাকুরকে একটু ভালবেসো।"

সুলেখিকা ভক্তিমতী প্রভাময়ী মিত্র * মায়ের প্রসঙ্গে এই সময়ের কথায় লিখিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্য হয়ে দেখেছি, তাঁর আরাধ্যের প্রত্যক্ষানুভূতি তাঁর মনে কি প্রবলভাবে প্রকাশ হতো। মার অনুপম বদনমণ্ডল সে সময় কি স্নিগ্ধ কোমল মাধুর্য্যে, প্রেমে, ক্ষেমে মণ্ডিত হয়ে যেতো; নববধূর মত সলজ্জ শ্রী ও হ্রীতে কি অপরূপ বিকাশ হতো তাঁর রূপের।

"দামোদরের প্রসঙ্গে তেজস্বিনী মা ঠিক একটী কিশোরী

* ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

মেয়ের মত হয়ে যেতেন। এই সময় মাকে মিনতি করে বলেছি, 'মা, আশীর্ব্বাদ করুন।' মা বলেছেন, 'আমি কি আশীর্ব্বাদ করবো রে! দামোদর আশীর্ব্বাদ করবেন, তাঁকে ডাকো।' আমি অনুনয় করে বলেছি, 'না মা, আমি তো তাঁকে জানি না। আপনাকে জানি, আপনাকেই ভালবাসি।' অত বড় শক্তিময়ী মা, শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে বলেছেন 'ও কি কথা, আমার দামোদরকে একটু ভালবেসো, দামোদর যে আমার স্বামী।"

এই সময়ে সাংসারিক কোন কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিতেন, "আন্ কথা আর বলো না। ঠাকুরের কথা বল, আমারও আনন্দ হবে, তোমাদেরও মঙ্গল হবে।"

পৃথিবীর যাবতীয় লোক, সেই সচ্চিদানন্দের কথা বলিবে, তাঁহাকেই দেহমন সমর্পণ করিয়া ভালবাসিবে, তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া পরমানন্দের আস্বাদ পাইবে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুতে, আকাশে, বাতাসে সেই আনন্দের রূপ দেখিতে পাইবে, আর এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি আনন্দে বিভোর থাকিবেন,—এই স্বপ্নই অহোরাত্র মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেন। তিনি যেন আত্মহারা হইয়া এই আনন্দসাগরে অনুক্ষণ ডুবিয়া থাকিতেন।

মায়ের দেহ দিব্য শ্রীতে ভরিয়া উঠিল। দেহের অপূর্ব্ব কমনীয়তা, মুখমণ্ডলের অপরূপ জ্যোতিঃ, চক্ষুর অপার্থিব দৃষ্টি, সকলকে যেন বলিয়া দিত,—অন্তরের রত্নভাণ্ডারে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিদায়ের বেলা তাহাও খুলিয়া দিয়াছি। যে সকল

ভাগ্যবতী তখন নিকটে আসিলেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তাঁহার কথা শুনিলেন, তাঁহারাও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব শান্তি এবং আনন্দ লাভ করিলেন।

অমাবস্যার স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার পর হইতেই মায়ের সন্তানগণের অনেকেরই মন আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মঙ্গলময় শিব কি তাঁহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া মাকে কাড়িয়া লইবেন? আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ স্থির করিলেন, শিবরাত্রি উপলক্ষে ১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, এবং ১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, উভয় দিবসই উপবাসী থাকিয়া সমগ্র দিবস-রজনী ভজনপূজনদ্বারা দেবাদিদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহারা কাতর প্রার্থনা জানাইবেন, "বাবা আশুতোষ, তুমি প্রসন্ন হও, নিজেদের জীবন আহুতি দিয়াও আমরা মাকে ধরিয়া রাখিব।"

কিন্তু, যাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এত আয়োজন, এত আর্ত্তি, তিনি একেবারে নির্ব্বিকার। একটিবারও বলিলেন না যে, এই প্রিয় আশ্রম, এই স্নেহাস্পদ শিষ্য শিষ্যা ভক্ত সন্তান—কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে তাঁহারও ইচ্ছা নাই। আশ্রমকে কত ভালবাসিয়াছেন, অসংখ্য নরনারীকে কত স্নেহ করিয়াছেন,—সেই স্নেহভালবাসার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতার স্থান ছিল না, তথাপি সুদীর্ঘ জীবনে একদিনের জন্যও মায়া মোহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের কোন মমতা নাই, মৃত্যুর কোন বিভীষিকা নাই,—আত্মানন্দে তিনি পরিপূর্ণ।

সোমবার শিবচতুর্দ্দশীর দিন মা বলিলেন, "ঠাকুর সুতো টানছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে নিত্যমিলনোৎসবের সমুজ্জ্বল চিত্র তাঁহার কথায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অসুস্থতার কথা মানিলেন না, কাহারও বাধা শুনিলেন না। কথার পর কথা মন্দাকিনীর স্রোতের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। বাধা দিলে ব্যথিতচিত্তে বলিতেন, "তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। না ব'লে যে থাকতে পাচ্ছি না।"

অপরাহ্নে বলিলেন, "আজ আমায় ভাল ক'রে সাজিয়ে দে।" মনোহর বেশে তাঁহাকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। গরদের শাড়ী, গরদের চাদর, নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের মালা পরাইয়া দেওয়া হইল। কি জানি কেন, নিজের বেশ দেখিয়া নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে! আমি যে রাজার বেটী, রাজরাজেশ্বরী আমার মা।" উপস্থিত একটি বালিকাকে বলিলেন, "কি সুন্দর সেজেছি ছ্যাখ্‌, আমার রথ আস্‌ছে।"

বালিকাটি প্রশ্ন করিল, "সে-কি ঠাকুমা, আপনার আবার কোত্থেকে রথ আসবে? রথে ত জগন্নাথ ঠাকুর চড়েন। আপনি বুঝি রথে চড়েন?"

মা বলিলেন, "দেখিস্‌, আমি হল্‌দে রথে উঠে চ'লে যাব।"

"কোথায় যাবেন আপনি?"

"রামকৃষ্ণ-লোকে।"

"সে কোথায়? কিন্তু, সেদিন যে বল্‌লেন, বৃন্দাবনে যাবেন।"

"দূর পাগ্‌লি! এখানে আলাদা আলাদা, সেখানে সব এক।"

শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রি।

বাবা বিশ্বনাথের তুষ্টিবিধানে আশ্রমের সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ নিরত। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাঁহারা দেবতার পূজা করিলেন। কেহ কেহ স্তবকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ মায়ের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার জীবনের জন্য বিশ্বনাথের করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির কথা উত্থাপন করিয়া দুর্গাদেবীকে মা বলিলেন, "গুরুদেবের জন্মতিথি সাম্‌নে, যেন ভাল ক'রে হয়, মা। প্রতিবারের মত খিচুড়ি, পায়েসে ভোগ দিয়ো।"

শেষরাত্রিতে দামোদরকে একবার আনিতে বলিলেন। একজন সন্ন্যাসিনী মন্দির হইতে সিংহাসনসহ দামোদরকে মায়ের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

"মা, কেমন দেখছেন দামোদরকে ?" জনৈকা সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন।

মধুরহাস্যে মা বলিলেন, "সুন্দর দেখছি। চোখ চেয়েও যেমন দেখছি, চোখ বুজেও তেমনই দেখি। আমি সদাই দামোদরকে দেখি।" প্রাণাধিক প্রিয় চির-উপাস্য দেবতাকে তিনি মস্তকে রাখিলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

কিছুক্ষণ পর অতি স্নেহকোমলকণ্ঠে দুর্গাদেবীকে দামোদরের ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। দুর্গাদেবী অশ্রুপূর্ণনয়নে ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পূজারিণীগণ উপরে মন্দিরমধ্যে বিশ্বনাথের আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজাইতেছিলেন। শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রির শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গৌরীমা তাঁহার আবাল্যপূজিত দেবতাকে ইহজন্মের মত দুর্গাদেবীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনিও শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীকে দুই হস্তে গ্রহণ করিলেন।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ (১লা মার্চ্চ, ১৯৩৮), মঙ্গলবার।

সকালবেলা হইতে মায়ের অবস্থা অতীব প্রশান্ত, আনন্দময়, —স্বাভাবিক হইতেও সুস্থতর। মা সকাল সকাল দামোদরের ভোগের জন্য ডালভাত রাঁধিয়া দিতে বলিলেন। ভোগ প্রস্তুত হইয়া আসিলে তিনি নিজেই তাহা নিবেদন করিয়া সকলকে একটু একটু প্রসাদ পাইতে বলিলেন এবং নিজেও গ্রহণ করিলেন।

মধ্যাহ্নে একজন সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোমরা ত বাবা নকুলেশ্বরের পূজা দিতে যাচ্ছ, আজকের দিনে আমার হ'য়ে কালীঘাটে মাকে প্রণাম ক'রে এসো।"

সন্ন্যাসিনী দ্বিপ্রহরে কালীঘাট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মা-কালীর নির্ম্মাল্য দিলেন। মা ভক্তিভরে তাহা গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তন্ময় হইয়া কালীর রূপ ও বিভূতির কথা বলিতে লাগিলেন, "মা কি আমার কালো রে। মা ত কালো নয়, জমাট আলো—ভুবন-আলো-করা। মায়ের শক্তিতেই জগৎ ঠিক তালে তালে চলছে। মা-ই সকল শক্তির মূলাধার।"

অপূর্ব্ব মায়ের সাধনা! শাক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি

দীক্ষিতা হইলেন বিষ্ণুমন্ত্রে,—মাতৃসাধক জগদ্‌গুরুর নিকট। আবার, দামোদরকে আজীবন সেবাধ্যান করিয়াও তিনি ভুলিতে পারিলেন না—সেই অসিমুণ্ডধরা মা কালীর মূর্ত্তি। কালীসিদ্ধা মাতা এবং মাতামহীর সাহচর্য্যে শৈশবে তাঁহার অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই মূর্ত্তি, এবং এই মূর্ত্তির মধ্যেই একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে!

তাঁহার সাধনার কুঞ্জে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল দুইটি কুসুম—ভক্তি আর প্রেম। মায়ের রাতুল চরণে অঞ্জলি দিলেন তিনি—ভক্তি-জবা, আর প্রাণ-পতিকে নিবেদন করিলেন—প্রেম-চম্পা!

বিদায়-সন্ধ্যায় অংশুমালী শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীর মন্থর গতিতে দিক্‌চক্রবালে অস্তমিত হইলেন। ঘনীভূত অন্ধকার অসহায় পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিল। প্রতিদিনের ন্যায় মন্দিরে বাজিয়া উঠিল দেবতার সন্ধ্যারতি। আশ্রমকুমারীগণের সান্ধ্য প্রার্থনায় আশ্রমভবন মুখরিত হইল। প্রাচীরগাত্রে শোভমান দেবদেবীর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া মা যুক্তকরে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণ তাঁহাদের ব্রত প্রাণপণে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। মনের আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। সম্মুখে তখনও বিরাট মহানিশা।

সন্ধ্যার পর একজন কুমারী আসিয়া নিবেদন জানাইলেন, "মা, আজ ত আপনার শরীর ভাল আছে, আজ বেশী ফলের রস খেতে হবে।"

সস্নেহে মা বলিলেন, "বেশ, ক'টা খেতে হবে বল।"

কুমারী বলিলেন, "ক'টা বুঝি না, অনেকগুলি।"

হাসিয়া মা বলিলেন, "দাও মা, তোমার যতটা খুসী।"

কুমারী বেদানার রস করিয়া দিলেন, অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশী। মা কোনরূপ আপত্তি না করিয়া সমস্তটা বেদানার রস নিঃশেষে পান করিলেন।

প্রতিদিনই অনেক মহিলা মাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঐ দিনও অনেকে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তন্মধ্যে একজন মহিলা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলে মা বলিলেন, "আজ আন্ কথা হবে না মা, কেবল ঠাকুরের কথা হবে।"

ভগবৎ-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে মা তিনবার উচ্চারণ করিলেন, "গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ।"

অতঃপর তিনি জপ করিতে লাগিলেন। জপ করিতে করিতে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল পর, কেহ যেন তাঁহাকে আর না ডাকে—তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত না করে, ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় তিনি মিনতিভরে বলিলেন, "আমায় আর ডেকো না মা।" তখনও জপ চলিতেছে।

হঠাৎ শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী কোলে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন দেখুন, মায়ের চোখের দৃষ্টি কেমন! মুখে কি সুন্দর হাসি, কেমন জ্যোতিঃ!"

সকলেই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মা ধীরে ধীরে

মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইতেছেন বুঝিয়া আশ্রমের মধ্যে তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার তাহা থামিয়া গেল। বিভিন্নকণ্ঠে তখন "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ," "জয় মা সারদেশ্বরী," "জয় রাধাদামোদর" নাম মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত হইতে লাগিল। কেহ রামনাম, কেহ গীতাপাঠ করিতে লাগিলেন।

মায়ের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী তাঁহার সমক্ষে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর আনীত হইলেন। মা তিন গণ্ডুষ গঙ্গোদক পান করিলেন। তাহার পর, সম্মুখভাগে শোভমান গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি এবং বক্ষোপরি চির-আরাধ্য শ্রীশ্রীরাধাদামোদরকে দর্শন করিতে করিতে, রাত্রি আটটা পনের মিনিটের সময়, মা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। মনে হইল, একটি স্নিগ্ধজ্যোতিঃ তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে দুইজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মায়ের দেহ পরীক্ষা করিয়া জানাইলেন, মহাসমাধি হইতে মা ইহলোকে ফিরিয়া আসেন নাই। যে ক্ষীণ আশা লইয়া বেদনাহত সন্তানগণ তখনও আশান্বিত ছিলেন, তাহাও অন্তর্হিত হইল।

মায়ের পদতল অলক্তরাগে রঞ্জিত হইল, ললাট সিন্দুর-বিন্দুতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, দেহ চন্দনকুঙ্কুমে অনুলিপ্ত এবং মনোরম বেশভূষা ও বহুবিধ পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করা হইল।

শত শত নরনারী আসিয়া সেই পুণ্যপ্রতিমাকে শেষদর্শন এবং অশ্রুর অর্ঘ্যদান করিয়া গেলেন।

বুধবার পূর্ব্বাহ্নে মায়ের পূত দেহ কীর্ত্তনসহযোগে বহন করিয়া সন্তানগণ ভাগীরথীর তীরে কাশীপুর মহাশ্মশানে লইয়া গেলেন। গুরুদেবের উপদিষ্ট মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মহাতপস্বিনী পুনরায় গুরুদেবের পাদমূলে গিয়া মিলিত হইলেন।

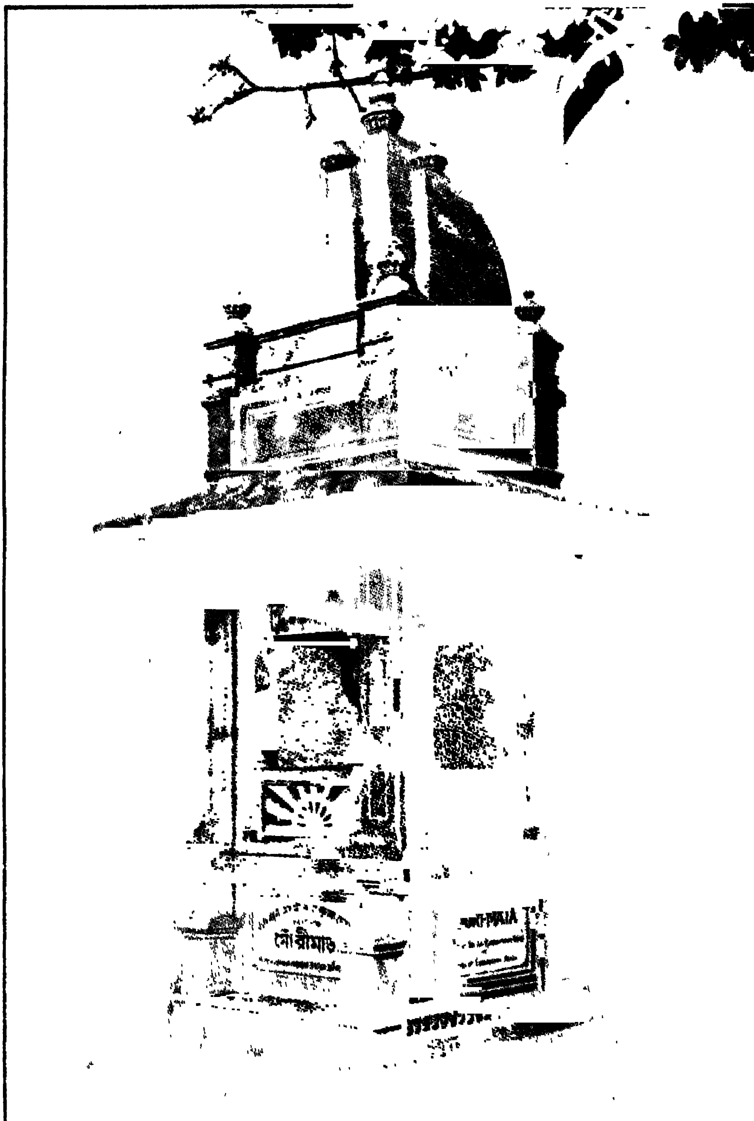
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি-মন্দিরের অতিসন্নিকটে—সুরধুনীর মুক্তধারায় অভিষিক্ত গৌরীমায়ের পূত দেহ চন্দনশয্যায় শায়িত হইল। সন্ন্যাসিনী-কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সমাগত জনমণ্ডলীর জয়ধ্বনির মধ্যে ঘৃতকর্পূরাদি সংযোগে শেষ আহুতি প্রদান করা হইল।

দেখিতে দেখিতে স্বর্ণ আভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া, সেই প্রদীপ্ত হোমানলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিদ্ধা তাপসীর গৌর-বরণ দেহখানি মানবচক্ষুর অন্তরালে,—ইহলোকের বহু উর্দ্ধে—শাশ্বত আনন্দময় লোকে লইয়া গেলেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥



কাশীপুর মহাশ্মশানে



কাশীপুরে সমাধি-মন্দির

একা শক্তিরনন্তরূপরুচিরা সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকৃৎ
তস্যাস্ত্বং বহুকারিণী প্রতিগতা প্রত্যক্ষদৃষ্টান্ততাম্।
গৌরী গৌরবসম্ভৃতাত্ত ভবতী গৌরীব চণ্ডীব বা
জীয়াদ ভারতভূমিভাগ্যমহিমা পুণ্যা পরশ্রেয়সে॥

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য

কোমল-কঠোরে গড়া বাৎসল্য-বৈরাগ্য-ভরা এই বঙ্গভূমি,
তাহারি মানবী রূপ অপূর্ব্ব লীলার ছলে ধরেছিলে তুমি।

*　　　　*　　　　*

এই শুধু জানি দেবি,
যে মহাধনের লাগি দিলে আত্মবলি,
তারই এক কণা যাচি একদা এ আর্ত্ত বিশ্ব হবে কৃতাঞ্জলি॥

শ্রীকালিদাস রায়
কবিশেখর

নাম-সূচী ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা